BanglaBook.org

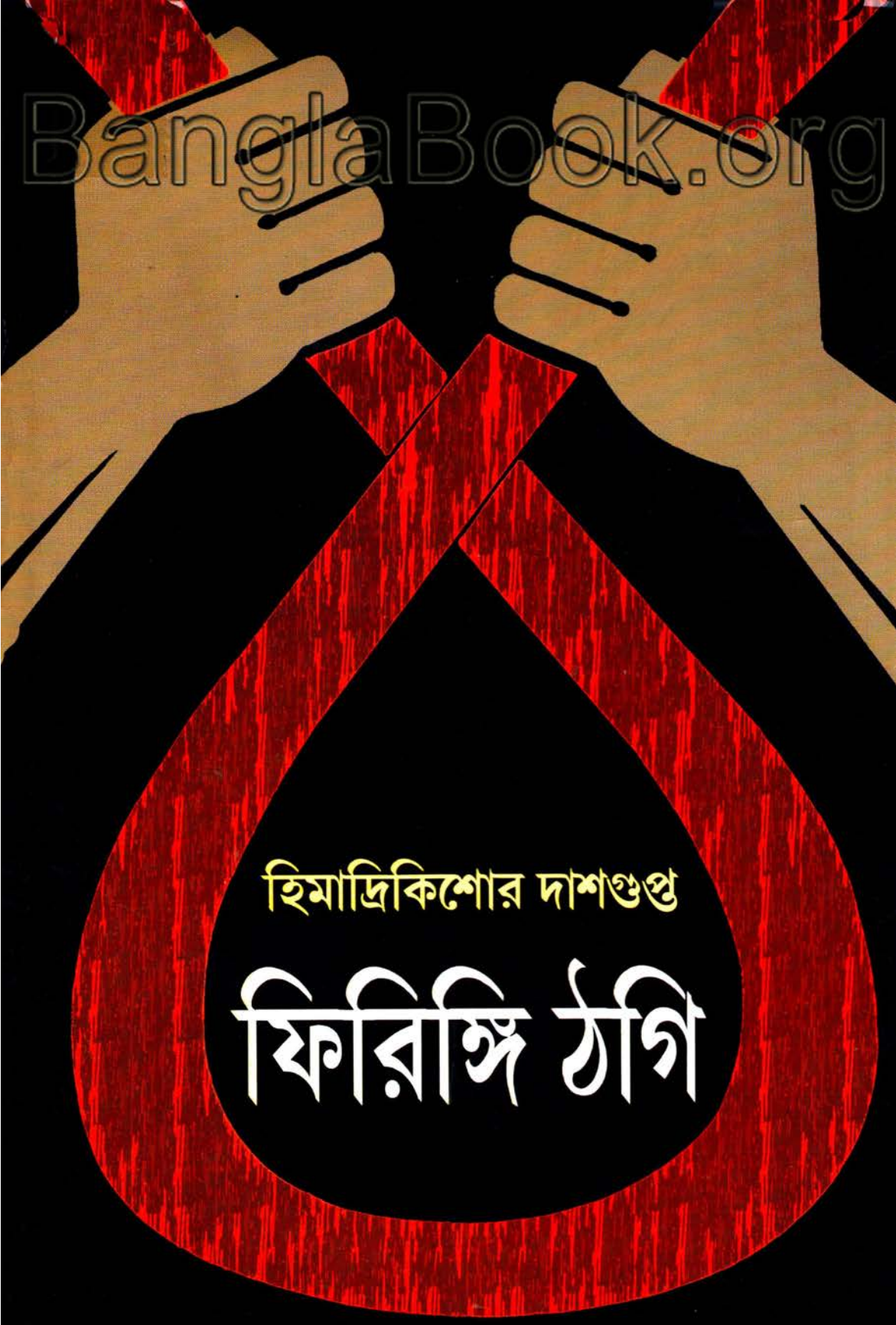

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

ফিরিঙ্গি ঠগি

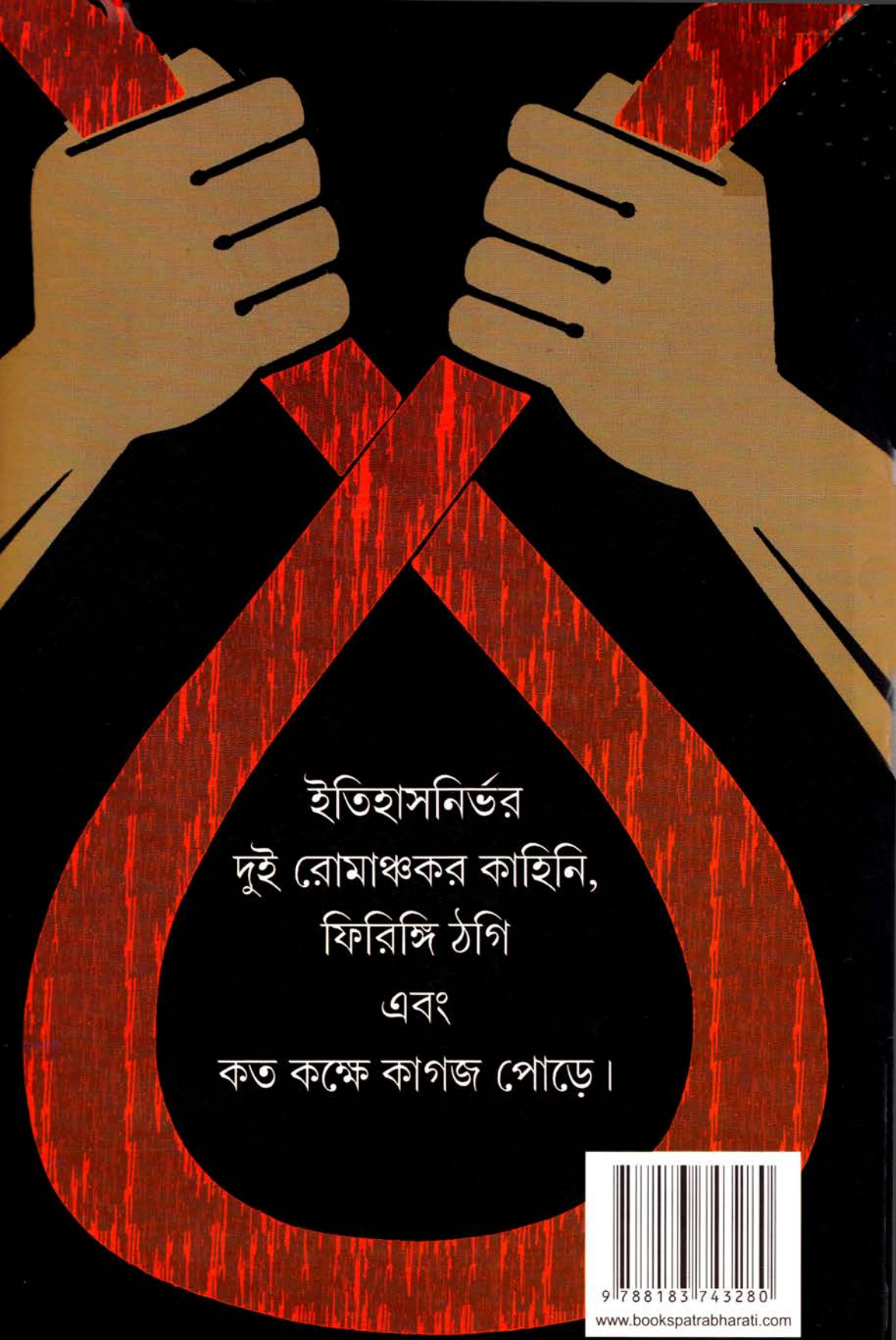

ইতিহাসনির্ভর
দুই রোমাঞ্চকর কাহিনি,
ফিরিঙ্গি ঠগি
এবং
কত কক্ষে কাগজ পোড়ে।

9 788183 743280
www.bookspatrabharati.com

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর ভারতবর্ষ। অন্ধকারাচ্ছন্ন এক দেশ। দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাতায়াত করে মানুষ। তাদের বড় অংশই আর ঘরে ফেরে না! কারা এই অদৃশ্য ঘাতক?...রহস্য উন্মোচনে এলেন ব্রিটিশ রাজপুরুষ স্লিম্যান। তারপর?...

দ্বাদশ শতাব্দীর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতের। ধর্ম, শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্র। হাজারে-হাজারে ছাত্ররা দেশ-বিদেশ থেকে আসত অধ্যয়নের জন্য। শিক্ষার প্রাণকেন্দ্রকে ধ্বংস করার জন্য হানা দিল বক্তিয়ার খলজির তুর্কি বাহিনি। তাঁর হাত থেকে পুঁথি বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করলেন শ্রমণরা...! কীভাবে?...

ইতিহাসনির্ভর দুই রোমাঞ্চকর কাহিনি, ফিরিঙ্গি ঠগি এবং কত কক্ষে কাগজ পোড়ে।

ফিরিঙ্গি ঠগি

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

ফিরিঙ্গি ঠগি

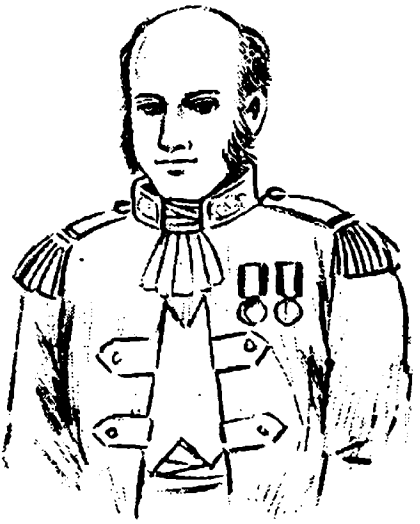

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পত্র ভারতী
www.bookspatrabharati.com

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৫

FIRINGI THAGI
by
Himadrikishore Dasgupta

ISBN 978-81-8374-328-0

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশের
কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনওরকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।
এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রচ্ছদ রাজীব পাল
অলংকরণ গৌতম দাশগুপ্ত

মূল্য
১৮০.০০

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
e-mail patrabharati@gmail.com
visit us at www.facebook.com/ Patra Bharati
website www.bookspatrabharati.com
Price ₹ 180.00

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

সৈকত মুখোপাধ্যায়

ও

অলোক বসু-কে

এই গ্রন্থে রয়েছে দুটি উপন্যাস। 'ফিরিঙ্গি ঠগি' ও 'কত কক্ষে কাগজ পোড়ে'।

'ফিরিঙ্গি ঠগি'-র সময়কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ। ইংরেজ কুঠিবাড়ির আলোগুলো ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজা-নবাবদের ঘরের বাতিগুলো নিভে যাচ্ছে। রেলপথ চালু হয়নি। হাতি, ঘোড়া, গো-শকট বা নৌকোয় কেউ কেউ যাতায়াত করলেও অধিকাংশ ভারতবাসী পদব্রজেই যাতায়াত করত দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। একটা বিরাট অংশের মানুষ পথেই হারিয়ে যেত। ঘরে ফিরত না। কেউ কেউ বলতেন ভারতের পথে-ঘাটে সে সময় নাকি ঘুরে বেড়াত আরও একদল মানুষ। যাদের হাতের ছোয়ায় নাকি মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে যেত পথিকের দল। সেই মানুষদের সন্ধানে পথে নামলেন এক ব্রিটিশ রাজপুরুষ। উইলিয়াম হেনরি স্লিম্যান। পথে নামলেন পৃথিবীর ইতিহাসে কুখ্যাততম 'ঠগি'-র সন্ধানে।

'কত কক্ষে কাগজ পোড়ে' উপন্যাসের পটভূমি দ্বাদশ শতক। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। এককথায় এই প্রাচীন দেশের যাবতীয় ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র ছিল নালন্দা। রত্নদধি, রত্নসাগর, রত্নরঞ্জক—নালন্দার সুবিশাল বহুতল তিন গ্রন্থাগারে থরে থরে সাজানো তালপাতা, রেশম, তুলোট কাগজের পুঁথিতে রাখা ছিল মহাসমুদ্রসমান জ্ঞান ভাণ্ডার। পুঁথির সংখ্যা দশ লক্ষ। ছাত্র সংখ্যা দশ হাজার। পাঁচটি মহাকক্ষ ছাড়াও তিনশোটি কক্ষ ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। কত হাজার-হাজার শিক্ষক ও ছাত্র!

কিন্তু ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি বড় বিচিত্র। তুর্কি সেনাপতি বক্তিয়ার খলজি এসে হানা দিলেন নালন্দায়। সেই সময়ে নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ করে প্রাণের চেয়েও দামি পুঁথিগুলোকে রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন কয়েকজন মানুষ। এই উপন্যাসের নামকরণে 'কক্ষ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে।

পাঠক-পাঠিকাদের উপন্যাস দুটি পড়ে ভালো লাগলে পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

সূচিপত্র

ফিরিঙ্গি ঠগি ১১
কত কক্ষে কাগজ পোড়ে ৮৯

ফিরিঙ্গি ঠগি

ওই স্লিম্যান সাহেব বড় অদ্ভুত মানুষ। উইলিয়াম হেনরি স্লিম্যান। ওই যে যিনি কোম্পানি বাহাদুরের প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন এই জব্বলপুরে। নর্মদা তটের রেওয়া এবং সগর অঞ্চলের কোম্পানির পলিটিকাল এজেন্ট তিনি। এ অঞ্চলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কিন্তু এ লোকটা অন্য উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের মতো নন, যাঁরা শুধু কোম্পানি হাউসে বসে বসে খবর সংগ্রহ করেন, আর রাজনৈতিক বিবাদের মীমাংসা করেন। প্রয়োজনবোধে কখনও-সখনও হাউস ছেড়ে ফৌজ নিয়ে বাইরে আসেন, স্থানীয় কোনও বিদ্রোহ দমন করে সে অঞ্চলে কোম্পানির অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে।

স্লিম্যান সাহেবের ধরন-ধারণ সমপর্যায়ের রাজপুরুষদের একদম উলটো। খুব প্রয়োজনীয় কাজ না থাকলে হাউসে থাকেন না তিনি, লোকলস্করের ধার ধারেন না। একলাই কখনও তাঁর আরবি ঘোড়াটা নিয়ে, কখনও বা পদব্রজে বেরিয়ে পড়েন কুঠি ছেড়ে। কখনও চলে যান নর্মদা তটে, আবার কখনও বা আশেপাশের গ্রামগুলোতে। প্রায়ই দেখা যায় সাহেবের ঘোড়াটা হয়তো হাটে ঢোকার মুখে গাছতলায় বাঁধা। অথবা বিন্ধ্য পর্বতের কোলে কোনও এক অখ্যাত গ্রামের মণ্ডপে বসে গ্রামের পুরুষদের সঙ্গে গল্প করছেন সাহেব। কখনও কখনও পঞ্চাশ বা একশো ক্রোশ দূরেও ঘুরতে ঘুরতে চলে যান তিনি।

সাহেবদের সাধারণত এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে ভারতের দরিদ্র গ্রামবাসীরা। বিশেষত সেই ফিরিঙ্গি যদি রাজপুরুষ হন, তবে তো কথাই নেই। দেশটা তো আর এখন নবাব-রাজাদের নেই, নামেই আছেন তাঁরা। সাহেবরাই এখন দেশের মালিক। নবাব, জমিদাররাই এখন তাঁদের ভয় পায়। কখন সাহেবদের কী মর্জি হবে, শেষে

BanglaBook.org

মাথাটাই হয়তো কাটা গেল! ওদের এড়িয়ে চলাই ঠিক।

তবে স্লিম্যানের ব্যাপারটা অন্যরকম। তিনি হয়তো প্রথম কোনও গ্রামে গেছেন। তাঁর গ্রামে যাওয়ার খবর পাওয়া মাত্রই সাহেবের খিদমত করার জন্য ছুটে আসেন তহশীলদার, স্থানীয় কাস্টমস হাউসের দারোগা সহ নানা ধরনের দেশীয় রাজকর্মচারীরা। স্বয়ং হুজুর পদার্পণ করেছেন যে তাদের অঞ্চলে! স্লিম্যান তাদের কাছে সামান্য খোঁজখবর নিয়েই তাদের বিদায় দেন। বেশ অবাক হয় লোকগুলো সাহেবের খিদমত করা থেকে বঞ্চিত হয়ে। সাহেব এরপর ডেকে নেন স্থানীয় গ্রামবাসীদের। প্রথমে ভয়ে জড়সড় হয়ে সাহেব সন্দর্শনে তারা হাজির হয়। 'হ্যাঁ' বা 'না'-য়ে হুজুরের প্রশ্নের জবাব দেয়। কিন্তু অদ্ভুত ক্ষমতা এই সাহেবের। কথা বলতে বলতে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মিশে যান অপরিচিত গ্রামবাসীদের সঙ্গে। এদেশের ভাষাটা তিনি মোটামুটি আয়ত্ত করে নিয়েছেন। সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে তাদের ভয় ভাঙে, এক সময় নর্মদার স্রোতের মতোই কলকল করে সাহেবকে তারা বলতে থাকে তাদের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগের কাহিনি। কখনও তাদের কথাবার্তায় ব্যক্তিগত জীবনের প্রসঙ্গও উঠে আসে।

সাহেব মনোযোগ দিয়ে তাদের সব কথা শোনেন। প্রয়োজনবোধে স্থানীয় তহশীলদার বা কোনও রাজকর্মচারীকে ডেকে পাঠিয়ে অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের নির্দেশ দেন। গ্রামের মোড়লের এঁটো হুঁকোতে টান দিতেও তাঁর বাধে না। কোম্পানির নথি অনুসারে, ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে লোকটা এদেশে আসেন, একুশ বছর বয়সে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৮১৪ থেকে ১৮১৬, নেপাল যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর হয়ে লড়াই করে ক্যাপ্টেন হন। সেখান থেকে বারাকপুর সেনা ছাউনি হয়ে বেশ কিছুদিন কাটান কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে। তারপর সামরিক চাকরি ছেড়ে দিয়ে সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। ধাপে ধাপে সে চাকরিতে উন্নতি করার পর ক্যাপ্টেন

BanglaBook.org

স্লিম্যান ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে ৩২ বছর বয়সে গভর্নরের সহকারী হিসাবে দায়িত্ব পেয়েছেন নর্মদা তটের রেওয়া ও সগর এস্টেটের।

অচেনা-অজানা গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎই তিনি একটা প্রশ্ন করেন তাদের,—তোমাদের এ গ্রাম থেকে বাইরে বেরিয়ে কোনও দিন কি কোনও মানুষ হারিয়ে গেছে? অনেক সন্ধান করেও যার কোনও খোঁজ মেলেনি?

স্লিম্যানের এই প্রশ্ন শুনে গ্রামবাসীরা বিস্মিত হয়। হঠাৎ এ আবার কেমন প্রশ্ন!

স্লিম্যান হয়তো কোনও কোনও সময় পেয়ে যান তাঁর কাঙ্ক্ষিত উত্তর। সমবেত জনতার মধ্যে থেকে একজন লোক বলে ওঠে,—হ্যাঁ, হুজুর, হ্যাঁ। সাত বছর আগে এ-গাঁয়ের কুড়ি জনের একটা দল দুর্গাপুজোর সময় জন খাটতে গেছিল পুবে। তারা আর ঘরে ফেরেনি।

তার কথা কানে যাওয়া মাত্রই স্লিম্যান দোয়াত-কলম-কাগজ নিয়ে সোজা হয়ে বসেন। জিগ্যেস করেন,—তারা সত্যি হারিয়ে গেছে তো? গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে আস্তানা পাতেনি তো?

উত্তরদাতা বিষণ্ণ মুখে বলে,—না, সাহেব না, বউ-বাচ্চা গ্রামে ফেলে ওরা কোথায় আস্তানা পাতবে? তাছাড়া ওদের যেখানে যাওয়ার কথা ছিল পরে সেখানে খোঁজ নিয়ে জানা যায় যে দলটা সেখানে নাকি পৌঁছোয়নি! তারা পথেই হারিয়ে গেছে।

স্লিম্যান এরপর লোকটার কাছ থেকে হারিয়ে যাওয়া লোকগুলোর নামধাম, হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাব্য তারিখ-জায়গা ইত্যাদি জেনে নিয়ে লিখতে শুরু করেন কাগজে। স্লিম্যানের সরকারি ঘরে জমা হতে থাকে কাগজের রাশি। বহু হারিয়ে যাওয়া মানুষের নাম-ঠিকানা লেখা থাকে তাতে।

স্লিম্যানের ভারতবর্ষ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ। ইংরেজ কুঠিবাড়ির আলোগুলো ক্রমশ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজাদের ঘরের বাতিগুলো

BanglaBook.org

একটা একটা করে নিভে যাচ্ছে। তমসাচ্ছন্ন এই দেশ। আরও তমসাচ্ছন্ন ভারতের পথঘাট। রেলপথ তখনও চালু হয়নি এদেশে। ভারতের পথেঘাটে তখন অদৃশ্য নিলামওয়ালা জীবনের দাম হেঁকে যায় 'কানাকড়ি কানাকড়ি' বলে! তবুও সে পথেই ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া ভারতবাসীর বেঁচে থাকার অবলম্বন। রাজদরবারের রইস ওমরাহ-মন্ত্রী থেকে শুরু করে দীনহীন ফকির-ভিখারি, কোম্পানির রাজপুরুষ, বেনিয়া থেকে শুরু করে নবাব হারেমের সুন্দরী নর্তকী, জমিদারের অত্যাচারে পলায়মান কৃষক, ফৌজ থেকে নাম কাটা সেপাই—সবারই তখন বেঁচে থাকার একমাত্র ভরসা ওই পথ। জীবিকা ও জীবনের প্রয়োজনে উত্তর থেকে দক্ষিণে, পুব থেকে পশ্চিমে—দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে পদব্রজেই যাতায়াত করে সাধারণ মানুষ। কেউ কেউ অবশ্য হাতি-ঘোড়া বা গোশকটেও যাতায়াত করে, জলপথেও বা কেউ কেউ। তবে সে সংখ্যা নগণ্য। পথে যারা নামে পথই ঠিক করে দেয় তারা গন্তব্যে পৌঁছবে কি না। কেউ কেউ পথেই হারিয়ে যায়। আর ফেরে না।

BanglaBook.org

কিন্তু তা বলে হারিয়ে যাওয়া মানুষের সংখ্যা এত হবে! চল্লিশ হাজার! স্লিম্যান এই হারিয়ে যাওয়া মানুষের গল্প প্রথম শুনেছিলেন বারাকপুর সেনা ছাউনিতে। সাহেবের এদেশের সম্বন্ধে বরাবরই খুব আগ্রহ। তিনি এদেশের মানুষের সঙ্গে কথা বলতে ভালোবাসেন। বারাকপুরের গঙ্গার ঘাটে বসে উত্তর ভারতীয় এক পাঁড়ে ব্রাহ্মণ সেপাই তাকে গল্পচ্ছলে বলেছিলেন,—জানেন সাহেব, আমার বাড়িতে আমিই একমাত্র পুরুষ। আমার বাবা-কাকা সহ অর্ধেক গ্রামের পুরুষরা হঠাৎ একদিন হারিয়ে গেল! আমি ব্রাহ্মণ মানুষ, পেটের দায়ে ফৌজে নাম লিখিয়েছি।

—হারিয়ে গেল মানে?

পাঁড়ে জবাব দিয়েছিল,—মানে তারা গ্রাম থেকে বেরিয়ে ছিল

অযোধ্যায় যাওয়ার জন্য। কিন্তু সেখানে পৌঁছতে পারেনি। পথেই কোথাও হারিয়ে গেল।

—এ ভাবে লোকে কখনও হারিয়ে যেতে পারে? বিস্মিত ভাবে জানতে চেয়েছিলেন এদেশে নবাগত ক্যাপ্টেন স্লিম্যান।

উত্তরদাতার মধ্যে কিন্তু কোনও বিস্ময় ফুটে ওঠেনি। যেন তাদের হারিয়ে যাওয়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। শান্ত ভাবে সে জবাব দিয়েছিল,—হ্যাঁ, এদেশে মানুষ হারিয়ে যায়। আমাদের পাশের গ্রামের একদল মানুষ এই তো বছরখানেক আগে গঙ্গাসাগরে তীর্থ করতে এসে আর গ্রামে ফিরল না। পথেই হারিয়ে গেল।

'হ্যাঁ, এদেশে মানুষ হারিয়ে যায়'—পাঁড়ের এই কথাটা একটা কৌতূহলের জন্ম দিয়েছিল তাঁর মনে। আর এর কিছুদিনের মধ্যেই ঘটনাচক্রে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের মহাফেজখানায় একটা সরকারি নথি দেখে চমকে ওঠেন স্লিম্যান। কোনও এক প্রসঙ্গক্রমে নথিতে লেখা ছিল গত এক দশক ধরে ভারতবর্ষে প্রতি বছর চল্লিশ হাজার মানুষ নিখোঁজ হয়েছে, কুড়ি কোটির ভারতবর্ষে প্রতি বছর চল্লিশ হাজার মানুষ নিখোঁজ! হ্যাঁ, এ কথা ঠিক যে ভারতবর্ষের পথঘাট শ্বাপদসঙ্কুল। ডাকাত-খুনে হামেশাই দেখা যায় ভারতের পথঘাটে। পথশ্রমের ক্লান্তি অথবা রোগব্যাধিতেও পথের মধ্যে মারা যেতে পারে কেউ কেউ। তা বলে, একদম ভোজবাজির মতো হাওয়া হয়ে যাবে? প্রতি বছর চল্লিশ হাজার মানুষ! কেউ কোনও সন্ধান দিতে পারবে না তাদের?

ওই দিন থেকেই এ প্রশ্নের ভূতটা বসেছিল তাঁর ঘাড়ে। কোথায় হারিয়ে যায় এত মানুষ? কী ভাবে হারিয়ে যায়? ফোর্ট উইলিয়ামে ওই কাগজটা দেখার পর থেকেই ধীরে ধীরে এ ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করা শুরু করেছেন তিনি। দিন যত এগোচ্ছে ততই স্লিম্যানের ধারণা দৃঢ় হচ্ছে কাগজে লেখা পরিসংখ্যানের সত্যতা সম্বন্ধে। কে নেই সেই নিখোঁজ মানুষের তালিকায়? ব্রিটিশ রাজকর্মচারী, সৈনিক, বণিক,

BanglaBook.org

নবাবের ওমরাহ থেকে শুরু করে দেশীয় জমিদার পর্যন্ত! আর সাধারণ গরিবগুর্বো মানুষ তো আছেই।

কিন্তু কীভাবে হারিয়ে যায় তারা? বহু জনের সঙ্গে কথা বলে, বহু অনুসন্ধানের পর ভাসাভাসা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন এ ব্যাপারে। সে তথ্যগুলো যেমন চমকপ্রদ, তেমনই বিস্ময়কর। তবে কোনও মানুষই স্লিম্যানকে তার প্রমাণ দিতে পারেনি এখনও।

এক এক সময় স্লিম্যানের মনে হয় ব্যাপারটা নিছকই অশিক্ষিত ভারতবাসীর মনগড়া ব্যাপার, তাদের কল্পনা। এ দেশের পথে অনেকরকম খুনে ডাকাত আছে, ঠ্যাঙাড়েরা পাবড়া ছুড়ে মানুষ মারে, ম্যাকফ্যানসোরা গাছের ডালে পেরেক পুঁতে মানুষকে ফাঁসি দেয়, গার্টাররা কাঠির জুয়া ধরে পথিকের সর্বস্ব হরণ করে, প্রয়োজনে তাকে খুনও করে। মানুষ ম্যাকফ্যানসোর নাম জানে, ঠ্যাঙাড়ে জানে, গার্টার চেনে, কিন্তু তাদের চেনে না। সত্যি যদি তাদের অস্তিত্ব থাকত, তাহলে কি তাদের সম্বন্ধে একটাও কোনও অভিযোগ লেখা থাকত না সরকারি নথিতে? তন্নতন্ন করে ঘেঁটে দেখেছেন স্লিম্যান, একটা শব্দও উল্লেখ নেই সে ব্যাপারে। ব্যাপারটা কি তাহলে যুগ-যুগ ধরে চলে আসা একটা উপকথা? অন্ধ ধর্মবিশ্বাস?

স্লিম্যান এ প্রসঙ্গে যতটুকু যা শুনেছেন তা হল, যারা নাকি মানুষকে অদৃশ্য করে তারা হিন্দু দেবী 'মা কালী'র সন্তান। দেবীর বরে তারা অদৃশ্য, চোখে দেখা যায় না তাদের, শুধু মানুষকে অদৃশ্য করার পূর্ব মুহূর্তে তারা এসে উপস্থিত হয় তার সামনে। তারপর সেই লোক সমেত আবার বাতাসে মিলিয়ে যায়।

স্লিম্যান অবশ্য কোনও দৈবতত্ত্বে বিশ্বাস না করলেও যেখানেই যান তাঁর মাথার মধ্যে সবসময় ঘুরপাক খায় একই প্রশ্ন—'এতগুলো মানুষ কীভাবে হারিয়ে যায়?'

এই নর্মদার দেশে আসার পরও নিরন্তর সে প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য স্লিম্যান ঘুরে বেড়াচ্ছেন আশেপাশে নানা জায়গাতে।

BanglaBook.org

দুই

জনা পনেরো লোকের একটা দল। দেখলেই বোঝা যায় ওরা দূর দেশের যাত্রী। ভারত পথের পথিক ওরা। অগণিত দরিদ্র ভারতবাসীর মতো জীবিকার সন্ধানে পথে নেমেছে। আসছে পুব থেকে, গন্তব্য পশ্চিম। শরতের প্রথম কাশফুল ফোটার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবছর ঘর ছাড়ে ওরা। দিন পনেরো আগে ওরা ঘর ছেড়েছে। তারপর শুধু চলা আর চলা। কত গ্রাম, নগর, গঞ্জ, নদীতট, জঙ্গল ভেঙে এগিয়ে চলেছে লোকগুলো। শুধু রাতটুকুতে বিশ্রামের জন্য তারা বেছে নেয় কোনও চণ্ডীমণ্ডপ, মাজার, পরিত্যক্ত কোনও বাড়ি, অথবা রাস্তার পাশে কোনও ছায়া ঘেরা বাগান। সূর্যোদয় হলেই আবার শুরু হয় যাত্রা। সাধারণত বড়-বড় গঞ্জ, শহরগুলোকে ওরা এড়িয়ে চলে। ওখানে জমিদারের পাইক থাকে। কোম্পানির সেপাই থাকে, কাস্টমস হাউসের দারোগা থাকে। সামান্য ছুতোনাতা পেলেই পয়সার জন্য পথিকদের তারা হয়রান করে।

গতকাল এ লোকগুলো রাত কাটিয়েছিল এক নির্জন শিব মন্দিরের চাতালে। ভোরে উঠেই হাঁটতে শুরু করেছিল। সারাদিন হাঁটার পর সূর্য ডোবার কিছু আগে তারা এসে পৌঁছল এক পায়েচলা রাস্তার মোড়ে। আরও একটা রাস্তা এসে মিশেছে সে জায়গাতে, তারপর রাস্তা এগিয়েছে সোজা। কিছু দূরেই জঙ্গলের কালো রেখা চোখে পড়ছে। ওই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দুক্রোশ গেলেই ওপাশে অম্বিকাপুর শহর।

এ পথ চেনা লোকগুলোর। প্রতি-বছর এ পথে আসে তারা। রাস্তার মোড়ের এক পাশে জনহীন দিগন্তবিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তর, অন্যপাশে বিরাট আমবাগান। আশেপাশে কোনও লোকালয় নেই।

BanglaBook.org

শেষ গ্রাম তারা ফেলে এসেছে দশ ক্রোশ পিছনে। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে তারা ভাবতে লাগল কী করবে? জোরকদমে হেঁটে জঙ্গল অতিক্রম করে অম্বিকাপুরের কাছাকাছি পৌঁছবে, নাকি পাশের আমবাগানেই রাত কাটিয়ে দেবে?

শেষ বিকালে ওই জঙ্গলে ঢোকা বিপদজনক। বাঘ হানা দেয়। এ-তল্লাটে মানুষখেকো বাঘের উপদ্রব আছে। এদিকে আসার পথে লোকগুলো হাটুরেদের মুখ থেকে শুনেছে যে ক'দিন আগেই নাকি এ রাস্তায় এক পথচারীকে বাঘে টেনেছে। পথিকদের যে দলপতি তার নাম ফিরিঙ্গিয়া। আসল নাম অবশ্য তার এনায়েত। কিন্তু সাহেবদের মতো ফর্সা রং, আর লম্বা-চওড়া চেহারার জন্য তার সঙ্গীরা তাকে 'ফিরিঙ্গি' বলে ডাকে।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখতে দেখতে কী সিদ্ধান্ত নেবে তা ভাবছিল এনায়েত। হঠাৎ সে দেখতে পেল তাদের অন্যপাশের রাস্তা ধরে তিনজন দেশি লোক, আর খচ্চরের পিঠে একজন ফিরিঙ্গি সাহেব আসছে। সাহেবের কাঁধে বন্দুক, দেশীয় লোকদের মধ্যে দুজনের হাতে পাকা বাঁশের লাঠি। কোম্পানির কাস্টমস হাউসের লোক নাকি? হয়তো এখনই এসে পথিকদের থেকে কর চাইবে!

সাহেবকে দেখে সতর্ক হয়ে গেল এনায়েত ও তার সঙ্গীরা। সাহেব তাদের কাছে এসে কিছুটা তফাতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সাহেবের সঙ্গী তৃতীয় ব্যক্তির পরনে ফরসা ধুতি, পিরান। পায়ে চটি জুতোও আছে। সে বাবু লোক। সাহেব তাদের কাছে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই কাঁধ থেকে বন্দুকটা হাতে নিয়েছেন। তীক্ষ্ণ নজরে এনায়েতদের দেখার পর সাহেব আর সেই বাবুর এনায়েতদের নিরীহ পথিক বলেই মনে হল। তবুও সন্দেহ নিরসনের জন্য সেই বাবু এনায়েতদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করল,—তোমরা হঠাৎ কোথা থেকে এখানে এলে? কোথা থেকে আসছ?

এনায়েতের পাশে দাঁড়িয়েছিল দুর্গা। প্রৌঢ় মানুষ সে। দুর্গা তাদের

BanglaBook.org

কাছে গিয়ে সাহেবের উদ্দেশ্যে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম জানিয়ে বলল,—আমরা আসছি পুব থেকে, আমরা অম্বিকাপুরে দুর্গাপুজোয় জন খাটতে যাচ্ছি।

সামনে কয়েক ক্রোশ দূরেই অম্বিকাপুর বেশ বড় শহর। দুর্গাপুজোর সময় ধুমধাম হয় সেখানে। মাত্র পাঁচ ক্রোশ দূরের জায়গা। ওখানে এ পথ ধরেই যেতে হয়। তবুও সেই লোকগুলোকে বাজিয়ে দেখার জন্য বাবু প্রশ্ন করল,—পুবের কোথা থেকে আসছ? গ্রামের নাম কী?

দুর্গা জবাব দিল,—গ্রামের নাম ইসলামপুর। ভাগীরথীর গায়ে।

—চলতে চলতে হঠাৎ এখানে দাঁড়িয়ে পড়লে যে? আবার প্রশ্ন করলেন তিনি।

দুর্গা বলল,—আর এগোতে ভরসা পাচ্ছি না হুজুর। সামনে জঙ্গল। বাঘের ভয় আছে। পথে শুনলাম ক'দিন আগেই নাকি এখানে মানুষকে বাঘে ধরেছে। তাই...। কথাটা সত্য। পথে আসার সময় বাবুরাও শুনেছেন এ কথা।

এনায়েত এবার এগিয়ে সাহেবের সামনে গিয়ে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। সাহেব তার দিকে তাকালেন। এনায়েতের ফরসা রং, উন্নত ললাট, সনাতন ভারতীয়দের মতো সরলতা মাখা দৃষ্টি। শান্ত স্বরে সে সাহেবের উদ্দেশ্যে বলল,—হুজুরের কাছে আমাদের একটা নিবেদন আছে। সন্ধ্যায় জঙ্গলে ঢোকা নিরাপদ নয়। সাহেব সঙ্গী হলে পাশের আমবাগানে রাত কাটাতে চাই। সাহেবের বন্দুক আছে, লাঠিয়ালও আছে। তিনি সঙ্গে থাকলে আমাদের ভরসা। তা ছাড়া অনেক দূরের পথে যাচ্ছি বলে পথখরচের সামান্য কিছু পয়সাও আছে। ডাকাতের তো কোথাও অভাব নেই। হুজুর আমাদের মা-বাপ। গরিব মানুষগুলোকে যদি একরাতের জন্য ভরসা দেন...।

এনায়েতের প্রস্তাব শোনার পর তাদের একটু তফাতে গিয়ে সাহেব তার বাবুর সঙ্গে চাপা গলায় আলোচনা শুরু করলেন। লোকগুলোকে

BanglaBook.org

দেখে সাহেব ও তার সঙ্গীদের খারাপ বলে মনে হচ্ছে না। লোকগুলোর কারও মুখে কোনও ধূর্ততা বা হিংস্রতার চিহ্ন নেই। তাদের প্রস্তাবটাও মন্দ নয়। সাহেবকেও যেতে হবে ওই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। সঙ্গে বন্দুক থাকলেও সাহেব শিকারি নন। বন্দুকটা আছে শুধু চোর-ডাকাতদের ভয় দেখানোর জন্য। এতগুলো লোকের সঙ্গে রাত কাটানো সাহেবদের পক্ষেও নিরাপদ। আলোচনার পর তবুও শেষবারের মতো পথিকদলকে পরীক্ষা করে নেওয়ার জন্য বাবু বললেন,—আমরা রাজি, তবে তার আগে একবার আমরা দেখে নেব তোমাদের সঙ্গে কোনও অস্ত্র আছে কি না?

এনায়েত সঙ্গে সঙ্গে মোস্তাফা বলে একজনকে ডাকল। তার পোশাকের তলা থেকে বার হল কাপড়ের ফালি দিয়ে সযত্নে জড়িয়ে রাখা একটা কোদালের ফলা। হাতখানেক লম্বা হবে সেটা। এনায়েত সেই ফলাটা ভক্তি ভরে নিজের মাথায় ঠেকাবার পর সেটা কাপড় সমেত সাহেবের দিকে তুলে ধরে বলল,—এই কোদালিটাই শুধু আছে আমাদের সঙ্গে। এটা ঠিক অস্ত্র নয়, মন্ত্রপূত কোদালি। এর আশীর্বাদেই আমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছোতে পারি। এটা আমাদের দেবতা।

সাহেব আর তাঁর অনুচররা ভালো করে দেখল এনায়েতের হাতে ধরা কোদালিটা। মামুলি একটা কোদালি। এ-দেশে কত জাত ধর্মের মানুষ! কতরকমের তাদের আচার-সংস্কার। সাহেব শুনেছেন যে বাংলাদেশে নাকি লাঙলের ফলাকে পুজো করা হয়। পশ্চিম ভারতে রাজপুতরা তলোয়ার পুজো করে। কোদালের ফলাও তবে পূজিত হতে পারে। এ ব্যাপারটা তাই সাহেব বা তার বাবুর কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হল না। লাঠিয়াল দুজন এরপর পথিকদের পুঁটলিগুলোর তল্লাশি নিল। হাতড়ে দেখল এনায়েত, দুর্গা সহ অন্যদের পোশাক। সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেল না। অতঃপর সাহেব সবাইকে নিয়ে এগোলেন পথের পাশে আমবাগানের দিকে।

BanglaBook.org

বিরাট আমবাগান। কিছুটা তফাতে তফাতে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট বিরাট সব গাছ। এক প্রাচীন গাছের নীচে সাহেবের বসার জন্য মাদুর বিছানো হল। সাহেব তার বাবুকে নিয়ে বসলেন মাদুরে। লেঠেল দুজন আর এনায়েতের লোকজন কাঠকুটো জ্বালিয়ে রান্নার কাজে লেগে গেল। লেঠেল দুজনের সঙ্গে কথা বলে কিছুক্ষণের মধ্যে সাহেব ও তাঁর বাবুর নাম-পরিচয় জানা গেল। সাহেবের নাম টিমোথি। সাহেব হলেও তিনি সিভিলিয়ান। বছর দুই হল তিনি এ দেশে এসেছেন। গন্তব্য মধ্যভারতের জঙ্গলপ্রদেশের এক নেটিভ স্টেট। সেখানকার জমিদারতনয়কে ইংরেজি শেখাবার চাকরি নিয়ে যাচ্ছেন তিনি। বাবু হলেন সে স্টেটের গোমস্তা, লেঠেল দুজনও সেখানকারই কর্মচারী। তিনজন মিলে সাহেবকে নিয়ে যাচ্ছেন সেখানে।

সূর্য ডুবে গেল, অন্ধকার নামল আমবাগানে। সাহেবের কাছে একটা মশাল জ্বালানো হল। সন্ধ্যা হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই খাওয়াদাওয়া সাঙ্গ হল। সাহেব এরপর এনায়েত, দুর্গাসহ কয়েক জনকে কাছে ডেকে নিলেন গল্প শোনার জন্য। নবাগত সাহেবের চোখে ভারতবর্ষ এক বিচিত্র দেশ। এ ভারতবর্ষ হল সেই দেশ যে দেশে বিধবা রমণীকে আগুনে পুড়িয়ে সতী করা হয়, গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন দেওয়া হয়, নরবলি দেওয়া হয়, জাতরক্ষায় আটবছরের বালিকার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয় আশি বছরের বৃদ্ধর। ভারতবর্ষ হল সেই দেশ যেখানে ছোট-ছোট নেটিভ স্টেটের মণিমাণিক্যের জৌলুস বাকিংহাম প্যালেসকেও হার মানায়! তাজমহল, দক্ষিণ ভারতের মন্দির দেখে ঘোর লেগে যায় ইওরোপীয়দের। কত প্রাচীন দেশ এই ভারতবর্ষ! কত গল্প ছড়িয়ে আছে এই দেশে।

তারই কিছু শোনার জন্য টিমোথি সাহেব এনায়েতদের নিয়ে বসলেন। হিন্দুস্থানী ভাষাটা ইতিমধ্যেই শিখে নিয়েছেন সাহেব। দীনু রজক খুব ভালো গল্প বলে। অদ্ভুত তার বাচনভঙ্গি। সাহেব,

BanglaBook.org

গোমস্তাসহ সবাই শুনতে লাগল তার গল্প। আমবাগানের মাথার ওপর চাঁদ উঠল। সেই চাঁদের আলোতে দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলো যেন এক-একজন মানুষ। তারা যেন নিঃশব্দে লক্ষ করছে মাদুরের ওপরে বসা ও আশেপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মানুষগুলোকে। ক্রমশ বাড়তে থাকল রাত। সাহেবের বন্দুকটা ঘাসের ওপর শোয়ানো।

একটা গল্প শেষ হয়, সঙ্গে সঙ্গে এনায়েত বা দুর্গা, দীনুকে খেই ধরিয়ে বলে,—এবার তুমি উদয়নালার যুদ্ধের গল্পটা বলো। অথবা আকবর আর প্রতাপসিংহর যুদ্ধ।

শুনতে শুনতে হাই তোলেন গোমস্তা, লাঠিয়ালরা লাঠি নামিয়ে রাখে পাশে। দীনু বলে চলে তার গল্প। প্রহরের পর প্রহর বাড়ে। কয়েকজন পথিক এসে দাঁড়াল সাহেব, লাঠিয়ালদের পিছনে। লাঠিয়াল দুজন একবার পিছন ফিরে সতর্ক দৃষ্টিতে দেখল তাদের। না, লোকগুলোর দৃষ্টিও দীনুর ওপর নিবদ্ধ, তারাও গল্প শুনতে এসেছে। এগিয়ে চলে দীনুর গল্প।

মশালটা নিবু নিবু হয়ে এসেছে।

আরও কিছুক্ষণ পর সাহেবেরও হাই উঠল। পথশ্রমের ক্লান্তিতে ঘুম নেমে আসছে তার চোখে। বাবু ইতিমধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। লাঠিয়াল দুজন ঢুলছে। হঠাৎ কোথা থেকে একখণ্ড মেঘ এসে ঢেকে দিল মাথার ওপরের চাঁদটাকে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নেমে এল আমবাগানে। কোথা থেকে একপাল শেয়াল যেন ডেকে উঠল, ঠিক সেই মুহূর্তে এনায়েতের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—সাহেবকে লিয়ে তামাকু লাও।

মেঘ সরে গেল। চারটে নিস্পন্দ দেহ লুটিয়ে পড়ে আছে মাদুরের ওপর। শেয়ালের দল যেন আবার ডেকে উঠে বলল,—কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া? হত্যা হুয়া! হত্যা হুয়া!

পরদিন সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এনায়েতরা যখন আবার সেই

BanglaBook.org

আমবাগান ছেড়ে যাত্রা শুরু করল তখন টিমোথি সাহেব আর তার সঙ্গীদের কোনও চিহ্ন নেই। সাহেবের নিঃসঙ্গ খচ্চরটা শুধু চরে বেড়াতে লাগল সেই আমবাগানে। পথের পাশের নির্জন আমবাগানে সাহেবদের হারিয়ে যাওয়ার সাক্ষী রইল শুধু একপাল প্রহরগোনা শেয়াল। যারা কথা বলতে পারে না।

তিন

—সাহেব তুমি 'দেবী কালী'-র নাম জানো?

সাহেবের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল বৃদ্ধ লোকটা। বিন্ধ্যাচলের মানুষ সে। স্থানীয় এক গ্রামের মোড়ল লোকটা। এক সময় যুবা বয়সে এ লোকটা নাকি রণপা নিয়ে ডাকাতি করতে যেত দূর গাঁয়ে। আর এখন একগন্ডা নাতি-নাতনি নিয়ে সংসার-জীবন কাটাচ্ছে, আর গাঁয়ে মোড়লগিরি করছে। বহুদর্শী লোক। কিছুদিন আগেই স্লিম্যানের আলাপ হয়েছে এই লোকের সঙ্গে। নাম দশরাজ। প্রথম আলাপেই সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন এ লোক জীবনে অনেক কিছু দেখেছে, শুনেছে। তাই তিনি তার হাউসে আজ নিমন্ত্রণ করে এনেছেন দশরাজকে।

গ্রামের মোড়ল হলেও দশরাজ তার গ্রামের অন্যদের মতোই গরিবগুর্বো মানুষ। দশরাজের সামনে শালপাতায় যখন সাদা ভাত আর খাসির মাংস এনে হাজির করা হল, তখন তা দেখে সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় চোখে জল এসে গেছিল। বহুদিন পর পেট পুরে খেয়ে সাহেবের পায়ের কাছে হাঁটুগেড়ে তাকে গল্প শোনাতে বসেছে বৃদ্ধ। সাহেব বসেছেন একটা কেদারায়। মোমের আলোতে বৃদ্ধের মুখমণ্ডলের বলিরেখাগুলো যেন কাঁপছে। তার শনের মতো চুলগুলো যেন আরও সাদা দেখাচ্ছে এই আধো অন্ধকার ঘরে।

BanglaBook.org

লোকটার প্রশ্নর উত্তরে স্লিম্যান জবাব দিলেন; ~~হ্যাঁ, আমি~~। তার মূর্তি দেখেওছি।

দশরাজ এরপর বলল,—তাদের অস্ত্র বন্দুক নয়, তলোয়ার নয়, কিরিচ নয়, একখণ্ড রুমাল। তুমি দেখলে ভাববে ওটা হয়তো 'সাঁস', অর্থাৎ কোমরবন্ধ। মাত্র তিন হাত লম্বা হলুদ রঙের রেশমের ফালি। কিন্তু ওটা দিয়েই মানুষ খুন করে তারা। ওরা হল 'ঠগি'। ভয়ঙ্কর জিনিস ওই রেশমি রুমালের ফাঁস!

সাহেব প্রশ্ন করলেন,—কিন্তু গডেস কালীর সঙ্গে ওই রেশমি রুমালের কী সম্পর্ক?

বৃদ্ধ জবাব দিল,—ওই অস্ত্র মা ভবানী বা দেবী কালীই তুলে দিয়েছিলেন তাদের হাতে।

স্লিম্যান কিছুক্ষণ বিস্মিতভাবে বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন এই অদ্ভুত কথা শুনে।

মোমবাতির কম্পমান আলোর দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ যেন কিছুক্ষণের জন্য ডুব দিল স্মৃতির অতলে। তারপর ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল,—সাহেব তুমি তো জানো পেটের দায়ে যৌবনে অনেক পাপ কাজ করেছি। এ গল্প আমি শুনেছিলাম বহু বছর আগে এক তুসমাবাজের কাছে। ওরা ঠগি নয়, তবে ওরাও মানুষ খুন করে। ভুকুত নামের সেই তুসমাবাজ দলছুট হয়ে কিছুদিনের জন্য ভিড়েছিল আমাদের দলে। সে যে গল্পটা আমাদের বলেছিল সেটা তোমাকে বলি—

সাহেব তুমি নিশ্চয়ই জানো 'স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল' বলে তিনটে জিনিস আছে। রক্তবীজ নামে এক অসুর একবার সবাইকে যুদ্ধে হারিয়ে দখল নিল ত্রিভুবনের। রক্তবীজ নাম কেন জানো? তার এক ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়লেই তার থেকে জন্ম নিত তারই মতো এক সহস্র অসুর-দানব। পৃথিবীকে বাঁচাতে মা ভবানী কালীরূপে আবির্ভূত হলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। রক্তবীজের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হল

BanglaBook.org

তাঁর। কিন্তু দেবী যতবারই খড়্গ দিয়ে অসুরের মাথা কাটেন ততবারই তার রক্ত মাটিতে পড়ে জন্ম নেয় নতুন রক্তবীজের দল। যুদ্ধ আর শেষ হয় না। যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত-ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলেন দেবী। তখন তাঁর নামমাত্র আর কয়েকজন অনুচর অবশিষ্ট আছে। দেবী ভাবতে লাগলেন, এমন কী অস্ত্র আছে যার দ্বারা অসুর নিধন করা যাবে অথচ একবিন্দু রক্তপাত হবে না? ঘর্মাক্ত দেবী এক সময় ঘাম মোছার জন্য তাঁর কটিবাস থেকে ছিঁড়ে নিলেন রেশমি শুভ্র বস্ত্রখণ্ড। তেজ চুঁইয়ে পড়ছে দেবীর সারা দেহ থেকে। ঘাম মোছার পর সেই বস্ত্রখণ্ড বা রুমাল দেবীর তেজরশ্মিতে হলুদ বর্ণ ধারণ করল। আর এর পরই দেবী বুঝতে পারলেন কী ভাবে একবিন্দু রক্তপাত না ঘটিয়েও ধ্বংস করা যাবে এই অসুরকুলকে। তিনি তাঁর অনুচরদের হাতে সেই বস্ত্রখণ্ড তুলে দিয়ে বললেন, 'এটাই তোদের অস্ত্র। রুমালের ফাঁসে তোরা শত্রুবধ কর।'

একবিন্দু রক্তপাত আর হল না। দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল রক্তবীজের দল। যুদ্ধ শেষে দেবীর অনুচররা যখন দেবীকে রুমাল ফিরিয়ে দিতে গেল, তখন দেবী বললেন, 'রুমাল আমি তোদেরই দিলাম। এই নাগপাশ তোদের জীবিকা হবে।'—একটানা বেশ কিছু কথা বলে থামল বৃদ্ধ।

স্লিম্যান সাহেব তন্ময় ভাবে শুনছিলেন কথা। বাইরে মনে হয় ঝড় উঠেছে। বাতাস ঢুকছে ঘরে। মাঝে মাঝে মোমবাতির শিখাটা নিবুনিবু হয়ে যাচ্ছে। আলোছায়া খেলা করছে বৃদ্ধর শত বলিরেখাময় মুখে। স্লিম্যান সাহেব বৃদ্ধকে এরপর বললেন,—এ গল্প অস্পষ্ট ভাবে আগেও শুনেছি। ওরা রুমালের ফাঁসে মানুষ মারে বুঝলাম। কিন্তু মৃতদেহগুলো তো আর বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না? এত দেহ কোথায় যায়?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বৃদ্ধ বলল,—রুমাল নিয়ে অনুচরেরা জিগ্যেস করেছিল, মা, আমরা যাদের মারব তাদের দেহগুলো

BanglaBook.org

কী হবে?

মা বলেছিলেন,—ও নিয়ে তোদের ভাবতে হবে না। ও দেহগুলো হবে আমার মহাপ্রসাদ। দেহগুলো তোরা ছেড়ে রেখে যাওয়ার সময় কিন্তু পিছনে ফিরে তাকাবি না।

এরপর থেকে হাজার হাজার বছর ধরে মৃতদেহগুলো নিয়ে ঠগিদের আর ভাবতে হয়নি। দেবীই সেগুলোর গতি করতেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন দুর্মতি হল এক ঠগির। কাজ শেষ করে কিছুটা এগিয়ে পিছনে ফিরে তাকাল লোকটা। করালবদনী দেবী তখন একটা পাথরের ওপর বসে নরমাংসের মহাপ্রসাদ ভক্ষণ সবে শুরু করেছেন। লোকটা ফিরে তাকাতে ভয়ানক কুপিত হলেন দেবী। কী! দেবীর খাবারে নজর দেওয়া! সেই মৃতদেহটাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে দেবী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—তোদের মৃতদেহগুলোর দায়িত্ব আর আমি নেব না। মৃতদেহের দায়িত্ব তোদের। এই বলে অদৃশ্য হলেন মা ভবানী।

ঠগিরা এরপর পড়ল মহা সমস্যায়! সত্যিই আর মৃতদেহর গতি হয় না। মৃতদেহই তো হত্যাকারীদের ধরিয়ে দেয়। ঠগিদের মধ্যে যারা প্রবীণ ছিল তারা দূরদূরান্ত থেকে গিয়ে হাজির হল দেবীর বাসস্থান কালীঘাটের মহাশ্মশানে। সেখানে একশো আটটা নরবলি দেওয়ার পর দেবী তাদের দর্শন দিলে তারা মাকে বলল,—তোমার সন্তানরা না খেতে পেয়ে মরছে মা। তোমার কথা তুমি ফিরিয়ে নাও।

নররক্তের স্বাদ পেয়ে ভবানী তখন তুষ্ট। তিনি সন্তানদের বললেন,—বলা কথা ফেরানো যায় না।

মাটিতে পড়ে ছিল চুল্লির গর্ত কাটার জন্য একটা কোদালের ফলা। ভবানী সেটা উঠিয়ে নিয়ে এক বৃদ্ধ ঠগির হাতে দিয়ে বললেন, 'এটা তোরা রাখ, মানুষ খুন করার পর এই কোদালি দিয়ে গর্ত করে দেহ পুঁতে দিবি। আর এই কোদালি হল আমার নিশান। এই কোদালি

BanglaBook.org

তোদের পথ দেখিয়ে তোদের শিকারের কাছে নিয়ে যাবে।' সেই পবিত্র কোদালি ঠগিদের হাতে তুলে দিয়ে এরপর মিলিয়ে গেলেন ভবানী। আর এরপর থেকেই ঠগিদের তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠল কলকাতার কালীঘাট। হিন্দু-মুসলমান-ফিরিঙ্গি, সব ঠগিরই মা হলেন 'দেবী ভবানী।'

সব ধর্মের ঠগিরাই নাকি কালীঘাটে মাকে প্রণাম করতে যায়। লাহোর, মুলতান, কাশ্মীর থেকেও নাকি ঠগিরা যায় সেখানে। তুসমাবাজ একবার বলেছিলেন, কালীঘাটে প্রতি এক গন্ডা মানুষের মধ্যে অন্তত একজন নাকি ঠগি।

মোমবাতির শিখাটা বাতাসে নাচছে। জব্বলপুরের কোম্পানির কুঠিবাড়িতে বসে বুড়ো দশরাজের কথা শুনে মানুষগুলো কোথায় যায় সে ব্যাপারে বহুবছর পর একটা যুক্তিগ্রাহ্য জবাব পেলেন ক্যাপ্টেন স্লিম্যান। হ্যাঁ, হতে পারে তারা মৃতদেহগুলোকে কবর দিয়ে ফেলে, সে জন্য আর মানুষগুলোর চিহ্ন মেলে না।

সাহেব এরপর জিগ্যেস করলেন,—ওদের কি কোনও বিশেষ চিহ্ন আছে? যা দেখে ওদের চেনা যায়?

বৃদ্ধ তার সাদা চুলওয়ালা মাথাটা নাড়িয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, সে সব আমার জানা নেই, তবে শুনেছি ওদের একটা ভাষা আছে। গোপন ভাষা।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল,—তবে পুরন্দোয়া ভাষাটা কিছুটা জানে বলে শুনেছি।

—কে পুরন্দোয়া? সাহেব সোজা হয়ে বসে উত্তেজিত ভাবে জানতে চাইলেন।

—পুরন্দোয়া মানে 'পুরন্দোয়া লোহার'। 'লোহার' মানে যারা বলি দেয়। ভূপালের রাজবাড়িতে ছাগ বলি দিত লোকটা। এক সময় কালীঘাটেও ওই কাজ করত সে। জবাব দিল দশরাজ।

বাইরে ঝড় শুরু হয়েছে, ঝড় স্লিম্যানের মনের ভিতরও। তিনি

BanglaBook.org

প্রশ্ন করলেন,—লোকটা কোথায় থাকে?

দশরাজ বলল,—সে-ও আমার মতো বুড়ো লোক। নর্মদা যেখানে বাঁক নিয়েছে তার কাছাকাছি কোনও একটা গ্রামে থাকে। জব্বলপুরের ছাগহাটে সে আগে আসত। সেখানেই পরিচয়। তার ছেলে ক'দিন আগে এসেছিল এ কুঠিতে। ফেরার সময় আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

বিস্মিত স্লিম্যান বলে উঠলেন,—আমার কুঠিতে?

—হ্যাঁ, সাহেব তোমার কুঠিতে। তিন মাস আগে যখন পল্টনে লোক নেওয়ার জন্য নাম লেখানো হচ্ছিল তখন সে এসেছিল। আমাকে জিগ্যেস করছিল, এখানে কোনও চেনাজানা আছে কি না? যদি তার কাজটা হয়...। কথাটা ঠিক। সগরে কিছু অস্থায়ী সৈন্য পাঠাতে হবে। তার জন্য কুঠিতে নাম লেখানো হচ্ছিল। উইলিয়াম তাঁর পাশে টেবিলে রাখা পেতলের ঘণ্টিই বাজালেন। চাপরাশি এলে সাহেব হুকুম দিলেন,—ফৌজ জমাদারকে তার খাতা নিয়ে এখনই আসতে বলো—।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফৌজ জমাদার তার মোটা খাতা নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে এসে সাহেবকে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। খাতাটা তার থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে দেখতে শুরু করলেন। পল্টনে আবেদনকারীদের নাম-ঠিকানা ওতে লেখা আছে। পেয়ে গেলেন সাহেব। লোহার একজন আছে। তার ঠিকানাও আছে। হ্যাঁ, নর্মদার তীরেই তার গ্রাম। সাহেব এরপর নির্দেশ দিলেন,—আভি ঘোড়ে তয়ার করো। জলদি জলদি...। আর তর সইছে না সাহেবের। বাইরে ঝড়ের সঙ্গে এবার বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তুমুল বৃষ্টিতে কুঠি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন স্লিম্যান। গন্তব্য নর্মদা তীরের এক গ্রাম।

পরদিন সকালে নর্মদা তীরে এক পর্ণ কুটিরের দাওয়ায় বসে এক বৃদ্ধর সঙ্গে কথা বলছিলেন স্লিম্যান। বৃদ্ধর হাতে ধরা তার ছেলের ফৌজে ভরতি হওয়ার কাগজ। বয়স হলেও সে বেশ শক্তপোক্ত।

BanglaBook.org

বৃদ্ধ বলছিল,—হ্যাঁ, কালীঘাটে মা-র কাছে তারা আসত বটে। মা'র কাছে কেউ এলে তার পরিচয় জিগ্যেস করতে নেই। বিশেষত মাঘ মাসের দিকে আসা শুরু করত তারা। ছোট-বড় দল। সিক্কা বাঁধা হলুদ রুমালে মা-র পায়ের জবা ফুল নিত। তারা কারা আমার জানা নেই। কামারের কাজ করার জন্য ওরা আমাকে আস্ত একটা নিজামশাহী রুপোর টাকা দিয়েছিল। বড় অদ্ভুত ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বলত তারা। বাইরের লোকের সামনে না বললেও আমাদের সামনে বলত। কারণ আমরাই তাদের ভেট মা'র কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। বেশ কিছু শব্দ এখনও আমার মনে আছে...। আর হ্যাঁ, ওদের কাছে থাকে একটা কোদালি। আমি সেটা দেখেছি। সেটা ছাড়া ওরা ঘোরে না।

কালীঘাট! সে তো ফোর্ট উইলিয়ামের হাতের কাছেই বলা যায়! স্লিম্যান ফোর্ট উইলিয়ামে থাকাকালীন বেশ কয়েকবার গেছেন সে জায়গাতে। নদীর পাড়ে প্রাচীন জীর্ণ মন্দির। ভিতরে না ঢুকলেও পুণ্যার্থীদের অনেকের সঙ্গে কথাও বলেছেন। এমনও হতে পারে যাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল যাদের সন্ধানে এই নর্মদা তীরে বসে আছেন তিনি।—মনে মনে ভাবলেন স্লিম্যান।

বুড়ো বলল, ওরা নিজের মধ্যে প্রথম দেখা হলে বলে—'আউলে ভাই রামরাম', মোহরকে বলে 'খোর', বাচ্চা ছেলেদের বলে 'খোনতুরা'...।

কখনও একটানা, কখনও থেমে থেমে লোকটা স্মৃতি হাতড়ে বলে যেতে লাগল শব্দগুলো। আর তার কথা শুনে স্লিম্যান সাহেব তা নোটবইতে লিখে যেতে লাগলেন—'তাইওয়া' অর্থাৎ 'পথিক', 'টিক্কুর' মানে 'বিপদ', 'পেলাহু' মানে 'হলুদ রুমাল!'

বুড়োর কথা যখন শেষ হল তখন পঞ্চাশটার মতো সংকেত শব্দ লিপিবদ্ধ করেছেন স্লিম্যান।

BanglaBook.org

চার

হ্যাঁ, ওই রেশমি রুমালটাই হাতিয়ার এনায়েত-দুর্গাদের। যুগ যুগ ধরে ওটাই তাদের অস্ত্র। টিমোথি সাহেবের অনুচররা এনায়েতদের পুঁটলিগুলোর তল্লাশি নেওয়ার সময় হয়তো বা দেখেওছিল ওরকম কোনও কাপড়ের ফালি। কিন্তু তারা জানত না যে রাস্তার পাশের আমবাগানে শেয়াল ডাকা শেষ প্রহরে ওই নিরীহ কাপড়ের ফালিগুলো নাগপাশ হয়ে চেপে বসবে তাদের গলায়!

এনায়েতরা ধুতুরিয়া, ম্যাকফানসো, তুসমাবাজ বা পাবড়াওয়ালা ঠ্যাঙাড়ে নয়, কত শতাব্দী ধরে যে তারা তাদের এই অস্ত্র বাইরের পৃথিবীর কাছে গোপন করে আসছে তা তাদেরও জানা নেই। ওই অস্ত্রের মতোই এনায়েতদের দেখেও কেউ বুঝতে পারবে না তারা পৃথিবীর নৃশংসতম খুনি-ঠগি। বছরের ক'টা মাস বাদে বাকি সময়টা তারা নিতান্ত গ্রাম্য গেরস্ত। আর পাঁচটা ভারতীয়দের মতোই তারা সহজ-সরল জীবন যাপন করে। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার প্রতিপালন করে। দোল-মহরম পালন করে, মাজারে চাদর দেয়, সত্যনারায়ণকে বাতাসা দেয়, শিশুপুত্রকে কাঁধে চাপিয়ে রথের মেলা দেখাতে নিয়ে যায়, অসুস্থ মাতা-পিতার সেবায় রাত জাগে। তখন কেউ তারা পিতা, কেউ পুত্র, কেউ স্বামী। অন্য মানুষের সঙ্গে কোনও প্রভেদ নেই তাদের। কিন্তু, যখনই শরতের প্রথম কাশফুল ফোটে, বাড়ির আঙিনায় টুপটাপ করে খসে পড়তে থাকে শিউলি ফুল, তখন তাদের রক্ত যেন ডাক দেয়! আদিম সেই ডাক। পথে নামার ডাক। এনায়েত-দুর্গা-দীনুরা তখন কারও বাবা নয়, স্বামী নয়, সন্তান নয়, হিন্দু বা মুসলমানও নয়। তখন তাদের একমাত্র পরিচয় তারা ঠগি! তারা খুনি। তাদের একমাত্র আরাধ্য 'মা ভবানী'। তারা তাঁর সন্তান। এদের

BanglaBook.org

কোমরে গোঁজা থাকে পেলাহু। কোদালি তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় শিকারের সন্ধানে। আমীর-গরিব, ফকির-সন্ন্যাসী সবাই তখন তাদের 'খৌর' অর্থাৎ সম্ভাব্য শিকার। দলপতি 'ঝিরনী' অর্থাৎ 'সংকেত' দেওয়া মাত্রই তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে শিকারের ঘাড়ে।

সেদিন ভোরে সেই আমবাগান ছেড়ে বেরিয়ে সোজা পশ্চিমের পথ ধরল তারা। জঙ্গল পার হলেই অম্বিকাপুর। প্রাচীন জনপদ। বহু লোকের বাস সেখানে। জমিদারের কাছারি, কোম্পানি কুঠি, কাস্টমস কুঠি সব আছে সেখানে।

জঙ্গল পেরিয়ে তারা কিন্তু অম্বিকাপুরে ঢুকল না। অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভাবে শহরটাকে বেড় দিয়ে তাকে পিছনে ফেলে আবার পশ্চিমে এগোল। এনায়েতদের গন্তব্য জব্বলপুর। সেখানে গিয়ে তাদের ঠিক করার কথা তারা ভূপাল হয়ে সগরের পথ ধরবে, নাকি জব্বলপুর থেকে উত্তর-পূর্ব ধরে শোন নদী যে পথ দিয়ে আসছে, সে পথ ধরে উত্তর ভারতের দিকে এগোবে? ভূপালের পথে পথিকের সংখ্যা বেশি, কোম্পানির ফৌজ বা কাস্টসম হাউসের সংখ্যাও বেশি। কারণ, ও পথে গুজরাতি ব্যবসায়ীরা যাতায়াত করে। আবার শোনের তীর বরাবর নজরদারি কম হলেও ধনবান পথিক সেদিকে কম। তবে হ্যাঁ, শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার জন্য উত্তর ভারতের জহরতের কারবারীরা ও পথ ব্যবহার করে। সে রকম কাউকে পেলে অবশ্য এনায়েতদের ভাগ্য খুলে যেতে পারে। আর কোনওদিন পথে নামার দরকার হবে না তাদের। কয়েকটা দলের ভাগ্যে এ ব্যাপার ঘটেছেও। এনায়েতদের ভাগ্যে যে এ ঘটনা ঘটবে না, তা কে বলতে পারে? তাই ভূপাল, নাকি শোন নদীর পথ, এ ব্যাপারে এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি তারা। তাই আপাতত জব্বলপুরই তাদের গন্তব্য।

অম্বিকা নগরকে পিছনে ফেলে দুদিনের পথ পেরিয়ে এল তারা। পথে একটা নদীও পার হতে হল। এ পথে দুটো পথিক দলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাদের। কিন্তু সুবিধা হয়নি। লক্ষ্ণৌ থেকে এক ওমরাহ

BanglaBook.org

চলছিল হায়দরাবাদের নিজামের দরবারে। সঙ্গে তার পঞ্চাশজন বন্দুকধারী সেপাই। আর দ্বিতীয় দলটা তীর্থযাত্রীদের। মেয়েছেলে আর বাচ্চা-কাচ্চা মিলিয়ে দশজন লোক যাচ্ছে সোমনাথ মন্দিরে পুজো দিতে। আদর্শ শিকার। তাদের সঙ্গে দ্বিতীয় দিন দেখা হল নদীর পাড়ে। কিন্তু এনায়েতরা সেখানে পৌঁছোবার আগেই তাদের পিছু নিয়েছে জলের ঠগি বা 'ভাঙ্গু'রা। নিজেদের শিকার তারা অন্যর হাতে তুলে দেবে না। কাজেই সেখানেও কিছু করার ছিল না এনায়েতদের।

তৃতীয়দিন ভোরে উঠে যাত্রা করতেই তিলহাই মুস্তাফা পথের ডান পাশে একটা গাছের ডালে ঘুঘু দেখতে পেয়ে দেখাল অন্যদের। ঠগিরা বিশ্বাস করে এটা তাদের কাছে শুভ সংকেত। উৎফুল্ল মনে পা চালাল তারা।

কয়েক ক্রোশ দূরে একটা শুষ্ক নালার মুখে দূর থেকে তারা দেখতে পেল দুজনকে। নালার একপাশে ঘন বাঁশবন। নালা আর বাঁশবনের মাঝ বরাবর শুঁড়ি পথ বেয়ে আসছে তারা। কিন্তু লোক দুজন কাছাকাছি আসার পর প্রাথমিক ভাবে হতাশ হল সবাই। মাঝবয়সি টিকিধারী একজন লোক, গায়ে তার জীর্ণ নামাবলি জড়ানো, সঙ্গে তার বছর দশেকের একটা বাচ্চা ছেলে। তার কাঁধের লাঠির আগায় একটা ছোট্ট কাপড়ের পুঁটলি।

এনায়েতরা বুঝতে পারল এদের কাছে তেমন কিছুই পাওয়া যাবে না, তবে পথের খবর কিছু পাওয়া যেতে পারে। এক সময় তারা দুজন এনায়েতদের মুখোমুখি এসে পড়ল। দুর্গা লোকটার পরিচয় জিগ্যেস করে জানতে পারল লোকটা একজন দরিদ্র বাঙালি ব্রাহ্মণ। সঙ্গের বাচ্চাটা তাঁর ছেলে। ব্রাহ্মণ কী একটা অনুষ্ঠান উপলক্ষে জব্বলপুরে এক যজমানের বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেছিলেন। এখন পিতাপুত্র ঘরে ফিরছেন। এনায়েতরা যে নদীটা পেরিয়ে এল তাঁর ওপাশেই তাদের গ্রাম। পথের খবর জিগ্যেস করাতে তার কাছ থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর অবশ্য পাওয়া গেল। ঢাকার মনিকারদের

BanglaBook.org

একটা দল নাকি এ পথ ধরে যাচ্ছে। জহরতের কারবার করে তারা। পাঁচক্রোশ দূরে এই ব্রাহ্মণ গতকাল এক মন্দিরে ওই দলের সঙ্গেই রাত কাটিয়েছে। জনা সাতেক লোকের একটা দল। পাঁচটা খচ্চরের পিঠে মালপত্র নিয়ে ভোপাল যাচ্ছে।

ব্রাহ্মণের থেকে খবর নিয়ে আবার পা চালাতে যাচ্ছিল এনায়েতরা, হয়তো সন্ধ্যার মধ্যে ধরে ফেলা যাবে দলটাকে। ব্রাহ্মণও এবার নিজের পথ ধরতে যাচ্ছিল, হঠাৎ এনায়েত লক্ষ করল ব্রাহ্মণের ডান হাতে লাল শালু দিয়ে ঢাকা ছোট্ট একটা জিনিস সযত্নে ধরা আছে। এতক্ষণ সে হাতটা নামাবলির আড়ালে ছিল। পা বাড়াতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে নিছক কৌতূহলবশত এনায়েত জিগ্যেস করল,—আপনার হাতে ওটা কী?

ব্রাহ্মণ হেসে শালুধরা হাতটা ভক্তিভরে কপালে ঠেকিয়ে বললেন,—এখানে আমার নারায়ণ আছেন। আমাকে তিনি সব বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

এনায়েত বা দুর্গারা এরপর কেউই সেই নারায়ণ দর্শন করতে চায়নি। কিন্তু একেই মনে হয় ভবিতব্য বলে, ব্রাহ্মণ তাঁর নারায়ণকে দেখাবার জন্য শালু ওঠালেন। তাঁর নীচে ছোট্ট একটা রুপোর সিংহাসনে বসে আছেন মসৃণ ডিম্বাকৃতি কালো পাথরের নারায়ণ। দুর্গার হঠাৎ চোখ আটকে গেল সেই রুপোর সিংহাসনের দিকে। কতই বা দাম হবে সেই সিংহাসনের? বড়জোর একটা টাকা। কিন্তু তা দেখেই দুর্গা এনায়েতকে বলল,—সিংহাসনটা নিতে হবে। তিন দিনের খোরাকি হয়ে যাবে।

এনায়েত একটু ভেবে নিয়ে বলল,—তা ঠিক, কিন্তু বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না, ঢাকার ওই ব্যবসায়ীদের দলটাকে ধরতে হবে।

দীনু বলল,—হাতের সামনে একটা টাকা পাওয়া গেলে তা ছেড়ে লাভ নেই।

মুহূর্তর মধ্যে সব সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ তখন কয়েক পা

BanglaBook.org

এগিয়ে গেছেন। হঠাৎ দীনু পিছন থেকে হাঁক দিল,—ঠাকুর দাঁড়ান, একটা নিবেদন ছিল।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন ব্রাহ্মণ। দীনু তাঁর কাছে গিয়ে হাত জোড় করে বলল,—আপনার নারায়ণ দেখে বুঝতে পারলাম, আপনি সত্যি ব্রাহ্মণ। আমরা মুখ্যু মানুষ, পেটের দায়ে এখানে-ওখানে জন খাটি, ধর্মকর্ম করা বা মন্দিরে যাওয়া হয় না আমাদের। কত পাপ যে আমাদের ভগবানের ঘরে জমা হয়ে আছে কে জানে? আপনি বামুন মানুষ, সঙ্গে আবার নারায়ণশিলা! যদি আপনি দু-দণ্ড আমাদের ধর্মপাঠ শোনান তবে পরজন্মর ব্যাপারে একটু নিশ্চিন্ত হতে পারি।

দীনুর কথা শুনে অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন ব্রাহ্মণ। ইতিমধ্যে দুর্গা-এনায়েতরাও তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দুর্গা বলল,—হ্যাঁ ঠাকুর, পেটের জন্য কত মিথ্যা কথা বলতে হয় আমাদের। কত পাপ লাগে তাতে। আপনি আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করুন।

দীনু এরপর তার কোঁচড় থেকে আটআনা পয়সা বার করে নামিয়ে রাখল ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে। এই নির্জন পথে নারায়ণের আশীর্বাদে যে প্রাপ্তিযোগ হতে পারে তা জানা ছিল না ব্রাহ্মণের। নারায়ণের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ব্রাহ্মণ তাঁকে কপালে ঠেকিয়ে রাজি হয়ে গেলেন তাদের প্রস্তাবে। দীনু বলল,—এ জায়গায় বড় রোদ। চলুন আমরা ওই বাঁশঝাড়ের নীচে ফাঁকা জায়গাতে গিয়ে বসি।

ছেলেটার সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। সে ব্রাহ্মণের নামাবলির খুঁট ধরে টান দিয়ে বলল,—বাবা আর কতক্ষণ দাঁড়াবে?

দরিদ্র ব্রাহ্মণ মাটি থেকে পয়সাটা কুড়িয়ে নিয়ে সস্নেহে ছেলেকে বললেন,—আর একটু সময় আমরা এখানে থাকব বাবা। তারপর নারায়ণ আমাদের ঠিক ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।

ঘন বাঁশবন। দিন-মানেও সেখানে অন্ধকার খেলা করে। ঝিঁঝিঁ পোকার কলতান ভেসে আসছে। চার দিকে অসংখ্য নুইয়ে পড়া বাঁশ।

BanglaBook.org

মৃদু বাতাসে খসখস পাতার শব্দ হচ্ছে। পায়ের নীচে খসে পড়া পাতার রাশি। কিছুটা নুইয়ে পড়া একটা বাঁশঝাড়ের নীচে পাতার গালিচার ওপর উত্তর দিকে মুখ করে বসলেন ব্রাহ্মণ। তাঁর ডান পাশে বসালেন নারায়ণকে, আর বাঁ-পাশে বসল বাচ্চা ছেলেটা। পুঁটলিতে একটা পাত্রে গঙ্গাজল ছিল। তা নিজের মাথায় ছিটিয়ে শুদ্ধ হয়ে নারায়ণকে প্রণাম করে ব্রাহ্মণ তার স্মরণ থেকে 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা'-র খণ্ডিতাংশ পাঠ শুরু করলেন—

'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি—
নায়ং ভূত্বাহভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরানো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে...।'

BanglaBook.org

ব্রাহ্মণ এক-একটা সংস্কৃত শ্লোক বলার পর তা এনায়েতদের সামনে সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। বাচ্চা ছেলেটার অবশ্য শ্লোক শোনার ব্যাপারে আগ্রহ নেই। কিছুকাল আগেই উপনয়ন হয়েছে তার। গৌরবর্ণ, মুণ্ডিত মস্তক আদুর গায়ে উপবীতধারী ছেলেটা বড়বড় চোখে উদাস ভাবে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। যে পথ ধরে বাড়ি ফিরবে সে। বেশ কিছুদিন ঘর ছাড়া। হয়তো সে ভাবছে তার মায়ের কথা, তার পাঠশালার বন্ধুদের কথা, অথবা বাড়িতে খাঁচায় পোষা তার আদরের টিয়া পাখিটার কথা...

বেশি সময় ব্রাহ্মণের পিছনে নষ্ট করা যাবে না। সেই জহরতের ব্যবসায়ীদের ধরতে হবে। এনায়েতরা সবাই ব্রাহ্মণের সামনে বসে। শুধু বংশী মালী আর মাধব বলে দুজন লোক ব্রাহ্মণের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শুনছে। তারা তাকিয়ে আছে এনায়েতের দিকে 'ঝিরনী' তোলা অর্থাৎ সংকেতের অপেক্ষায়।

ব্রাহ্মণ একটা নতুন শ্লোক ধরলেন—

'ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ।'

শ্লোক শেষ করে ব্রাহ্মণ তার ব্যাখ্যা দিতে লাগলেন,—এ কথার অর্থ হল, কোনও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আত্মাকে ঘায়েল বা ছেদ করা যায় না, আগুনে তাকে পোড়ানো যায় না। ভগবান বলেছেন যে...

তার কথা শেষ হল না। তার আগেই এনায়েত ঝিরনী দিয়ে দিল,—মাধব গঙ্গাজল লাও...!

মুহূর্তের মধ্যে চিরদিনের জন্য থেমে গেল ব্রাহ্মণের কণ্ঠস্বর, ছেলেটার চোখ থেকে হারিয়ে গেল ঘরে ফেরার রাস্তা, তার মায়ের মুখ, পাঠশালা...। নিষ্পাপ শিশুর পলকহীন ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখ দুটো শুধু চেয়ে রইল অনন্ত আকাশের দিকে।

সিংহাসন ছাড়া ব্রাহ্মণের পুঁটুলি থেকে বেরল এক গন্ডা তামার পয়সা, একজোড়া নতুন শাঁখা আর একটা সিঁদুর কৌটো। সম্ভবত ব্রাহ্মণ তাঁর স্ত্রী-র জন্য সেগুলো নিয়ে ঘরে ফিরছিল। সে হতভাগিনী কোনওদিন জানবে না, নালার পাশের এই বাঁশবন চিরদিনের জন্য তার এ জিনিসগুলো কেড়ে নিল।

কবর খোঁড়া হল। তাতে পাশাপাশি শোয়ানো হল পিতা-পুত্রকে। নারায়ণ শিলাও হারিয়ে গেলেন তাদের সঙ্গে। কাজ শেষ করে গর্ত বুজিয়ে পাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়ার পর সেই জহরতের কারবারিদের ধরার জন্য আবার পথে নামল সবাই। দ্রুত পা চালাল তারা। পিছনে পড়ে রইল নালার পাশের অজানা সেই বাঁশবন। যেখানে নুইয়ে পড়া বাঁশঝাড়ের অন্ধকারে বাতাসে হতভাগ্য ব্রাহ্মণের কণ্ঠস্বর তখনও যেন ভেসে বেড়াচ্ছে—"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবক ঃ...

ঠিক এই সময়ই নর্মদা তীরের সেই গ্রাম থেকে ঘোড়ার পিঠে নিজের হাউসে ফিরছিলেন স্লিম্যান। প্রচণ্ড উত্তেজিত তিনি। মনের

BanglaBook.org

মধ্যে বেশ কিছু শব্দ ঘুরপাক খাচ্ছে। 'খৌর, গব্বা, ঝিরনী'—এসব নানা অদ্ভুত শব্দ!

পাঁচ

—'গব্বা' মানে?

—কবর।

—'আঙুছা' মানে?

—ফাঁস।

—'তাগল' মানে?

—নেকলেস।

—'ঝিরনী?'

—সংকেত। উত্তর দিলেন স্লিম্যান।

—বাঃ, একদম সঠিক উত্তর দিয়েছ তুমি। হাতে ধরা প্রশ্নপত্রটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে এমিলি বললেন স্লিম্যানকে। পরীক্ষার্থী স্লিম্যান, পরীক্ষক স্ত্রী এমিলি। প্রশ্নপত্রটা অবশ্য এমিলিকে স্লিম্যানই বানিয়ে দিয়েছিলেন। নর্মদার গ্রাম থেকে সেই বৃদ্ধ তার স্মৃতি হাতড়ে চল্লিশটা মতো শব্দ তুলে দিয়েছেন স্লিম্যানের কাছে। সেই শব্দগুলো স্লিম্যান কেমন রপ্ত করেছেন তারই পরীক্ষা নিচ্ছিলেন এমিলি। যদিও শব্দগুলো কোন ভাষার বা স্লিম্যান কেন শব্দগুলো মুখস্থ করছেন সে সম্বন্ধে এমিলির বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। স্লিম্যানকে প্রশ্ন করায় তিনি শুধু মুচকি হেসেছেন।

এমিলি জানেন ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ব্যাপারে স্লিম্যানের আগ্রহ প্রচুর। এ দেশে আসার পর দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অন্তত সাতটা ভাষা শিখে ফেলেছিলেন তিনি। শুধু কি তাই, অন্য সব ব্যাপারেও তাঁর প্রবল আগ্রহ। এই তো সেদিন এখানে আসার পর নর্মদা তটে

BanglaBook.org

তিনি খুঁজে পেলেন বিরাট এক প্রাণীর ফসিল, তারপর সেটা জাহাজে তুলে পাঠিয়ে দিলেন লন্ডন মিউজিয়মে।

ক'দিন আগে সেখানকার কর্তৃপক্ষ মারফত কোম্পানির গভর্নরের কাছে বার্তা এসেছে যে, ওই প্রস্তরীভূত কঙ্কালটা নাকি প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী ডাইনোসরের! এশিয়া মহাদেশের প্রথম প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর ফসিল আবিষ্কার করার কৃতিত্ব নাকি সগর ও নের্বুদার কোম্পানির এজেন্ট ক্যাপ্টেন উইলিয়াম স্লিম্যানের। এত বড় একটা ঘটনা, স্বয়ং গভর্নর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন স্লিম্যানকে। কিন্তু স্লিম্যানের কোনও হেলদোলই নেই। তিনি এখন কী একটা নতুন খেয়ালে মেতেছেন এই সব ভাষাটাষা নিয়ে! হয়তো কোনও দেশীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানার জন্যই তাঁর এই খেয়াল। এমনই অনুমান এমিলির।

সাহেবের কুঠিবাড়ির বাইরে সূর্যালোকিত সকাল। নীল আকাশে সাদা তুলোর মতো পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। কুঠিবাড়ির পিছনের মাঠে কাশফুল ফুটেছে। ওই মেঘ আর কাশফুল জানান দিচ্ছে যে হিন্দুদের গডেস দুর্গার পুজোর সময় আসছে। কলকাতায় থাকাকালীন এই পুজোর সময় স্লিম্যান শোভাবাজার জমিদার বাড়িতে পুজো দেখতে গিয়েছিলেন। অপরূপ কিন্তু বিচিত্র দেখতে এই গডেস দুর্গা। তাঁর দশটা হাত! তাঁর পুজো খুব ধুমধাম করে করে হিন্দুরা। এ সময়টা তারা উৎসবে মেতে থাকে। আর তার পরই আসে গডেস কালীর পুজো। গডেস কালী! স্লিম্যান যাদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁদের দেবী তিনি।

দিনটা বড় সুন্দর। স্লিম্যান বেরিয়ে পড়লেন কুঠি থেকে। গন্তব্য সামনের এক হাট। বহু লোকের সমাগম সেখানে। কে বলতে পারে স্লিম্যান সাহেব যাদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাদের কেউ সেখানে নেই?

স্লিম্যান পৌঁছে গেলেন হাটে। স্থানীয় মানুষদের অধিকাংশ স্লিম্যানকে চেনে, স্লিম্যানও চেনেন কিছু লোককে। তবে বেশ কিছু অচেনা পথিকও আসে এই হাটে। জব্বলপুর হয়ে যে সব লোক ভূপাল যায়

BanglaBook.org

তাদের মধ্যে অনেকেই রসদ সংগ্রহ করে নিয়ে যায় এই হাট থেকে। ভূপাল যাওয়ার পথে এরপর একটাই মাত্র হাট, সেটা নরসিংহপুরে। শুধু যে দেশীয় মানুষরাই হাটে আসে তা নয়, ফিরিঙ্গিরাও থাকে। তারা পথিক, অথবা কোম্পানির বিভিন্ন কর্মচারী।

তবে অচেনা ফিরিঙ্গিদের সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখতে চান না স্লিম্যান। ঠগির দলে তো ফিরিঙ্গি থাকতেই পারে। যেমন তুসমাবাজ খুনিদের দলপতিই এক ইংরেজ। তুসমাবাজরাও ঠগিদের মতো ভ্রাম্যমান ও গোষ্ঠীবদ্ধ। তারা পথিককে রাস্তায় দড়ির খেলা দেখায়। বড় অদ্ভুত সে খেলা। দড়ির ফাঁস মাটিতে ফেলে পথিকের হাতে একটা কাঠি তুলে দিয়ে তারা বলে সেই কাঠিটা ফাঁসের মধ্যে আটকাতে। ব্যাপারটা যত সহজ মনে হয় আসলে তা ততটাই কঠিন। ফাঁসে কাঠি আটকাতে পারলে পথিক বাজি জিতল, নইলে বাজিকর বাজি জিতে পথিকের সর্বস্ব হরণ করে হাসতে হাসতে চলে যায়। শেষের ব্যাপারটাই ঘটে বেশি। আর পথিক বাজি জিতলে তার পক্ষে সেটা আরও ভয়ঙ্কর হয়। পথিককে ভুলিয়ে ভালিয়ে কোথাও নিয়ে গিয়ে তাকে বিষ খাইয়ে খুন করে নিজেদের জিনিস ফিরিয়ে নেয় তুসমাবাজরা।

তুসমাবাজি খেলাটার জন্ম অবশ্য এ দেশে নয়। এ খেলাটা স্লিম্যানদের সঙ্গেই এ দেশে এসেছে। লন্ডনের রাজপথে জুয়াড়িরা এই দড়ির খেলা খেলে। নাম 'প্রিকিং দি গার্টার', যার ভারতীয় সংস্করণ 'তুসমাবাজি'।

চুরির অভিযোগে কানপুর রেসিডেন্সি থেকে 'ক্রেয়াগ' নামের এক ব্রিটিশ সৈন্যকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। অপরাধপ্রবণতা তার মজ্জাগত ছিল। কয়েকজন দেশি অনুচর জুটিয়ে কানপুরে প্রথমে একটা দল খোলে ক্রেয়াগ। এখন তার দেখানো পথ ধরে গোটা উত্তর ভারত ছেয়ে গেছে তুসমাবাজে।

স্লিম্যানের মতো উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ সিভিল সার্জেন্টরা জানেন যে ব্রিটেন থেকে এদেশে আসা প্রতি জাহাজেই এমন কিছু লোক আসে

BanglaBook.org

যাদের অতীতটা ওদেশে অন্ধকারময়। শাস্তি এড়াবার জন্য এদেশে পালিয়ে আসে তারা। কোম্পানি তাদের নিজেদের কোনও কাজে বহাল করে না। এদেশে ভিড়ে মিশে গিয়ে তারা নানা ভাবে জীবিকা অর্জন করে। কেউ দেশীয় রাজার ফৌজে ভরতি হয়ে কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে, নবাবের হয়ে কোম্পানির ঘরে গুপ্তচরবৃত্তি করে, কেউ কেউ হয়ে যায় তুসমাবাজ বা খুনি ম্যাকফানযো। সাদা চামড়ার লোক যদি তুসমাবাজ বা ম্যাকফানসা হতে পারে তবে ঠগিও হতে পারে। এদের সকলেরই তো আসল পরিচয় তারা খুনি।

হাটে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন স্লিম্যান। অপরিচিত কোনও পথিকের দঙ্গল দেখলেই সেখানে কোনও ছুঁতোয় দাঁড়িয়ে পড়ে তাদের নির্দিষ্ট ভাবে দেখছেন না এমন ভাব দেখিয়ে শোনার চেষ্টা করতে লাগলেন তাদের কথাবার্তা। কেনাকাটি দরদামের সময় টাকাকে কি কেউ 'কাররা' বা 'খোর' বলছে? দুই বা তিন সংখ্যা বোঝাতে হঠাৎ কি কেউ উচ্চারণ করে ফেলছে 'দুরু' বা 'তুরু'?

সেরকম শব্দ খোঁজ করতে করতে স্লিম্যান হাজির হলেন হাটের অন্য প্রান্তে এক জায়গাতে। একটা আমগাছের তলায় নানা বয়সি হাটুরে লোকজন গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাটে লোকে শুধু কেনাবেচা করতেই আসে না, মনোরঞ্জনের জন্যও আসে। ভালুকনাচ হয়। সাপুড়েরা সাপের খেলা দেখায়। বেদেদের দল দেখায় শূন্যে দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটা বা নাইফ থ্রোয়িং। হয়তো সেরকমই কিছু হচ্ছে সেখানে।

স্লিম্যান কাছে যাওয়ার পর বুঝতে পারলেন তাঁর অনুমান সত্য। গাছের তলায় দুজন লোক কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। ব্যাপারটা কী? সাহেবকে দেখে কাস্টমস হাউসের একজন দেশীয় সেপাই এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। সাহেব তার কাছে জানতে পারলেন গতকাল এই সময় একজন বাজিকর নাকি মাটির দশফুট নীচে জীবন্ত সমাধিতে গেছেন। আজ তিনি আবার মাটির তলা থেকে বাইরে আসবেন, সে

BanglaBook.org

জন্যই মাটি খোঁড়া চলছে। এ খেলার নাম 'জীবন্ত সমাধির খেলা'।

এ রকম অদ্ভুত ব্যাপার আবার হয় নাকি? একটা মানুষ মাটির তলায় এতক্ষণ থাকতে পারে? সেই সেপাই জানাল,—হ্যাঁ সাহেব, ব্যাপারটা সত্যি। সকলের চোখের সামনেই ও কবরে গেছে। এখনই দেখবেন সে ওপরে উঠে আসবে। ওর বাড়ি জব্বলপুরেই, মাঝে মাঝে হাটে খেলা দেখাতে আসে।

তার কথা মিলে গেল। গর্ত খুঁড়ে স্লিম্যানের চোখের সামনেই তুলে আনা হল একজন মাঝবয়সি লোককে। প্রথমে সে মূর্ছা গেছে মনে হলেও এক সময় সে চোখ মেলে উঠে বসল। হাততালি আর তামার পয়সায় ভরে উঠতে লাগল বাজিকরের পাত্র। সাহেবও খুশি হয়ে নগদ রুপোর একটা টাকা রাখলেন সেই পাত্রে। স্লিম্যান এ দেশটাকে যত দেখছেন তত অবাক হচ্ছেন। এ দেশের মানুষজন বড় বিচিত্র। স্লিম্যান যে খেলাটা দেখলেন তা দীর্ঘদিনের যোগাভ্যাসের ফল। স্লিম্যান শুনেছেন, এদেশে কিছু সাধু-সন্ন্যাসী আছেন, যাঁরা নাকি যোগাভ্যাসের ফলে না খেয়ে, এক বিন্দু জল স্পর্শ না করে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিতে পারেন। এক পায়ে পাথরের মূর্তির মতো দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন। এ সব যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নিছক গল্পকথা নয় আজ তার কিছুটা প্রমাণ পেলেন ক্যাপ্টেন স্লিম্যান।

খেলা এরপর ভেঙে গেল। লোকজনও এদিক-ওদিকে চলে যেতে শুরু করল। স্লিম্যানও তাঁর হাউসে ফিরবেন। হঠাৎ তাঁর কানে গেল, একজন লোক, আর একজনকে বলছে,—চল এবার নদীর ঘাটে যাই। আজ ভারি মজা আছে সেখানে। আবার পুণ্যও হবে। সেখানে আজ একজন সতী হবে।

সতী হওয়ার ব্যাপারটা শুনেছেন স্লিম্যান। স্বামীর মৃত্যুর পর অনেক স্ত্রী স্বামীর চিতায় সহমরণে যান। হিন্দু ধর্মে ব্যাপারটা নাকি খুব পবিত্র। যিনি সতী হন তাঁকে দেবীর সমান মর্যাদা দেওয়া হয়।

BanglaBook.org

শুনেছেন স্লিম্যান, তবে দেখেননি। স্বামীর মৃত্যুতে কেউ তার চিতায় ঝাঁপ দিচ্ছে, স্বামীর প্রতি ভালোবাসার আর শ্রদ্ধার এর চেয়ে বড় নিদর্শন আর কী হতে পারে? হাটের লোকদুটোর সঙ্গে কথা বলে সতী হওয়ার খবরটায় নিশ্চিত হয়ে কৌতূহলবশত স্লিম্যান রওনা হলেন পাঁচ ক্রোশ দূরের নদীর ঘাটে। ওখানে একটা কাস্টমস হাউস আছে।

স্লিম্যান কাস্টমস হাউসে পৌঁছোতেই কাস্টমস হাউসের দেশি দারোগা বেশ ভয় পেয়ে গেছিল। সাহেব কোনও কাগজপত্র পরীক্ষা করতে এসেছেন নাকি? পরে তাঁর আগমনের কারণটা জানতে পেরে কাস্টমস হাউসের কাঠের জাফরি ঘেরা বারান্দায় যথাসম্ভব আরামদায়ক ভাবে সাহেবের জন্য বসার ব্যবস্থা করলেন। বারান্দার একটু নীচেই ঘাট। সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায় সেখান থেকে। সতী হওয়ার খবরটা ইতিমধ্যেই লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছে। আশেপাশের গ্রাম থেকে নানাবয়সি নারী-পুরুষ জমা হতে শুরু করেছে নর্মদার ঘাটে। এমন পবিত্র ঘটনা চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য তো সচরাচর ঘটে না। তাই দলে দলে লোক ছুটে আসছে এ ঘটনার সাক্ষী হতে। কাস্টমস হাউসের বারান্দায় বসে স্লিম্যান প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন সবকিছু।

সময় যত এগিয়ে চলতে লাগল ভিড় তত বাড়তে লাগল। এক সময় দূর থেকে ঢাকের শব্দ কানে এল স্লিম্যানের। সেই শব্দ শুনে জনতার মধ্যেও একটা চাঞ্চল্য শুরু হল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সতীমা এসে পড়বেন ঘাটে! কাস্টমস হাউসের দারোগা থেকে খাজাঞ্চি, কেরানি, এমনকী সেপাইরা পর্যন্ত সব কাজ ফেলে এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দায়।

এক সময় খুব কাছে চলে এল সেই শব্দ। ঢাকের বাদ্যি, শাঁখের আওয়াজ, হরিধ্বনি, খোল-করতাল, লোকজনের চিৎকার-চেঁচামেচি মিলিয়ে এক বীভৎস শব্দ। ওপর থেকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে নদীর পাড়ে। সেই প্রশস্ত পাথুরে ধাপের দুপাশে সার বেঁধে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে পড়ল জনতা। ধাক্কাধাক্কিতে দু-চার জন লোক ছিটকে জলে পড়ল। সেদিকে কারও ভ্রুক্ষেপ নেই, সবাই দেখতে চায় সতীমাকে। স্লিম্যানের চোখেও কৌতূহল।

খোল-করতাল নিয়ে প্রথম প্রবেশ করল হরিনাম সংকীর্তনের দল। তারপর শববাহকেরা। চারজন লোকের কাঁধে শুয়ে আছে একজন অতিবৃদ্ধ লোক। তার কেশহীন মাথাটা একটা নারকেলের মতো নড়ছে। স্লিম্যান বুঝতে পারলেন যথেষ্ট পরিণত বয়সেই মারা গেছে লোকটা। শববাহীরা তাকে নীচে নামিয়ে নদীর পাড়ে নিয়ে গেল। আর এরপরই তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সতীমাকে আনা হল ঘাটে। বিরাট একটা জটলার মধ্যে সতীমা। তাকে ঘিরে ঢাক বাজছে, ধুনুচি নাচ হচ্ছে, সতীমার নামে জয়ধ্বনি হচ্ছে।

বউটাকে দেখে চমকে উঠলেন স্লিম্যান। কত আর বয়স হবে মেয়েটার? ষোলো-সতেরো! কপালে তার সিঁদুর লেপা, হাতে নতুন শাঁখা, নতুন শাড়ির আঁচল লুটাচ্ছে মাটিতে, অবিন্যস্ত কেশদাম, আলুথালু বেশ। দুজন এয়োস্ত্রীর কাঁধে ভর দিয়ে সে এসে দাঁড়াল ঘাটের মাথার ওপরে ফাঁকা জায়গাতে। টলছে বউটা। ছোটছোট ছেলেমেয়েরা এসে বউটাকে প্রণাম করছে, এয়োস্ত্রীরা তার কপালে ছুঁইয়ে নিচ্ছে তাদের শাঁখা-সিঁদুর। সতী তো সাক্ষাৎ দেবী!

ওদিকে নদীর পাড়ে চিতার কাঠ সাজানো হয়েছে। তিনজন মাঝবয়সি ভুড়িওয়ালা ধুতি পরা লোক সে ব্যাপারটার তদারকি করছে। স্লিম্যান তার পাশে দাঁড়ানো কাস্টমস হাউসের দারোগাকে জিগ্যেস করলেন,—ওদের পরিচয় কী? এইটুকু মেয়ের সঙ্গে ওই বুড়োর বিয়ে হয়েছিল?

দেশি দারোগা তাঁকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন,—ব্রাহ্মণ পরিবার হুজুর। বাঙালি ব্রাহ্মণ। জাত যাওয়ার ভয়ে বছর খানেক আগে বুড়ো লোকটার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল সতীমার। বুড়োটার দ্বিতীয় বিবাহ। প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা গেছিল বহুবছর আগে। ওই যে

BanglaBook.org

মোটাসোটা লোক তিনজন চিতা সাজাবার তদারকি করছে ওরা তার প্রথম পক্ষের ছেলে। অনেক সম্পত্তির মালিক ছিল বুড়োটা।

চিতার কাঠ সাজানো হল। বুড়োটাকে স্নান করিয়ে চিতায় তোলা হল। ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়া শুরু করল, মুখাগ্নি হল। আর এর পরই আরও জোরে বাজতে শুরু করল ঢাক। বউটাকে এবার ধীরে ধীরে নীচে নামানো শুরু হল। শাঁখ, কাঁসর বাজছে, সিঁড়ির দুপাশে মাথায় চুল বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে মহিলারা। সেই চুল মাড়িয়ে ধাপ বেয়ে চিতার দিকে এগোচ্ছেন সতীমা। জয়ধ্বনি হচ্ছে, 'সতী মাঈ কি জয়! সতী মাঈ কি জয়!' চিতায় আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। বউটার হাঁটার ধরন দেখে স্লিম্যান এবার স্পষ্ট বুঝতে পারলেন বউটাকে নিশ্চয়ই কোনও মাদক খাওয়ানো হয়েছে! সে আর হাঁটতে পারছে না। দুজন শক্ত সমর্থ পুরুষ তাকে ধরে নিয়ে চলেছে।

তাহলে সত্যি কি স্বামীর প্রতি ভালোবাসায় মেয়েটা চিতায় উঠছে না? স্লিম্যানের ধারণা স্পষ্ট হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। চিতার সামনে আসা মাত্রই বউটার যেন হুঁশ ফিরে এল। আর্তচিৎকার করে উঠল সে। যেন ঠেলে সরিয়ে দিতে গেল তাকে ধরে থাকা লোকগুলোকে। কিন্তু তার আগেই বুড়োর দু-জন ছেলে এসে দাঁড়িয়ে ছিল বউটার পিছনে। মুহূর্তের মধ্যে তাকে তারা পাঁজাকোলা করে ছুড়ে ফেলে দিল চিতার আগুনে। জনতা চিৎকার করে উঠল, 'সতী মাঈ কি জয়!' ঢাকের বাজনা, শাঁখের শব্দ, জনতার চিৎকারে ঢাকা পড়ে গেল সেই ষোড়শী বালিকার আর্তনাদ। নর্মদা তীরে শেষ বিকালের আলোতে চিতার আগুন ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিল তার সোনার অঙ্গ।

এ তো খুন! হাজার হাজার জনতা খুন করল একটা মেয়েকে! ব্যাপারটা সম্বন্ধে স্লিম্যানের যে ধারণা ছিল তা ভেঙে গেছে। উত্তেজনায় কখন তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন তা তাঁর নিজেরও খেয়াল নেই। তিনি এরপর লক্ষ করলেন কাস্টমস হাউসের দারোগা থেকে

BanglaBook.org

শুরু করে সেপাইরা পর্যন্ত বন্দুক পাশে নামিয়ে চিতার আগুনের দিকে তাকিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে ভক্তি ভরে প্রণাম জানাচ্ছে সতীমার উদ্দেশ্যে। এই পুণ্যদৃশ্য দেখার সুযোগ পেয়ে তারাও কম আপ্লুত নয়! স্লিম্যানের অনেক সতীর্থ ভারতীয়দের সম্বন্ধে যে কথাটা ব্যবহার করেন, কিন্তু স্লিম্যান কোনওদিন যা ব্যবহার করেননি, এ দৃশ্য দেখে জীবনে সেই প্রথমবার রাগে ক্রোধে সেটাই বলে উঠলেন,—ব্লাডি, ফুল ইন্ডিয়ান!

সাহেবের কথাটা কানে গেল পাশে দাঁড়ানো দারোগা সাহেবের। তিনি আমতা আমতা করে বললেন,—সাহেব এটা ধর্মের ব্যাপার!

—ধর্মের ব্যাপার! যদি বউটা তোমার মেয়ে হত তবে এই খুনটা দেখতে পারতে তুমি? গর্জে উঠলেন স্লিম্যান।

স্লিম্যান এরপর তাঁর ক্রোধ সম্বরণ করে নিলেন। মনে মনে ভাবলেন, 'হ্যাঁ, এ ধর্মের ব্যাপার।' এই নের্বুদার সর্বেসর্বা কোম্পানির পলিটিকাল এজেন্ট স্বয়ং স্লিম্যানের ক্ষমতা নেই এই ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার। যারা সতীমা-র নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে তারা ঠগিদের থেকে কম নৃশংস নয়। ঠগিরা মানুষ খুন করে জীবিকার জন্য, আর এরা করে ধর্মের জন্য। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে কালের নিয়মে একদিন হয়তো ছেড়ে যেতে হবে এ জায়গা। কিন্তু পাঁচশো বছর পরও এরকমই কুসংস্কারগ্রস্থ থেকে যাবে এই দেশ।

কারও সঙ্গে আর কোনও কথা না বলে নিঃশব্দে কাস্টসম হাউস ছেড়ে বেরিয়ে ঘোড়ায় চেপে ভারাক্রান্ত মনে নিজের কুঠির দিকে যাত্রা শুরু করেন স্লিম্যান। দিনের শেষ আলো ছড়িয়ে নর্মদার তটে তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। তখনও সতীমার নামে জয়ধ্বনি চলছে সেখানে। চিতার আগুনে খাক হয়ে যাচ্ছে এক ষোড়শী। নদীর পাড় থেকে ভেসে আসা সেই চিৎকার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এরপর তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছোটালেন স্লিম্যান। আজ তিনি যা প্রত্যক্ষ করলেন তার তুলনায় ঠগিরা আর কত পাপ করে?

BanglaBook.org

ছয়

হ্যাঁ। এনায়েত, দুর্গা, ঝগড়ু, মাধব, দীনু, এরা কেউই মনে করে না এ কাজে পাপ লাগে। তাদের মতো আরও কয়েক হাজার মানুষ যারা এই অন্ধকারময়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতের পথে পথে শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় তারাও মনে করে এ কাজে তাদের পাপ হয় না। পাপ হবে কেন? স্বয়ং ভবানীই তো তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এই রেশমি রুমাল, কোদালির নিশান। তারা ভবানীর সন্তান। তারা যা করে তা ভবানীই করান। নইলে শরতের প্রথম কাশফুল ফোটার সময় মনের ভিতর তাদের কে হাঁক দেয় ঘর ছেড়ে পথে নামার জন্য? ওই ডাক দেবীরই আহ্বান। ডাক অগ্রাহ্য করলে কুপিত হবেন দেবী।

একবার এনায়েতদের এক অনুচর দেবীর নির্দেশ অমান্য করেছিল। চার-পাঁচ মাস পর এনায়েতরা জানতে পারল তারা ঘর ছাড়ার তিন দিনের মধ্যেই হঠাৎই নাকি সেই অনুচর রক্তবমি করে মারা যায়।

এনায়েতরা বিশ্বাস করে যাদের তারা হত্যা করে তারা দেবীর কাছে কোনও না কোনও পাপ করেছে। রক্তবীজের মতো তাদেরকে এনায়েত-দুর্গাদের মাধ্যমে নিধন করেন দেবী ভবানী। তাহলে কী এমন পাপ করেছিল সেই ব্রাহ্মণ বালক? বাবার সঙ্গে যার আর ঘরে ফেরা হল না, নালার পাশে ঝিঁঝি ডাকা অন্ধকার বাঁশবনে যে হারিয়ে গেল?

এ সব কূট প্রশ্ন অবশ্য এনায়েতদের কেউ করে না। এ পর্যন্ত ন'শো জনের মতো মানুষকে তার হলুদ রুমালে ফাঁস পরিয়েছে এনায়েত, দুর্গা পাঁচশোর বেশি মানুষকে। এনায়েতের দলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য যে, তারও হাতের ছোঁয়াতে মিলিয়ে গেছে অন্তত পঞ্চাশ জন

BanglaBook.org

লোক। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল শিশু বা নারী। না, এ প্রশ্ন এনায়েতদের কেউ করে না। কারণ, তাদের খোঁজ জানা নেই কারও। হাজার হাজার বছর ধরে ঠগিরা নিজেদের গোপন করে রেখেছে পৃথিবীর মানুষের থেকে। লোকে ভাবে এ দেশের পথে-প্রান্তরে যেমন অনেক আজগুবি গল্পকথা শোনা যায়, তেমনই ঠগি একটা আজগুবি ব্যাপার। বাস্তবে ঠগি বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই। অথচ হাজার বছর ধরে এ দেশের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঠগিরা, তাদের হাতের ছোঁয়ায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হারিয়ে গেছে হাজার হাজার মানুষ।

ঠগিদের প্রাচীনত্বের প্রমাণ মেলে ইলোরা পাহাড়ের গায়ে। সপ্তম শতকে রাষ্ট্রকূট আমলে নির্মিত হয়েছিল ইলোরার স্থাপত্যকীর্তি। লোকে বলে পৃথিবীতে এমন কোনও পেশা নেই, যা ইলোরার পাষাণ গাত্রে খোদিত হয়নি। ঠগিরাও আছে সেখানে। যৌবনে এনায়েত একবার গেছিল সেখানে। সে দেখেছে সেখানে পাথরের গায়ে খোদিত আছে তাদের নানা কর্মপদ্ধতি। ফাঁদ পরিয়ে মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে, সেই মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কবরের জন্য, কবরের গর্ত খোঁড়া হচ্ছে ইত্যাদি সব ছবি।

সাধারণ মানুষরা অবশ্য সে সব ভাস্কর্যের অর্থ বুঝতে পারে না, এনায়েত-দুর্গারা সে সব ছবি চিনতে পারে। এনায়েত বংশ পরম্পরায় আবার আরও একটা গল্প শুনে আসছে এদেশে তাদের উৎপত্তির ব্যাপারে। তাদের আদি পুরুষ নাকি ছিলেন পারসিক দস্যু দলপতি সাগার্তি। এনায়েতরা তারই বংশধর। মুসলমান শাসকরা যখন এদেশে আসে তখন তাঁদের পায়ে-পায়েই এদেশে পা রাখে সাগার্তির সন্ততি, এনায়েতদের পূর্বপুরুষরা। দিল্লির উপকণ্ঠে এক গ্রামে আস্তানা গাড়ে তারা। সুলতানের হয়ে তারা যুদ্ধ করত। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে তারা দিল্লি নগরীকে রক্ষা করত। সুলতান জালালউদ্দিন ও সুলতান আলাউদ্দিন খলজির আমলে ঠগি সর্দারদের প্রতিপত্তি খুব বৃদ্ধি পায়।

BanglaBook.org

সেই শুরু, তারপর মহাকালের রথের পিছন পিছন ঠগিরাও ছড়িয়ে পড়ে এ দেশের মাটিতে। দানব রক্তবীজের মতো হাজারে হাজারে জন্ম নেয় তারা। দেশ-কালের বিচারে গড়ে ওঠে সুলতানি, জুমালদেহী ইত্যাদি ঠগিদের ঘরানা।

এ যাত্রায় এনায়েতের প্রধান সহযোগী দুর্গা বাংলাদেশের ঠগি। আগে তার নিজস্ব দল ছিল। তার দল ভেঙে যাবার পর কয়েকবছর ধরে কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে এনায়েতের সঙ্গে সে পথে নামছে। এনায়েত বা ফিরিঙ্গি ও তার নিজস্ব লোকরা হিন্দিভাষী, উত্তর ভারতীয় লোক। দুর্গা, মাধব আর দু-একজন বাংলাদেশের নদীপাড়ের লোক। দলে বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোক থাকলে কাজের সুবিধা, তাই এনায়েত দলে নিয়েছে তাদের।

দুর্গা, মাধবদের পূর্বপুরুষরা কীভাবে বাংলাদেশের মাটিতে এল তা নিয়ে আবার একটা গল্প আছে দুর্গাদেরও। সে গল্প হল জালালউদ্দিন খলজির আমলের। সন-তারিখ দুর্গাদের জানা না থাকলেও সেটা ১২৯০ খ্রিস্টাব্দ। ঠগিদের দিল্লিতে তখন খুব প্রতিপত্তি। কী একটা ঝগড়াঝাঁটির কারণে একদল ঠগি হঠাৎ বিষ্ঠা দিয়ে বসল সুলতানের অত্যন্ত প্রিয় এক অনুচরকে। সুলতান ব্যাপারটা শুনে সেই ঠগিদলকে কয়েদ করে প্রানদণ্ডের আদেশ দিলেন। ঠগিদের মধ্যে যারা সে সময় সুলতানের বিভিন্ন কাজে যুক্ত ছিলেন তারা ঠগিদের প্রাণভিক্ষার জন্য কাতর আবেদন জানালেন ক্রুদ্ধ সুলতানের কাছে। দিল্লি রক্ষায় ঠগিদের অতীত ভূমিকার কথা ভেবে সুলতান শেষ পর্যন্ত ওই ঠগিদের প্রাণদণ্ড মকুব করলেন ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন ওই সব ঠগিদের দিল্লির ত্রিসীমানায় থাকা চলবে না। এরপর সুলতানের মুদ্রা গরম করে তার 'চিনাস' বা 'চিহ্ন' এঁকে দেওয়া হল ওই সব ঠগিদের পিছনে। ওই ছাপ চিরজীবনের মতো আঁকা হয়ে গেল তাদের শরীরে। অর্থাৎ তাদের 'দাগি' করে দেওয়া হল। দাগি ঠগিদের কয়েকটা নৌকোতে উঠিয়ে দিয়ে বলা হল যে পূর্ব

BanglaBook.org

ভারতে পৌঁছবার আগে কোনও জায়গাতে যদি নৌকো ভেড়ে বা তারা যদি আবার দিল্লিতে ফিরে আসে তবে সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুণ্ডচ্ছেদ করা হবে। প্রাণভয়ে সুলতানের সেই নির্দেশ পালন করে ঠগিরা। কোনও এক সুদূর অতীতে সেই নৌকোগুলোরই কোনও একটা এসে লেগেছিল বাংলার কোনও ঘাটে। সে নৌকো থেকে যারা বাংলার মাটিতে পা রেখেছিল তারাই হল দুর্গাদের পূর্বপুরুষ, বাংলাদেশের আদি ঠগি।

সেই বাঁশবনে ব্রাহ্মণ আর তাঁর পুত্রকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে ঢাকার জহরত ব্যবসায়ীদের দলটাকে ধরার জন্য দ্রুত পা চালাল ফিরিঙ্গিয়া আর তার দলবল। কিছুটা পথ এগোবার পর ধুলোময় রাস্তায় খচ্চরের পায়ের ছাপ চোখে পড়ল তাদের। ব্রাহ্মণ মিথ্যা বলেনি। দলটা সম্ভবত ছ-সাত ক্রোশ আগে চলছে। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল এনায়েতরা।

আরও দু-তিন ক্রোশ চলার পর দেখল রাস্তার পাশে একজন ভিখারি গোছের লোক মরে পড়ে আছে উপুড় হয়ে। মোস্তাফা উলটে দেখল মৃতদেহটাকে। তার ঠোঁটের কষে রক্তের দাগ। ধুতুরিয়াদের কাণ্ড। ধুতরোর বিষে হত্যা করা হয়েছে লোকটাকে। এই ধুতুরিয়া আর ম্যাকফানসোদের জন্য ঠগিদের কাজের খুব অসুবিধা হয়। কারণ তারা দেহ লোপাট করে না বলে দেহ মিললেই কোম্পানির লোকজন বা জমিদারের পাইকরা সেই এলাকাতে তল্লাশি শুরু করে। এ কারণে ধুতুরিয়াদের চলার পথ ঠগিরা মাড়ায় না। কিন্তু আগেই ওই ঢাকার দলটা গেছে তাই এনায়েতরা সে পথ ধরেই চলল। দলটার সঙ্গে দ্রুত দূরত্ব কমিয়ে আনল তারা।

বেলা পড়ে আসছে। অবশেষে সূর্য ডোবার কিছু আগে দূর থেকে দেখা গেল কিছু মানুষকে। কিন্তু সংখ্যায় তো তারা আরও বেশি মনে হচ্ছে! উটও আছে দেখা যাচ্ছে। রাস্তার পাশে একটা বাঁওড়ের কাছে সম্ভবত তাঁবু ফেলার উদ্যোগ নিচ্ছে লোকগুলো। এনায়েত

BanglaBook.org

মোস্তাফাকে আগে পাঠাল ব্যাপারটা কী খোঁজ নেওয়ার জন্য। মোস্তাফা কিছুক্ষণের মধ্যে এসে জানাল,—হ্যাঁ, বাওড়ের কাছে তাঁবু খাটানো হচ্ছে। ঢাকার ব্যবসায়ীরা সেখানে আছে ঠিকই, কিন্তু তাদের সঙ্গে আরও অনেক লোক। প্রায় পঁচিশ জন লোক। সংখ্যায় তারা এনায়েতদের চেয়ে বেশি। এতগুলো লোককে তো আর ঝিরনী দেওয়া যাবে না। কী করা যায়?

আলোচনা শুরু হল। দুর্গা বলল,—সম্ভবত দুটো দল পথেই মিলিত হয়েছে। এমন হতে পারে যে জব্বলপুর গিয়ে তারা আবার দু-দল দুটো পথ ধরতে পারে। তখন যে কোনও একটা দলের পিছু নেওয়া যাবে।

এনায়েত বলল,—এ প্রস্তাব মন্দ নয়, আপাতত তাহলে ওদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলা যাক। ওদের পরিকল্পনা কী জানা যাবে তাহলে।

তার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে সবাই এগোল বাঁওড়ের দিকে।

দূর থেকে তাদের দেখতে পেয়েই লোকগুলো প্রথমে সতর্ক হয়ে গেল। তাঁবু খাটানো বন্ধ করে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। লোকগুলোর মধ্যে দুজনের হাতে আবার বন্দুকও আছে। এনায়েতরা তাদের কাছাকাছি উপস্থিত হতেই ও দলের একজন বন্দুক উঁচিয়ে চিৎকার করে উঠল,—থামো। তোমরা কারা?

দলবল নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে এনায়েত জবাব দিল,—আমরা পথিক। জব্বলপুর যাচ্ছি।

সে আবার প্রশ্ন করল,—কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

—জিলা শোনপুর। বিহার। জবাব দিল এনায়েত ওরফে ফিরিঙ্গিয়া। তারপর দুর্গাকে নিয়ে এগোল বাঁওড়ের গায়ে ফাঁকা জমিটায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর দিকে। যেতে যেতেই তাদের সংখ্যাটা গুনে ফেলল এনায়েত। পঁচিশ নয় তেইশজন লোক। তাদের সঙ্গে পাঁচটা খচ্চর আর দুটো উট। সঙ্গে অনেক মালপত্রও আছে।

BanglaBook.org

দুজন গিয়ে দাঁড়াল তাদের সামনে। একজনের চেহারা ও দাড়ি দেখে তাদের ধারণা হল লোকটা সম্ভবত মুসলমান। লম্বা-চওড়া চেহারা তার, আর অন্য জন ধুতি-পিরান পড়া টেরি কাটা সিঁথিওয়ালা বাঙালি। সম্ভবত সে ঢাকার জহুরত ব্যবসায়ী। ওরকম ধুতি-পিরান পরা আরও দুজন লোকও দাঁড়িয়ে আছে কিছুটা পিছনে।

পিরানপরা লোকটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল এনায়েতদের দিকে। এনায়েতের চেহারাটা এমন, যা প্রথমেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাহেবদের মতো ফরসা রং, টিকালো নাক, মেহেদি মাখা দাড়ি, মাথায় পাগড়ি। সব চেয়ে আকর্ষণীয় তার চোখ দুটো। বড়-বড় চোখ দুটোতে যেন শিশুর সারল্য খেলা করছে। তাকে দেখে কে বলবে ওই চোখের দৃষ্টি যে-কোনও হিংস্র শ্বাপদের চেয়েও ভয়ঙ্কর। ওই চোখ দুটো কেড়ে নিয়েছে ন'শো মানুষের প্রাণ!

দুর্গার অবশ্য দাড়ি নেই, কিন্তু তার মুখমণ্ডলেও সবসময় অদ্ভুত এক প্রশান্তি জেগে থাকে। যেন সে কোনও যোগীপুরুষ। আর তাদের সব সঙ্গীসাথীদের দেখেই মনে হয় তারা নিতান্ত সহজ-সরল মানুষ। তাদের কারও হাবভাবে এমন কিছু প্রকাশ পায় না, যা দেখে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে।

এনায়েত পিরানপরা লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকে বলল,—আমার নাম রুস্তম আলি। জনমজুরের কাজ করি মাঠে। জব্বলপুর হয়ে ভূপালে কাজের সন্ধানে যাচ্ছি।

এনায়েত এরপর তাকে বলল,—আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আপনাদের পাশে আমরাও আজ রাত কাটাতে চাই। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, পথঘাট ভালো না, যদিও আমাদের দলে সবাই জোয়ান মানুষ, কিন্তু সঙ্গে অস্ত্র তো নেই। বিন্ধ্যাচলের কাছাকাছি চলে এসেছি। এখানকার ডাকাতরা খুবই ভয়ানক। অতর্কিতে আক্রমণ করে, কিছু না পেলে প্রাণে মেরে দেয়। আপনারা আর আমরা মিলে দলটা বেশ বড়ই হবে। দলে ভারী হলে চট করে কেউ হামলা করতে

BanglaBook.org

সাহস পায় না। আসার পথে দেখলাম কারা যেন একটা লোককে পথের ধারে মেরে রেখেছে। ডাকাতদের কীর্তি হবে মনে হয়, গরিব মানুষকেও ছাড়েনি। আমরা কয়েকবছর ধরে এ পথে আসা-যাওয়া করছি। আমরা জানি এ পথ ভালো নয়।

এনায়েতদের দেখে খারাপ লোক বলে মনে হল না সেই দাড়িওয়ালা জহরত ব্যবসায়ীর। তা ছাড়া এনায়েতদের থেকে দলেও ভারি তারা। এই বাঁওড়ের গায়ের মাঠটাও কারওর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, কাজেই সেই দাড়িওয়ালা মুসলমান ও ঢাকার লোকটা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার পর জহরতের কারবারি বলল, ঠিক আছে এখানে থাকতে চাও থাকো। কিন্তু কোনও ঝামেলা হুজ্জত যেন না হয়, দেখছ নিশ্চয়ই আমাদের বন্দুক আছে?

এনায়েত হেসে বলল,—হ্যাঁ, দেখেছি। সেরকম কিছু হবে না।

লোকগুলোর তাবুর কিছুটা তফাতে নিজেদের রাত কাটাবার ব্যবস্থা করল এনায়েতরা। চুলা জ্বালিয়ে তারা রুটি পাকাতে লেগে গেল। ধীরে ধীরে বাঁওড়ে অন্ধকার নামল। লোকগুলো তাদের তাঁবুর কাছে বেশ কয়েকটা মশাল জ্বালালো। অন্ধকার নামার কিছুক্ষণের মধ্যেই খাওয়া সারা হয়ে গেল দু-দলেরই। তিনটে তাঁবু পড়েছে। একটা সেই দাড়িওয়ালার, অন্য দুটো ছোট তাঁবু সেই জহরত ব্যবসায়ীদের।

এনায়েতরা বুঝতে পারল ফর্সা ধুতি আর জমিদার পিরান পরা তিনজন লোক হল জহরত ব্যবসায়ী। আর দাড়িওয়ালা লোকটার পরিচয়ও তারা জানতে পারল কিছু পরে। দাড়িওয়ালা ও মণিকারের দল খাওয়া সেরে তাঁবুতে ঢোকার পর বাকি লোকজন একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে তার চারপাশে গোল হয়ে গল্পগুজব করতে বসল। তারা সব চাকর শ্রেণির লোক। শুধু বন্দুকধারী লোক দুজন জহরতকারবারিদের তাঁবুর কাছে খচ্চরগুলোকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।

অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে লোকগুলো যেখানে বসল তার কিছুটা তফাতেই এনায়েতরা বসে। এনায়েত ইশারা করতেই দীনু তার পুঁটলি থেকে

BanglaBook.org

একটা বাঁশি বার করে তা বাজাতে শুরু করল। আকাশে চাঁদ উঠতে শুরু করেছে। দীনুর বাঁশির সুর ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল জনহীন প্রান্তরে। অপূর্ব সেই সুর। অগ্নিকুণ্ড ঘিরে যারা গল্প করছিল তারা গল্প থামিয়ে শুনতে লাগল অপূর্ব সেই সুরের মূর্ছনা। তারপর একজন-দুজন করে পুরো দলটাই এনায়েতদের কাছে এসে দাঁড়াল দীনুর বাঁশি শোনার জন্য। অনেকক্ষণ বাঁশি বাজাল দীনু। সে বাঁশি থামালেই সেই লোকগুলো বলে,—আর একটা সুর ধরো, আর একটা।

কিছুক্ষণের মধ্যে দু-দলের বেশ ভাব জমে গেল। লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলে এনায়েতরা জানতে পারল ওই দাড়িওয়ালা লোকটা আসলে হাতির দাঁতের শৌখিন জিনিসের কারবারি। নাম সরফরাজ আলি। রইস আদমী। উট দুটো তারই, পথে কেনা হয়েছে। আর পনেরো জন লোক তার সঙ্গী। হাতির দাঁতের জিনিসের পসরা নিয়ে তারা কানপুর থেকে আসছে। জব্বলপুর হয়ে যাবে তারা ঔরাঙ্গাবাদ। আর ওই তিনজন বাঙালি মণিকারের সঙ্গে আছে বন্দুকধারী দুজন সহ আরও দুজন লোক আর খচ্চরগুলো। তাদের গন্তব্যস্থল জব্বলপুর হয়ে সোজা ভোপাল। অর্থাৎ জব্বলপুর থেকে দুটো দল দুদিকে ভাগ হয়ে যাবে। যেটা চাইছে এনায়েতরা। জহরত ব্যবসায়ীদের দলপতির নাম ভগবান দাস। সে আদতে ময়মনসিংহ জেলার মানুষ। আজ সকালেই দুটো দলের দেখা হয়েছে, তারপর তারা একসঙ্গে যাচ্ছে।

পরদিন সকালে যখন আবার তাঁবু উঠিয়ে সরফরাজ আলি আর ভগবান দাসের দল পথে নামল ততক্ষণে তাদের দলের লোকজনের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেছে এনায়েতদের। ঠিক ভাবে চললে দু-দিনের মধ্যেই তাদের জব্বলপুর পৌঁছে যাওয়ার কথা। এনায়েতরা ঠিক করেছে তারা জব্বলপুর ঢুকবে না, শহরটা বেড় দিয়ে নর্মদার পাড় ধরে ভূপালের রাস্তায় উঠে আবার অনুসরণ করবে জহরত

BanglaBook.org

ব্যবসায়ীদের। জব্বলপুর ছাড়বার পর নরসিংহপুর জেলা। সেখানে নরসিংহপুর শহর পর্যন্ত রাস্তা জনমানবহীন। এনায়েতরা তাদের কাজ সেরে নিতে পারবে।

সাত

ব্যবসায়ীদের পিছন পিছন এনায়েতরা চলতে লাগল খুব স্বাভাবিক ভাবেই। পথশ্রমের ক্লান্তি দূর করার জন্য পথিকরা যেমন করে ঠিক তেমনই ওরা নিজেদের মধ্যে সুখ-দুঃখের গল্প করছে, হাসিঠাট্টা করছে, কখনও আবার গান করছে। কে বলবে তাদের মনে অন্য কোনও অভিসন্ধি আছে। বরং ব্যবসায়ীদের দলের মধ্যে ওই বন্দুকধারী লোক দুজন সহ আরও এমন বেশ কয়েকজন আছে, যাদের দেখে সন্দেহ হতে পারে অন্য লোকদের।

শুধু চলার পথে একটা দলই একটু ভ্রূ কুঁচকে ছিল এনায়েতদের দেখে। সে দলের একজনের ঠোঁটের এক কোণে একটা ক্ষীণ হাসিও যেন ফুটে উঠেছিল তাদের দেখে। জনা কুড়ি লোকের সে দলটা আসছিল উলটোদিক থেকে। পুরুষদের সঙ্গে মহিলা-বাচ্চাকাচ্চারাও ছিল। তাদের পরনে নোংরা পোশাক। এক গাদা কুকুর, বাঁদর, চোখে ঠুলি পরানো বাজপাখি আর খচ্চরের পিঠে শতছিন্ন ময়লা তাঁবু। ব্রিনজার বা বেদেদের দল। শহর-গ্রামে ঘুরে ঘুরে তারা খেলা দেখায়, সুযোগ পেলে চুরিটুরিও করে। ঠগিদের সঙ্গে তাদের পুরোনো সম্পর্ক। দু-দলই এ দেশের প্রাচীন পথিক। এই বিরাট ভারতবর্ষের পথের ধুলো মেখে ঘুরে বেড়ায় উভয়ই। কোনও কোনও ঠগিরা তাদের কাছে পথিকের লুণ্ঠিত মালপত্র বিক্রি করে। নিরাপত্তার কারণে সাধারণত ঠগিরা শহর বা গঞ্জে গিয়ে সে সব মাল বিক্রি করে না।

BanglaBook.org

তবে এই বেদেদের আসল কারবার অন্য। তারা শিশু চুরি করে, শিশু কেনাবেচা করে। এখনও এ দেশের কোনও কোনও জায়গাতে নরবলি হয়। রাজা-জমিদারের লোকজন বেদেদের তাঁবুতে এসে বাচ্চা ছেলে কিনে নিয়ে যায় তাদের পারিবারিক মন্দিরে বলি দেওয়ার জন্য। কোনও সময় আবার বর্ধিষ্ণু লোকেরা বাচ্চা ছেলে কিনে মাটির তলায় চোরাকুঠুরিতে তাদের যখ করে সম্পদ আগলাবার জন্য। ছোট মেয়েদের কেনা হয় নবাব হারেমে দাসীবাঁদি করার জন্য। কানপুর আর জয়সলমীরে দুটো বড় আড্ডা আছে ব্রিনজারদের। রতনে রতন চেনে, সে জন্যই হয়তো এনায়েতদের দিকে তাকিয়েছিল তারা।

সারাটা দিন চলার পর সন্ধ্যা নাগাদ ব্যবসায়ী ও এনায়েতদের পুরো দলটা এসে উপস্থিত হল রাস্তার পাশে একটা পরিত্যক্ত খণ্ডহর প্রাসাদের সামনে। বড় বড় শহরের কাছাকাছি এ ধরনের পরিত্যক্ত প্রাসাদ মাঝে মাঝেই দেখা যায়। হয়তো কোনও দেশীয় জমিদার, রাজা বা নবাব কোনওদিন বানিয়েছিল এসব প্রাসাদ। আসলে এগুলো ছিল তাদের আমোদ-প্রমোদের জায়গা। তারপর কোম্পানির হাতে হয়তো তাদের জমিদারি গেছে, অথবা বিদ্রোহী প্রজারাই লুটে নিয়েছে তাদের সম্পত্তি, এখন এই খণ্ডহর প্রাসাদগুলোই শুধু তাদের সোনালি দিনের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাতে এসব প্রাসাদ এখন ভিনদেশী পথিকদের আশ্রয়স্থল, অথবা ঠ্যাঙারেদের আড্ডা। অনেক জনশূন্য মহল সে প্রাসাদে।

সরফরাজ আলি আর ভগবানদাস মিলে আলোচনা করে সেই প্রাসাদেই রাত্রিবাসের সিদ্ধান্ত নিল। প্রাসাদের ভিতরে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করল এনায়েতরাও। এ ধরনের প্রাসাদে অনেক সময় লুকোনো ধনসম্পদ মেলে বলে শোনা যায়। তাই রাতের খাওয়া শেষে এনায়েতদের দলের কয়েকজন লোক মিলে মশাল জ্বালিয়ে তল্লাশি চালাল প্রাসাদের কোথাও কোনও জিনিসের সন্ধান পাওয়া যায় কি না তা দেখার জন্য। কিন্তু সেরকম কিছুই মিলল

BanglaBook.org

না। সূর্য ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই আবার যাত্রা শুরু হল।

জব্বলপুর আর একদিনের পথ। চলতে শুরু করার পরই মাঝে মাঝে এবার তাদের দেখা হতে লাগল অন্য পথিক দলের সঙ্গে। তাদের কেউ কেউ পুজোর মরসুমে সারা বছর পরে ঘরে ফিরছে, কেউ বা আবার পুবে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটা ছোট দলও ছিল, রাস্তা বদলে এনায়েতরা অবশ্যই পিছু নিতে পারত। যেমন কোথাকার এক গোমস্তা, দুজন চাকরের মাথায় ভারী ভারী দুটো বাক্স চাপিয়ে তার দেশে যাচ্ছে। সঙ্গে কোনও লোক নেই, সেই চাকর দুজন ছাড়া। শিকার হিসাবে তারা আদর্শ। কিন্তু এনায়েতরা পিছনে ফিরল না। রাস্তায় নামলে গন্তব্যে না পৌঁছে পিছনে ফিরতে নেই। এটা ওদের প্রাচীন সংস্কার। লোকটাকে দেখে এনায়েত শুধু চাপাস্বরে দুর্গাকে বলল,—মনে হয় ফেরা হবে না ওর। আমাদের মতো কেউ নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে ওর জন্য।

পথে নামলে এনায়েতরা আরও অনেক সংস্কার মেনে চলে। যে কারণে যাত্রাপথে সব সময় চোখ-কান খোলা রাখতে হয়। দিনের বেলা তাদের যাত্রাপথে হঠাৎ যদি শেয়াল বা পেঁচার ডাক কানে আসে, অথবা তারা যদি দেখতে পায় পথের বাঁ-পাশের কোনও মরা গাছের ডালে কোনও দাঁড়কাক বসে ডাকছে, অথবা খরগোশ তাদের রাস্তা কাটছে তবে এ ব্যাপারগুলোকে প্রচণ্ড অশুভ মনে করে সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা থামিয়ে দেয় তারা। তাতে যদি শিকার ফসকায় তো ফসকাক। সেদিনের মতো আর এক পা নড়বে না ঠগির দল। আবার রাস্তার ডানপাশে গাছের ডালে যদি ঘুঘু বা হাড়িচাঁচা দেখা যায়, বাঘ যদি তাদের রাস্তা কাটে বা রাস্তার মোড়ে যদি সাপের শঙ্খ লাগা চোখে পড়ে তা হলে আবার সে ব্যাপারগুলো প্রচণ্ড শুভ। এরকম নানা সংস্কারে বিশ্বাসী ঠগিরা।

সূর্য তখন সবে মাথার ওপর উঠেছে। একটা নদীর ঘাটে এসে উপস্থিত হল পুরো দলটা। বেশ বড় ঘাট, নানা জাতের লোকজন

BanglaBook.org

সেখানে। নদীটা শোনের এক শাখানদী, এখানে এসে মিশেছে নর্মদার এক শাখার সঙ্গে। অনেক নৌকো ভাসছে নদীর জলে। নদীর পাড় ধরে হাতির দাঁতের কারবারি আর ঢাকার ব্যবসায়ীদের যাত্রাপথ। নদীর ঘাটে উপস্থিত হতেই একদল মাল্লা এসে ঘিরে ধরল। জহরত ব্যবসায়ীদের তারা খচ্চর সমেত নদীপথে জব্বলপুরে পৌঁছে দিতে চায়। তাতে সময় অনেক কম লাগবে। ঢাকার ব্যবসায়ীরা ভাবতে লাগল তারা কী করবে। সরফরাজের দলের সঙ্গে বাকি পথটুকু পদব্রজে যাবে, নাকি জলপথে পাড়ি দেবে?

মাঝিগুলো যে ভাবে ঢাকার ব্যবসায়ীদের নৌকায় ওঠার জন্য পিড়াপিড়ি করছে তা দেখে কেমন যেন সন্দেহ হল এনায়েতদের। দীনু হঠাৎ সর্দার মাঝিটার কানের কাছে গিয়ে বলল, 'আউলে ভাই রাম রাম!' কী আশ্চর্য, সেই মাঝির মুখ থেকেও বেরিয়ে এল একই কথা—'আউলে ভাই রাম রাম!'

বেশ কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল দুজন। তারপর সে লোকটা দীনুকে একটু আক্ষেপের সুরে বলল,—বরাত খুব খারাপ যাচ্ছে ভাই। ভবানীর আশীর্বাদে পথে যদি বড় কিছু দাঁও মারতে পারো তবে ফেরার পথে আমাদের কথা একটু মনে রেখো।

হঠাৎই যেন এরপর মাঝিরা জহরত ব্যবসায়ীদের ছেড়ে দিয়ে এক মুসলমান হিং-এর কারবারিকে নিয়ে পড়ল।

আসলে ওই মাঝিরা ছিল জলের ঠগি বা ভাঙ্গু। বাংলাদেশে ওদের বলে 'ভাগিনা।' পথিককে ভুলিয়ে ওরা নৌকোয় তোলে, তারপর নির্জন জায়গাতে নদীপথে তাদের খুন করে। ওদের সবচেয়ে বড় আড্ডা গঙ্গাসাগরে। গঙ্গাপথে ওদিকে ওদের ইলাহাবাদ পর্যন্ত যাতায়াত। ইদানীং মধ্য ভারত হয়ে দক্ষিণ ভারতের দিকেও এগোচ্ছে তারা। ভাঙ্গুরাও মানুষ খুন করার জন্য রুমালের ফাঁস ব্যবহার করে, তাদের কর্মপদ্ধতির কিছু পার্থক্য আছে। ভাঙ্গুরা নৌকোয় পথিকদের হত্যা করবে ঠিকই, একবিন্দু রক্তপাত হতে দেয় না নৌকোতে। সেটা নাকি

BanglaBook.org

ভয়ঙ্কর অমঙ্গলসূচক। এনায়েত দুর্গারা ঝিরনী দেয় 'পান লাও', 'তামাকু লাও' বলে। আর তারা ঝিরনী দেয় নৌকোর পাটাতনে তিনবার বৈঠা ঠুকে ঠক-ঠক করে।

এনায়েত-দুর্গারা গাব্বা খুড়ে দেহ কবর দেয়, ভাঙ্গুরা জলে ফেলে দেয় দেহ। তবে যাতে লাশ ভেসে না ওঠে তার জন্য জলে লাশ ফেলার আগে একটা কাণ্ড করে তারা। লাশটাকে নৌকোর পাটাতনে ফেলে পিঠের ওপর হাঁটু দিয়ে চেপে কাঁধ দুটোকে পিছনে টেনে ধরে মৃত মানুষের শিরদাঁড়া ভেঙে দেওয়া হয়। এনায়েত একবার শুনেছিল শিরদাঁড়া ভাঙার সেই বীভৎস মট্‌মট্‌ শব্দ। ন'শো জনকে ঝিরনী দেওয়া এনায়েতেরও বুক কেঁপে উঠেছিল সে শব্দ শুনে।

ঘাটের পাড় বেয়ে আবার চলতে শুরু করল সবাই। বহু লোকের আনাগোনা এ পথে। পায়ে হেঁটে তো বটেই, গরুর গাড়ি, ঘোড়া, উটের পিঠেও চলেছে অনেকে। মাঝে মাঝে কোম্পানির লোক বা ফিরিঙ্গি সেপাইও চোখে পড়ছে। কাছে এগিয়ে আসছে জব্বলপুর। ওখানে কোম্পানির কুঠি আছে। রেসিডেন্সিও আছে। কাজেই এ পথে ফিরিঙ্গিদের আসা-যাওয়া স্বাভাবিক। এনায়েতরা আরও বেশি সতর্ক হয়ে পথ চলা শুরু করল। সন্ধ্যা নামার কিছু আগে তারা মেঠো রাস্তা ছেড়ে উঠে এল পাকা সড়কে। এ রাস্তা সোজা চলে গেছে পাঁচ ক্রোশ দূরে জব্বলপুরে।

এনায়েতরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে জব্বলপুরে তারা ঢুকবে না। ঢাকার জহরত ব্যবসায়ীদের থেকে আপাতত এখানেই বিদায় নেবে তারা। তারপর শহরটাকে অর্ধচন্দ্রাকারে বেড় দিয়ে ভূপালের পথে উঠবে। ও পথে উঠতে তাদের দু-দিন সময় লাগবে, কিন্তু জহরত কারবারিরা সোজাসুজি গিয়ে একদিনেই উঠে পড়বে সে পথে। তাতে অসুবিধা কিছু নেই। জব্বলপুর থেকে নরসিংহপুর যেতে তিনদিন সময় লাগে। তার মধ্যে এনায়েতরা নিশ্চয়ই ধরে ফেলবে তাদের।

BanglaBook.org

পাকা সড়কে উঠেই এনায়েত সোজা গিয়ে হাজির হল ভগবান দাসের সামনে। তাকে প্রণাম জানিয়ে এনায়েত বলল,—হুজুর আমরা আপনাদের সঙ্গে জব্বলপুর ঢুকব না। আমাদের কাছে সরকারি কোনও কাগজপত্র নেই। কাস্টমস হাউসের লোকদের তো আপনারা জানেনই। পয়সার জন্য নিরীহ পথিকদের ওরা হয়রান করে। আমরা ঘুরপথে ভূপাল যাওয়ার পথে গিয়ে উঠব। ও পথে দেখা হলে হুজুরদের কৃপা থেকে যেন বঞ্চিত না হই।

তিনদিন ধরে এনায়েতদের দেখছে ভগবান দাস। এ লোকগুলোর মধ্যে সে বেচাল কিছু দেখেনি। সে বলল,—হ্যাঁ, যদি দেখা হয় তবে আবার তোমরা আমাদের সঙ্গে যেও।

তার সঙ্গী বন্দুকধারী দুজনও হাসল। এনায়েতদের প্রতি বিশ্বাস জন্মে গেছে তাদেরও।

'হুজুরের মেহেরবানি।' এই বলে ভগবানদাসকে সেলাম ঠুকে নিজেদের রাস্তা ধরল এনায়েতরা। আর ভগবান দাস, হাতির দাঁতের কারবারি এরা সব সোজা জব্বলপুরের পথ ধরল।

অন্ধকার নামার পরও সেদিন অনেকক্ষণ হাঁটল এনায়েতরা। রাতে তারা আশ্রয় নিল একটা ছাগলের খামারে। মালিকের মাংসের দোকান আছে জব্বলপুর শহরে। মোস্তাফা তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে বেশ কিছু খবর সংগ্রহ করল তার কাছ থেকে। শহরের খবর। রেসিডেন্সিতে নাকি 'স্লিম্যান' নামে এক খ্যাপাটে সাহেব এসেছে কিছুদিন হল। সে তাঁর ঘোড়া নিয়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। তবে লোকটা নাকি ভালো। নর্মদার তীরে নাকি লোকটা পুরোনো দিনের প্রাণীর হাড়গোড় খুঁজে বেড়ায়। দু-দিন ধরে রেসিডেন্সিতে নাকি মেলা লোকজন যাচ্ছে। কোম্পানির ফৌজে তারা নাকি নাম লিখিয়েছিল কিছুদিন আগে। এখন তাদের সেখানে পাঠানোর কাজ চলছে।

পরদিন সকালে তারা নর্মদার কাছে পৌঁছে তার পাড় ধরে চলতে শুরু করল। এদিকটা প্রায় জনমানবহীন পাথুরে পথ। লোকজনের

BanglaBook.org

তেমন আনাগোনা নেই, জঙ্গল আছে। দূরে দূরে বেশ কয়েকটা গ্রাম। নদী তটে এক সাধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল এনায়েতদের। তপভূমি নর্মদা। সন্ন্যাসীরা এখানে তপস্যা করতে আসেন। ছাই-ভস্ম মেখে এক নগ্ন সাধু বসে আছেন পাথরের ওপর। মোস্তাফা তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলার জন্য এগোতেই সাধু তাঁর পাশে রাখা তলোয়ারটা এমন ভাবে তুলল যে মোস্তাফা আর তাঁর দিকে এগোতে সাহস পেল না।

দুদিন ধরে নদীর পাড় ধরে হাঁটার পর তারা উঠে এল সেই রাস্তায়। যে রাস্তা জব্বলপুর থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেছে ভূপালের দিকে। জহরত ব্যবসায়ীরা নিশ্চয়ই একদিন আগেই এ পথ ধরেছে। এনায়েত বলল,—তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলতে হবে এবার। যে ভাবেই হোক নরসিংহপুরের আগে তাদের ধরতে হবে।

দুপুর নাগাদ তারা উঠেছিল সেই রাস্তায়, এক সময় সূর্য ধীরে ধীরে ডুবে গেল, অন্ধকারে ঢেকে গেল চারদিক, তারপর এক সময় চাঁদও উঠল। তারও বেশ কিছুক্ষণ পর এক জায়গাতে এসে থামল সকলে। রাস্তার পাশে একটা বিরাট মাঠ। মাঠের ঠিক মাঝখানে বেশ কয়েকটা শূন্য চালা। সম্ভবত কোনও হাট বসে এখানে। রাস্তার কাদা মাটিতে জেগে আছে গরুরগাড়ির চাকার দাগ, এখানে ওখানে পড়ে আছে পশুর নোংরা। তবে কোথাও কোনও লোকজনই নেই। শূন্য চালাগুলোর নীচেই রাত কাটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল তারা। মাত্র তিন প্রহরের তো মামলা। তার পরই হাঁটতে শুরু করবে সকলে। যে গতিতে তারা চলছে তাতে আশা করা যায় অগ্রবর্তী ঢাকার ব্যবসায়ীদের দলটাকে আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যেই ধরে ফেলতে পারবে। সেই মতো শূন্য মাঠে আটচালার নীচে ঠাঁই নিল তারা। দলে কয়েকজন লেগে গেল চুলা জ্বালিয়ে রুটি পাকাবার কাজে। এনায়েত, দুর্গা, দীনু আর মোস্তাফা আলোচনায় বসল কী কৌশলে মণিকারদের দলটাকে ঝিরনী দেওয়া হবে তা ঠিক করার জন্য। সঙ্গে দুজন বন্দুকধারী আছে, তাই কাজটা বেশ সাবধানে করতে হবে।

BanglaBook.org

কথা বলছিল চারজন, হঠাৎ কীসের একটা শব্দ পেয়ে তারা তাকিয়ে দেখল চাঁদের আলোতে ঘোড়ার পিঠে চেপে মাঠের মধ্যে দিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে একজন। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে উঠে দাঁড়াল সবাই। ঘোড়সওয়ার সোজা তাদের দিকে এগিয়ে এসে জানতে চাইল,—তোমরা কারা? কী করছ এখানে?

লোকটার কোমরে একটা তলোয়ার ঝুলছে। জমিদারের লোক হতে পারে। হয়তো তার পিছনে পাইকরা এখনই এসে পড়বে। দুর্গা হাতজোড় করে বলল,—হুজুর আমরা পথিক। দূর দেশে থাকি। কাজের সন্ধানে ভূপাল যাচ্ছি। আপনি?

দীনু মশালটা তুলে ধরল একটু ওপর দিকে। আগন্তুকের মুখটা এবার দেখা গেল। লোক না বলে তাকে ছেলে বলাই ভালো। সম্ভবত কুড়ি-একুশ বয়স হবে তার। সুন্দর মুখশ্রী, উজ্জ্বল চোখ, ছিপছিপে চেহারা। সে জবাব দিল,—আমাকে তোমরা কোম্পানির লোকই ধরতে পারো। ফৌজে চাকরি হয়েছে। জব্বলপুর রেসিডেন্সিতে কাজে যোগ দিতে যাচ্ছি। তাই বলে সে লাফ দিয়ে নামল ঘোড়া থেকে। একটা অস্পষ্ট ঝনঝন শব্দ কানে এল। এনায়েতের শ্বাপদের কান, লোকটার গেঁজেতে নিশ্চয়ই কিছু আছে। আর দুর্গা সেই মুহূর্তে দেখতে পেল মশালের আলোতে ঝিলিক দিচ্ছে লোকটার কানের সোনার মাকড়ি। এনায়েত আর দুর্গার মধ্যে নিঃশব্দে একবার দৃষ্টি বিনিময় হল। লোকটা বেশ পরিশ্রান্ত। কোন ভোরে সে বেরিয়েছে নর্মদা তীরের এক গ্রাম থেকে। পথে একবারের জন্যও থামেনি। পথ চলতে চলতে আটচালার নীচে লোক দেখে সে একটু জিরোবার জন্য এসেছে। ঘোড়া থেকে নেমে লোকটা বলল,—একটু জল পাওয়া যাবে?

মোস্তাফা সঙ্গে সঙ্গে লোটা ভরতি জল এনে তুলে দিল তার হাতে। বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে জলপান করল লোকটা।

ওইটুকু সময়ের মধ্যেই যেন এনায়েতের চোখের দিকে তাকিয়ে

BanglaBook.org

সবাই জেনে গেল এ লোকটার ভাগ্যে কী লেখা আছে। দুর্গা শুধু একবার তাদের সাংকেতিক ভাষা রামসীতে জিগ্যেস করল, 'বিছানা কোথায় পাতা হবে?'

এনায়েত মুখে তার কথার জবাব না দিয়ে একবার তাকাল মাঠের শেষ প্রান্তে রাস্তার ধারে যে প্রাচীন বট গাছটা দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে। দুর্গা তার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল।

জল পান করার পর লোকটা জিগ্যেস করল,—কত দূর থেকে আসছ? তোমার দেশ কোথায়?

—বাংলাদেশ। জবাব দিল দীনু।

লোকটা একটু বিস্মিত ভাবে বলল,—বাংলাদেশ! সে তো বহুদূরের পথ। আমি সে দেশের গল্প শুনেছি। কালীঘাটের কথাও শুনেছি। মা'র মন্দির আছে। ফৌজে যখন চাকরি নিলাম, তখন হয়তো সে দেশে কোনও একদিন যাব। ফিরিঙ্গিরা তো সেখান থেকেই সারা দেশ শাসন করত।

'কালীঘাট' শব্দটা শুনে মুহূর্তের জন্য একবার চমকে উঠেছিল এনায়েতরা। দুর্গা শান্ত স্বরে বলল,—হ্যাঁ, সে দেশে মা ভবানীর মন্দির আছে। তিনি খুব জাগ্রত দেবী। আমাদের সবার রক্ষাকর্তা। এই বলে কপালে হাত ছোঁয়াল সে। লোকটাও বলল,—হ্যাঁ, দেবী খুব জাগ্রত বলে আমিও শুনেছি।

কথাটা বলে তার ঘোড়ার পিঠে একটা চাপড় মেরে লোকটা আবার ঘোড়ায় উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু এনায়েত বলে উঠল,—হুজুরের কাছে আমাদের একটা অনুরোধ আছে। এখানে দাঁড়ালেনই যখন তখন আমাদের গরিবের রুটি একটু মুখে দিয়ে যান। গরিবের আর্জি। আর তো দেখা হবে না হুজুরের সঙ্গে। এনায়েতের গলায় আন্তরিকতার ছোঁয়া।

এনায়েত বারবার হুজুর শব্দটা ব্যবহার করায় বেশ খুশি হল অল্পবয়সি লোকটা। সে কোম্পানির সৈন্য হতে যাচ্ছে। সাধারণ

BanglaBook.org

মানুষের চোখে সে হুজুরই তো বটে। গর্বে ফুলে উঠল তার বুক। কিছু দূরে চুলাতে রুটি সেঁকা হচ্ছে। গরম গরম রুটি! বাতাসে রুটির গন্ধ ভাসছে। খিদেও পেয়েছে তার। দুটো রুটি নয় খাওয়াই যাক। তাতে পেটও ভরবে, পথিকদের অনুরোধ রক্ষাও হবে। মাথা নেড়ে লোকটা সম্মত হয়ে গেল তাদের প্রস্তাবে।

দীনু তাড়াতাড়ি একটা ছোট মাদুর এনে বিছিয়ে দিল আটচালার নীচে। লোকটা তার তলোয়ারটা খুলে পাশে রেখে বসল। আর দীনু তার পাশে বসে কথা বলা শুরু করল। একটু পরেই থালায় করে রুটি আনল একজন। গরম গরম রুটি! কী তার স্বাদ! কথা বলতে বলতে খেতে শুরু করল লোকটা। প্রথম রুটিটা খেয়ে দ্বিতীয় রুটিটা সে সবে মুখে তুলেছে, সঙ্গে সঙ্গে এনায়েত ঝিরনী দিল, 'হুজুরকে লিয়ে তামাকু লাও!'

একটা অস্পষ্ট আর্তনাদ আর হাত থেকে রুটির থালাটা ছিটকে পড়ার একটা শব্দ হল শুধু। নিথর হয়ে মাটিতে পড়ে গেল তার দেহ। রুমালের ফাঁসটাকে মজবুত করার জন্য তার গিঁটে একটা রুপোর গোল টাকা বেঁধে রাখে এনায়েতরা। সেই ধাতব চাকতিটা চেপে বসেছে কণ্ঠনালীতে।

সোনার মাকড়ি দুটো ছাড়াও লোকটার গেঁজ থেকে নগদ পনেরো টাকা মিলল। এ ছাড়া তালোয়ারের হাতলে একটা রুপোর পাত লাগানো ছিল। সব নিয়ে এনায়েতরা দেহটাকে কবর দিল রাস্তার পাশে বটগাছের নীচে। আর এখানে থাকা চলে না। ঘোড়াটা সঙ্গে নিয়েই তারা আবার পথে নামল। কয়েক ক্রোশ এগিয়ে একটা জঙ্গলের ধারে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে আবার চলতে শুরু করল। সেই হাটের মাঠ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে লাগল তারা। মাঠের মাঝে শূন্য সেই আটচালার বাতাসে পাক খেতে লাগল হতভাগ্য লোকটার রুটির থালা ছিটকে পড়ার সেই শব্দ, যা শুধু বাতাসই শুনতে পারে।

BanglaBook.org

আট

ক'দিন খুব কাজের চাপ গেছে ক্যাপ্টেন স্লিম্যানের। সগর থেকে খবর এসেছিল দ্রুত ফৌজ পাঠাতে হবে সেখানে। ভিলেদের সঙ্গে কোম্পানির আর জমিদারের বিবাদ বেঁধেছে। বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে ভিলেরা। অস্থায়ী সেনা নিয়োগের জন্য নাম লেখানো আগেই হয়ে গেছিল। ঢেঁড়া পিটিয়ে সে সব লোকগুলোকে জোগাড় করা হয়েছে। স্লিম্যানের সহকারী সিমসনের নেতৃত্বে আজ ভোরবেলাই সগরের পথে রওনা হয়েছে সেই অস্থায়ী সেনাদল। কাজ শেষ হয়েছে স্লিম্যানের। তবে উদ্ভট ভাষায় কথা বলার অভ্যাসটা যায়নি স্লিম্যানের। যারা এর মধ্যে তার কুঠিতে এসেছিল ফৌজে যাওয়ার জন্য, তাদের মধ্যে অচেনা বেশ কিছু লোককে স্লিম্যান সম্বোধন করেছেন, 'আউলে ভাই রাম রাম' বলে। লোকগুলো সে কথা শুনে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল সাহেবের দিকে। কেউ প্রত্যুত্তরে জবাব দিয়েছে শুধু 'রামরাম' বলে। কেউ আবার আড়ালে-আবডালে হাসাহাসি করেছে, বলছে—'সাহেব দেখছি সত্যি পাগল। কী সব উদ্ভট কথাবার্তা বলে!'

বেশ ক'দিন কুঠির বাইরে একদম পা রাখা হয়নি। মনটা হাঁফিয়ে উঠেছে স্লিম্যানের। সগরের উদ্দেশ্যে লোকগুলোকে রওনা করে দিয়ে স্লিম্যান তাঁর কুঠি ছেড়ে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বেশ সুন্দর রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল। কুঠিতে থাকলে স্লিম্যানের যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। বাইরের পৃথিবীটা কত সুন্দর! দুলকি চালে ঘোড়া চালাচ্ছেন সাহেব। রাস্তায় পরিচিত লোক দেখলে মাথা নেড়ে অভিবাদন জানাচ্ছেন। চলতে চলতে রাস্তার পাশে একটা জটলা দেখে কৌতূহলবশত সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন সাহেব। আলোচনার বিষয়বস্তুটা জানতে পারলেন সাহেব। একটু আগে একদল ঘোড়সাওয়ার রেশম

BanglaBook.org

ব্যবসায়ী এ পথ ধরে গেছে। ভূপালের দিকের রাস্তা ধরে এদিকে এসেছে। সে লোকগুলো বলে গেছে শহরের বাইরে চারক্রোশ দূরে ভূপাল যাওয়ার রাস্তার পাশে যে গোহাট আছে, সেখানে মাটির তলা থেকে একটা টাটকা লাশ বেরিয়েছে! কেউ বলছে কাজটা ধুতুরিয়াদের, কেউ বলছে ঠ্যাঙাড়েরা কাজটা করেছে।

কিন্তু ধুতুরিয়া বা ঠাঙাড়েরা তো মাটিতে লাশ পোঁতে না? মাটির তলাতে লাশ উদ্ধার হয়েছে শুনেই সাহেব ঘোড়া ছোটালেন সেদিকে।

জায়গাটা আসলে গোহাট। আজ রোববার হাটবার। আশেপাশে বেশ কিছু গ্রামের লোকজন এদিন হাটে গরু-মহিষ কেনাবেচা করতে আসে। হাঁস-মুরগি, অন্যান্য গৃহপালিত জীবও বিক্রি হয় হাটে। সাহেব সে জায়গাতে পৌছে গেলেন। রাস্তার পাশে একটা প্রাচীন বটগাছের তলায় বহু মানুষের ভিড়। সাহেবকে দেখে সবাই পথ করে দিল তাকে। জটলার ভিতর দিয়ে গিয়ে তিনি গাছের তলায় নামলেন। একজন জমাদার আর তার অধীনস্থ কোম্পানির দুজন সেপাইও ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে সেখানে।

গাছের তলায় একটা গোলাকার গর্ত খোঁড়া। সাহেব ঘোড়া থেকে নামতেই একজন লোক হাউমাউ চিৎকার করে বলতে লাগল, 'সাহেব আমি খুন করিনি। আমি কিছুই জানি না সাহেব। আমাকে ফাঁসি দেবেন না।'

জমাদার সাহেব আর সেপাই দুজন এবার কাছে এসে স্লিম্যানকে সেলাম ঠুকে সাহেবের পায়ে লুটিয়ে পড়া লোকটাকে উঠিয়ে তাঁর সামনে দাঁড় করাল। জমাদার সাহেব লোকটাকে ধমক দিয়ে বলল,—স্বয়ং ধর্মাবতার হাজির হয়েছেন এখানে। ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে না চাস তো হুজুরের কাছে সত্যি কথা খুলে বল। কেন তুই মাটি চাপা দিচ্ছিলি লোকটাকে? কেন খুন করলি ওকে?

লোকটা কাঁদতে কাঁদতে স্লিম্যানের উদ্দেশ্যে বলল,—হুজুর আমার মা-বাপ। সত্যি বলছি, আমি এ খুন করিনি। আমি বাজিকর। জীবন্ত

BanglaBook.org

কবরের খেলা দেখাই। খেলা দেখাবার জন্য এখানকার মাটি নরম বলে গর্ত খুঁড়ছিলাম। মাটি কাটতেই লাশ বেরিয়ে এল। আমি ভয় পেয়ে গিয়ে লাশটাকে আবার মাটি চাপা দিতে যাচ্ছিলাম, তখনই লোকজন ব্যাপারটা দেখে ফেলল। তারপর জমাদার সাহেবকে তারা ডেকে আনল।

স্লিম্যান এবার চিনতে পারল লোকটাকে। আরে এ তো সেই লোক। যার খেলা দেখে জব্বলপুর হাটে কিছুদিন আগেই তাকে বকশিশ দিয়েছেন স্লিম্যান।

জমাদার সাহেব বলে উঠলেন,—ও মিছে কথা বলছে হুজুর। ও-ই লোকটাকে খুন করে লাশটা গায়েব করতে যাচ্ছিল। হাটুরেরা দেখে ফেলায় আর পালাতে পারেনি।

জনতাও গুঞ্জন করে উঠল জমাদার সাহেবের সমর্থনে। স্লিম্যান এরপর অপেক্ষমান জনতার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন,—খুনটা করতে কারা কারা দেখেছ? দিনের বেলা এখানে এত লোকজনের আনাগোনা। খুনটা নিশ্চয়ই হতে দেখেছ তোমরা?

এবার গুঞ্জন থেমে গেল। দুজন লোক শুধু বলল,—তারা গর্ত খুঁড়তে দেখেছে। আর তার ভিতর লাশটাকে দেখেছে।

স্লিম্যান এরপর জিগ্যেস করল,—তবে কি লাশটাকে বয়ে আনতে দেখেছ?

জনতা এবারও নিশ্চুপ। লাশটাকে কেউ বয়ে আনতে দেখেনি।

স্লিম্যান এরপর এগিয়ে গেলেন গর্তটার কাছে। গোলাকৃতি একটা গভীর গর্ত। তার নীচে অর্ধেক মাটি চাপা অবস্থায় পড়ে আছে এক যুবকের মৃতদেহ। স্লিম্যান বেশ খুঁটিয়ে দেখলেন গর্তটা। মনে মনে তার মাপ-ঝোক করলেন। তারপর লাশটা গর্ত থেকে তুলতে বললেন। বাজিকর আর সেপাই দুজন মিলে লাশটা ওপরে তুলে আনল। বাজিকরকে দাঁড় করিয়ে রেখে জনতাকে হটিয়ে দিলেন তিনি। তারপর ঝুঁকে পড়লেন মৃতদেহের ওপর। ভালো করে লাশটাকে

BanglaBook.org

দেখার পর নিজেরই যেন উত্তেজনায় দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম হল স্লিম্যানের। মৃতদেহর মুখটা একপাশে ফেরানো। তার গলাটা যেন কেমন লম্বাটে দেখাচ্ছে। আর সেই গলায় আঁকা হয়ে আছে ফাঁসের দাগ! এক ইঞ্চি চওড়া স্পষ্ট একটা কালো দাগ। স্লিম্যান সাহেব আজ এতদিন পর নিশ্চিত হলেন সামান্য গল্পগাথার সূত্র ধরে তিনি যাদের সন্ধান করছিলেন, তারা নিছক আলেয়া নয়, তারা সত্যিই আছে! ঘটনাচক্রে এই বাজিকর গর্ত খুঁড়েছিল বলে সত্য উদ্‌ঘাটিত হল। যে সত্যকে হাজার হাজার বছর ধরে লুকিয়ে রেখেছিলেন ভবানীর আজ্ঞাবাহীরা।

সাহেব এরপর দেহটার তল্লাশি নিতে বললেন।

কোনও দামি জিনিস পাওয়া গেল না তল্লাশিতে। শুধু তার পোশাকের ভিতর থেকে বেরল একটা কাগজের টুকরো। সেটা হাতে নিয়েই আরও চমকে উঠলেন স্লিম্যান। আরে এটা তো তাঁর দেওয়া ফৌজে চাকরির সেই নিয়োগপত্র! যেটা তিনি কিছুদিন আগে তুলে দিয়ে এসেছিলেন নদী পাড়ের বৃদ্ধের হাতে। ছেলেটা যে আসেনি তা আর নানা ব্যস্ততার মধ্যে স্লিম্যান খেয়াল করতে পারেননি। ছেলেটা এখন পড়ে আছে, তাঁর সামনে! গলায় তার রুমালের ফাঁস আঁকা হয়ে আছে!

বেশ কিছুক্ষণের জন্য স্লিম্যান হতভম্ব হয়ে গেছিলেন। তারপর সেই বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে উঠে ভাবতে শুরু করলেন তাঁর কী করা উচিত? লাশের গলায় যেমন ফাঁসের দাগ আছে, তেমনই নিশ্চয়ই যারা ফাঁসটা পরিয়েছিল তারাও কোথাও আছে। দেখে যতদূর অনুমান হচ্ছে তাতে লাশটা খুব বেশি হলে একদিনের পুরোনো। তেমন পচন ধরেনি লাশটাতে। একদিনে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে তারা? স্লিম্যানের কেন জানি মনে হল, যারা কাণ্ডটা ঘটিয়েছে তারা জব্বলপুর শহরের দিকে যায়নি। শহরে ঢোকার মুখে তাহলে তারা এই খুনটা করত না। শহরে নজরদারি বেশি বলে ধরা পড়ার

BanglaBook.org

সম্ভাবনাও বেশি। অপরাধ বিজ্ঞান নিয়ে কিছুটা পড়াশোনা করেছেন স্লিম্যান। অপরাধী যত গোপনেই অপরাধ সংগঠিত করে থাকুক না কেন, তাদের মনে সবসময় ধরা পড়ার ভয় থাকে, লোকগুলো নিশ্চয়ই শহরের বাইরের পথই ধরেছে। তাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম। অর্থাৎ ভূপালের দিকেই গেছে তারা। স্লিম্যান জমাদারকে হুকুম দিলেন নর্মদা পাড়ের গ্রামে গিয়ে ছেলেটার বৃদ্ধ বাবাকে নিয়ে আসতে। আর সেই বাজিকরকেও তাঁর কুঠিতে আসতে বলে স্লিম্যান ঘোড়া ছোটালেন জব্বলপুরের কাস্টমস হাউসের উদ্দেশ্যে।

কাস্টমস হাউসে পৌঁছে স্লিম্যান দারোগাকে নির্দেশ দিলেন,—আমাকে যত দ্রুত সম্ভব খোঁজ এনে দিতে হবে কোনও ভিনদেশি পথিক দল গত দুদিনের মধ্যে ভূপালের পথ ধরে যাত্রা করেছে কি না? সাহেবের নির্দেশ পালনের জন্য তেজি ঘোড়ার পিঠে চড়ে তখনই কয়েকজন সেপাই রওনা হয়ে গেল ভূপাল সড়কের দিকে। আর স্লিম্যান সেখান থেকে নিজের কুঠিতে ফিরে অস্থির ভাবে পায়চারি করতে লাগলেন।

বেলা দুই প্রহরেই খবর এসে গেল। কাস্টমস হাউসের লোকেরা খবর নিয়ে এসেছে। 'হ্যাঁ, হুজুর তিনটে ভিনদেশি পথিকের দল ওদিকে গেছে। পরশু হাতির পিঠে চেপে গেছেন এক ওমরাহ। সঙ্গে তাঁর সেপাই-সান্ত্রীও আছে। তার পাঁচ ক্রোশ পিছন পিছন যাচ্ছে বাংলাদেশের জহরতের কারবারি ও হাতির দাঁতের জিনিসের ব্যবসায়ীদের এক বড় দল। সঙ্গে তাদের বন্দুক আছে। আর তাদের এক দিনের তফাতে চলছে জনা পনেরো পুরুষের একটা দল। গরীব মানুষ তারা। সম্ভবত কাজের সন্ধানে তারা ভূপাল যাচ্ছে।'

স্লিম্যানের একবার মনে হল শেষের ওই দলটাকে গ্রেপ্তার করে জব্বলপুর ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। নরসিংহপুর জেলার শেষ সীমানা পর্যন্ত গ্রেপ্তারি পরওয়ানা রুজু করার ক্ষমতা তার আছে। কিন্তু স্লিম্যান পরক্ষণেই ভাবলেন কী অভিযোগে তাদের গ্রেফতার

BanglaBook.org

করবেন তিনি। যদি কোনও প্রমাণ না মেলে? হয়তো তারা সত্যি নিরীহ মানুষ। যদি তাদের বিরুদ্ধে হাতেনাতে কোনও প্রমাণ পাওয়া যেত...। ভাবতে লাগলেন স্লিম্যান। এরপর তিনি নিয়ে বসলেন এ তল্লাটের একটা ম্যাপ। নরসিংহপুরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সব রাস্তা খুঁটিনাটি ভাবে আঁকা আছে এই সামরিক ম্যাপটাতে। ম্যাপে চোখ রেখে তিনি হিসাব কষতে বসলেন কোন পথে, কত সময় পর্যন্ত যেতে পারে সেই পথিক দল? অন্য একটা চিন্তা তখন স্লিম্যানের মাথায় উঁকি দিচ্ছে।

নয়

সেই আটচালাকে পিছনে ফেলে সূর্য ওঠার আগেই সাত-আট ক্রোশ পথ এনায়েতরা পাড়ি দিয়ে ফেলল। ভোরবেলা তারা পৌঁছল একটা ছোট গ্রামে। রাস্তার পাশেই একটা কুমোরের দোকান। খুব দ্রুত তারা এ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে। একটু জিরিয়ে নেওয়ার জন্য এনায়েতরা দাঁড়াল। তাছাড়া কিছু খবর নেওয়ারও ব্যাপার আছে। মোস্তাফা গিয়ে ঢুকল সেই কুমোরের দোকানে। তাকে সে জিগ্যেস করল,—এ পথে গতকাল কোনও ধুতি-পিরান পরা বাঙালি পথিকদলকে যেতে দেখেছ? তাদের সঙ্গে দুজন বন্দুকধারী লোক আর গোটা পাঁচেক খচ্চর আছে। আসলে আমরা ও দলেরই লোক, পথে পিছিয়ে পড়েছিলাম।

কুমোর বলল,—হ্যাঁ, দেখেছি তো। গতকাল বিকালে তারা এ পথ পেরিয়ে এগিয়েছে। তবে শুধু তারা ছিল না। সব মিলিয়ে দু-গন্ডা লোক ছিল। দুটো উটও ছিল।

তার কথা শুনে চমকে উঠল মোস্তাফা। তার মানে হাতির দাঁতের জিনিসের কারবারি মত বদল করে ঔরঙ্গাবাদ না গিয়ে ভূপালের

BanglaBook.org

দিকে যাচ্ছে। তাহলে এবার কী হবে?

মোস্তাফা বাইরে এসে এনায়েতদের খবরটা দিতেই চিন্তায় পড়ে গেল সবাই। জহরত ব্যবসায়ীদের পিছু ধাওয়া করে আসার পর শেষ পর্যন্ত কি শিকার ফসকে যাবে? যৌবনে এনায়েতরা একবার এই বিন্ধ্যাচলেই চল্লিশজনের এক তীর্থ যাত্রীর দলকে ঝিরনী দিয়েছিল। কিন্তু সেবার তারা নিজেরাই সংখ্যায় ছিল সত্তরজন। এনায়েত, কাদের শেখ আর নারায়ণ দাসের তিনটে দল একত্রে কাজটা করেছিল। কিন্তু মাত্র পনেরো জনের দল নিয়ে তো আর এতজনকে ঝিরনী দেওয়া যায় না! বেশ কিছুক্ষণ শলা করার পর দুর্গা আর এনায়েত দুজনেই বলল,—এতটা পথ যখন ওদের পিছনে এলাম তখন আরও ক'টাদিন দেখা যাক। এমনও হতে পারে নরসিংহপুর পৌঁছোবার পর হাতির দাঁতের কারবারি অন্য পথ ধরল। নরসিংহপুর থেকে বেশ ক'টা রাস্তা গেছে নানা দিকে। সেখান থেকে হাতির দাঁতের কারবারি হায়দারাবাদের পথও ধরতে পারে। তার পসরার বড় বাজার আছে সেখানে। সুতরাং আগের লক্ষ্যেই আবার চলতে শুরু করল সবাই। কিন্তু সামনেই যে তাদের জন্য এক অদ্ভুত ব্যাপার অপেক্ষা করছিল তা জানা ছিল না তাদের।

তখন সূর্য প্রায় মাথার ওপর। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে করতে দ্রুত হাঁটছিল তারা। হঠাৎই এক পথের বাঁকে যেন মাটি ফুঁড়ে তাদের সামনে উঠে এল জনাদশেক অশ্বারোহী। তাদের মাথায় পাগড়ি, হাতে বল্লম, পিতলের বকলস আঁটা কোমরবন্ধে তলোয়ার ঝুলছে। এনায়েতদের পথ আটকে দাঁড়াল তারা। ব্যাপারটা কী? আসলে পথের এ অংশটা নেটিভ এস্টেটের আওতাভুক্ত। এই লোকগুলো হল সেই রাজা বা জমিদারের বরকন্দাজ। রাস্তার এ অংশে তাদের আইনই বলবত। তারা পারানি হিসাবে এনায়েতদের থেকে দাবি করে বসল একশো টাকা! এনায়েত বলল,—হুজুর আমরা গরিব মানুষ, একশো টাকা কোথায় পাব?

BanglaBook.org

বরকন্দাজদের সর্দার বলল,—টাকা দিতে না পারলে চল তাহলে তিনদিন জন খেটে দিবি।

দুর্গাপুজো আসছে। কাজকর্মের জন্য লোকের দরকার। সে জন্য আসলে মাগনা মজুর খুঁজতে বেরিয়েছে জমিদারের লোকজন। দুর্গা-এনায়েতদের বেশভূষা দেখলে যে-কোনও মানুষ বুঝবে তাদের একশো টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। আসলে টাকা চাওয়া অছিলা মাত্র, তারা মহালে ধরে নিয়ে যেতে চায় এনায়েতদের।

এ ঘটনা যে সময়ের তখন এক অরাজক পরিস্থিতি সারা দেশ জুড়ে। বাদশাহ্ বলে আমার রাজত্ব, জমিদার বলে আমার জমিদারি, আর কোম্পানি বলে আমিই আইন। আর এই তিনজনের জাঁতাকলে পড়ে নাভিশ্বাস উঠত নিরীহ পথিকদের। এনায়েত একবার ভাবল সে একটু দরকষাকষি করে কিছু টাকা তাদের হাতে গুঁজিয়ে দেয়, কিন্তু তাতেও বিপদ আছে। লোকগুলোর মনে সন্দেহ হবে এতটাকা তাদের মতো চাষাভূষো লোক পেল কোথায়? তাদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুনয়-বিনয় শুরু করল এনায়েতরা। কিন্তু তাতে কাজ হল না। তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে লোকগুলো এক সময় দীনুকে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর বল্লমের খোঁচা দিয়ে এনায়েতদের তাড়িয়ে নিয়ে চলল মহলের দিকে।

রাস্তার এক ক্রোশ দূরে মাঠের মধ্যে বিরাট এক জমিদার বাড়ি। জমিদার অবশ্য শহরে থাকেন। দুর্গাপুজোর সময় এখানে আসেন। নায়েব আর বরকন্দাজদের হাতেই বাড়িটার ভার। সিংহদরজা দিয়ে এনায়েতদের বিশাল বাড়িটার ভিতর ঢুকিয়ে বরকন্দাজদের সর্দার বলল,—নায়েব জব্বলপুর গেছে। পরশু ফিরবে। তারপর তোদের নিয়ে যা করার তা করা হবে।

পরশু! তার মানে তিনদিন কয়েদ হয়ে থাকতে হবে এ বাড়িতে। তাহলে তো আর জহরতকারবারিদের ধরাই যাবে না! আলোচনায় বসল এনায়েতরা। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল সর্দার বরকন্দাজকে কিছু

BanglaBook.org

টাকা ঘুষ দিয়ে যদি মুক্তি পাওয়া যায় সেই চেষ্টাই করতে হবে। কিন্তু লোকটাকে পাওয়া গেল না। এনায়েতদের খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে সে লোকটা তখন অন্যত্র চলে গেছে। আটকে রইল এনায়েতরা। লোকটা যখন ফিরল তখন মাঝরাত। অস্থির হয়ে এনায়েতরা শুধু হিসাব করে চলেছে ব্যবসায়ীরা এ সময়ের মধ্যে কতটা পথ গেল।

বরকন্দাজ সর্দার ফিরে আসতেই এনায়েত আর দুর্গা গিয়ে তাকে ধরল। এনায়েত পঁচিশটা টাকা বার করে বলল,—হুজুর আপনি বরং এই টাকাটা রাখুন। আমাদের যেতে দিন। এ টাকার কথা আমরা কাউকে বলব না।

লোকটা ভেবে নিয়ে দেখল,—নায়েব নেই। টাকাটা নিজেই আত্মসাৎ করা যাবে। নইলে টাকাটা নায়েবের পেটেই যাবে। টাকাটা দিয়ে বরং ছেড়ে দেওয়া যাক লোকগুলোকে। তা ছাড়া আজ বিকালে এদিকে কোম্পানির একঝাঁক ঘোড়সওয়ার এসেছে। বলা যায় না, তারা হয়তো এ জমিদারির দখল নিতে এসেছে। এরকম ঘটনা তো প্রায়ই ঘটে। কাজেই এই লোকগুলোর ঝামেলা মিটিয়ে ফেলা ভালো।

শেষ পর্যন্ত তিরিশ টাকায় রফা হল। মুক্তি পেল এনায়েতরা। শেষ রাতে আবার পথে নামল সবাই।

আর থামা নেই। জহরতের কারবারিদের থেকে আরও একদিন পিছিয়ে গেছে তারা। নিশ্চয়ই তারা এখন নরসিংহপুরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। নরসিংপুরে ঢোকার মুখে চার-পাঁচ ক্রোশের একটা জঙ্গল আছে। চেনা পথ। এনায়েত-দুর্গা-মোস্তাফা-দীনু বহুবার এ পথে আগেও এসেছে। বছর পাঁচেক আগে একবার তারা এক গোমস্তা আর তার তিন সঙ্গীকে ঝিরনী দিয়েছিল নরসিংহপুরের জঙ্গলে। দুশো টিপুশাহী রুপোর টাকা মিলেছিল তার কাছে। যে পথ তারা পিছনে ফেলে এল, যে পথ ধরে তারা এগোচ্ছে, এই বিস্তীর্ণ পথে বহু বছর ধরে যাতায়াতের সুবাদে এনায়েতদের হাতের ছোঁয়ায় মাটির নীচে ঘুমিয়ে আছে বহু মানুষ। সে সব জায়গা বহুবছর পর দেখলেও

BanglaBook.org

চিনতে পারে এনায়েতরা।

চলতে থাকল সবাই। সারা দিন ধরে সামনে চলতে চলতে এনায়েতের কেন জানি মাঝে মাঝেই মনে হতে লাগল, এই যাত্রাপথে কেউ যেন আড়াল থেকে তাদের লক্ষ করছে! অথচ কোথাও কেউ নেই! চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে এনায়েতরা। চলতে চলতে কোনও ব্যাপারে সন্দেহ হলেই সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়াচ্ছে তারা। সামনে কোনও বিপদ নেই নিশ্চিত হলে তবেই এগোচ্ছে। এদিকে কাছেপিঠে কোনও লোকালয় নেই। রাস্তার পাশে শুধু বিস্তীর্ণ ঝোপঝাড়। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এল। তার পরই হঠাৎ চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সকলে। রাস্তার একপাশে নালা, অন্যপাশে জঙ্গল। কিছু দূরে সেই নালার ভিতর থেকে লাফিয়ে উঠে এল বিরাট এক কেঁদো বাঘ। বাঘ দেখা গেছে! শুভ সংকেত। এনায়েতরা বলে উঠল 'জয় মা ভবানী'। দ্বিগুণ উৎসাহে চলতে শুরু করল সবাই। কিন্তু সন্ধ্যা নামার কিছু আগে আবার থেমে যেতে হল সবাইকে।

কিছু দূরেই নরসিংহপুরের জঙ্গল শুরু হয়েছে। একটা বাঁকের মুখে পৌঁছে এনায়েতরা দেখতে পেল, জঙ্গলে ঢোকার মুখটাতেই জনা কুড়ি লোক দাঁড়িয়ে আছে। এনায়েতদের থেকে বেশ দূরেই দাঁড়িয়ে তারা। কারা ওরা? পথিক? কোম্পানি বা জমিদারের লোক? নাকি তাদের মতোই কেউ? চট করে তাদের সামনে উপস্থিত হওয়া ঠিক হবে না। এনায়েতদের গত দিনের অভিজ্ঞতা ভালো নয়। জমিদার বা কোম্পানির লোক হলে ফ্যাসাদে পড়তে হতে পারে। এদিকে অন্ধকার নেমে আসছে। আলোচনা করে এনায়েতরা ঠিক করল তিলহাই মোস্তাফা আগে আবছা আলোতে গা ঢাকা দিয়ে দেখে আসুক ব্যাপারটা কী?

সেই মতো মোস্তাফা ঝোপের আড়াল দিয়ে এগিয়ে লোকগুলোর কাছাকাছি পৌঁছে গেল। জনা কুড়ি লোক। পরনে সাধারণ কাপড়,

BanglaBook.org

মাথায় পাগড়ি, খালি পা, সঙ্গে কিছু পোঁটলা-পুঁটলি। তাদের দেখলে সাধারণ গরিব পথিক বলেই মনে হয়, ঠিক যেমন দেখতে লাগে মোস্তাফাদের। কিন্তু তাদের মধ্যে দুটো লোককে দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল মোস্তাফা। লোকগুলোর মধ্যে একজন ফিরিঙ্গি। তার পোশাক অবশ্য খুব সাদামাটা। কোম্পানির লোক বলে তাকে মনে হয় না। আর একজন লোক 'নিয়ামতভিটু' অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত লোক বলেই মনে হয়। পরনে ফরসা ধুতি-পিরান, মাথায় পাগড়ি, পায়ে জুতো। তার হাতে একটা ছোট তোরঙ্গও আছে। ফিরিঙ্গি আর একজন বুড়ো লোক ফরসা কাপড় পরা লোকটাকে কী যেন বোঝাচ্ছে, আর আঙুল তুলে জঙ্গল সংলগ্ন ফাঁকা জমির মধ্যে একটা বিরাট বড় বটগাছের দিকে দেখাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর ফিরিঙ্গি, নিয়ামতভিটু সমেত পুরো দলটা সেই গাছের তলায় গিয়ে বসল। মোস্তাফার দেখে মনে হল দলটা সেখানে রাত্রিবাসের উদ্যোগ নিচ্ছে। কয়েকজন লোক চুলা জ্বালাবার জন্য মাটিও খুঁড়ছে, কিন্তু কারা ওরা? আড়াল থেকে সব দেখতে লাগল মোস্তাফা। অন্ধকার নামল সেই বনপ্রদেশে। কিছুক্ষণের জন্য চারপাশের সব কিছু মুছে গেল। সেই সুযোগে মোস্তাফা পৌঁছে গেল তাদের আরও কাছাকাছি। একটা মশাল জ্বলে উঠল গাছ তলায়। মোস্তাফা দেখল সেই নিয়ামতভিটু গাছতলায় বসে একজন লোকের সঙ্গে গল্প করছে। আর তার কিছুটা তফাতে সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই বুড়ো লোকটা। দলের অন্য লোকেরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নানা কাজকর্ম করছে। কিছুক্ষণের মধ্যে গাছের আড়াল থেকে বেড়িয়ে এসে সেই ফিরিঙ্গিটা নিঃশব্দে দাঁড়াল মাটিতে বসা তোরঙ্গওয়ালা লোকটার পিছনে।

মুহূর্তের জন্য ফিরিঙ্গিটাকে দেখে মোস্তাফার মনে হল, আরে এ তো তাদেরই ছবি! তার সেই চিন্তাটা কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাস্তব রূপ নিল। হঠাৎ বুড়োটা বলে উঠল, 'বাবুকে লিয়ে হুক্কা লাও!'

BanglaBook.org

আর সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিঙ্গিটার রুমালের ফাঁস চেপে বসল নিয়ামতভিটুর গলায়। চারপাশ থেকে অন্য লোকরাও ছুটে এল সেদিকে। কিছুক্ষণের ছটফটানি। তারপর শেষ হয়ে গেল লোকটা। ফিরিঙ্গি আর বুড়ো লোকটা এরপর তার দেহ আর তার তোরঙ্গ হাতড়াতে শুরু করল।

অবাক হয়ে ব্যাপারগুলো দেখছিল মোস্তাফা। হঠাৎ তার পিঠে কে যেন হাত রাখল। চমকে উঠে পিছনে তাকাতেই সে দেখতে পেল এনায়েত আর দুর্গাকে। মোস্তাফার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে তারাও চলে এসেছে সেখানে। তারাও মোস্তাফার মতো দেখেছে ঘটনাটা। তাদের চোখেও বিস্ময়। ফিরিঙ্গি ঠগি? ব্যাপারটাতে কোনও ফাঁক নেই তো? কিন্তু তাদের চোখের সামনেই এরপর দেহটাকে তুলে নিয়ে গাব্বায় ফেলা হল। ঝপাঝপ মাটি ফেলা হতে লাগল সেই গর্তে। এনায়েতদের চোখের সামনেই কিছুক্ষণের মধ্যে মাটির নীচে হারিয়ে গেল নিয়ামতভিটু। ফিরিঙ্গি সহ এ লোকগুলো যে ঠগি, এ ব্যাপারে সন্দেহের আর কোনও অবকাশ রইল না এনায়েতদের।

এনায়েতদের এ পথ ধরে যেতে হলে এই ঠগি দলের সামনে দিয়েই যেতে হবে। লুকোচুরি খেলে কোনও লাভ নেই। তা ছাড়া সামনের পথের হাল-হকিকত ও অগ্রবর্তী জহরত ব্যবসায়ীদের সম্পর্কেও ওরা খোঁজখবর দিতে পারে। কাজেই এনায়েতরা তিনজন আলোচনা করে তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিল।

নতুন ঠগিদের দলটা তখন কাজ সম্পন্ন করে সবে কবরটার ওপর মাদুর বিছিয়ে খেতে বসেছে, এমন সময় জঙ্গলের থেকে বেরিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে গেল এনায়েতরা। তাদের দেখা মাত্র খাওয়া ফেলে সতর্ক ভাবে উঠে দাঁড়াল সবাই। এই লোক তিনজন তাদের কাজকর্ম দেখে ফেলেছে নাকি? প্রথমে কয়েক মুহূর্ত বিস্মিত ভাবে দু-দলই পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বুড়ো লোকটা আর তার পিছনে সেই ফিরিঙ্গিটা এনায়েতদের সামনে এসে দাঁড়াল। বুড়ো লোকটা সন্দিগ্ধ ভাবে জানতে চাইল—তোমরা পথিক?

BanglaBook.org

এনায়েত প্রথমে জবাব দিল,—হ্যাঁ। তারপর একটু চাপা স্বরে বলে উঠল, আউলে ভাই সালাম।

কথাটা কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো আর ফিরিঙ্গিটার মুখের ভাব বদলে গেল। তারা বলে উঠল,—আউলে ভাই রাম রাম। দু-দলই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল এই সম্বোধনের পর।

বুড়োটা এবার জিগ্যেস করল,—তোমরা কোথা থেকে আসছ?

এনায়েত জবাব দিল,—পুব থেকে। তবে আমাদের মধ্যে কিছু লোকের ঘর বাংলায়, আর কিছু লোকের ঘর উত্তরে। আমার নাম 'এনায়েত'। তাবে দলের লোকরা আমাকে 'ফিরিঙ্গিয়া' বলে ডাকে।

—ফিরিঙ্গিয়া। বেশ নাম। হাসল বুড়োটা।

মশালের আলোতে বুড়োর পাগড়ির নীচ থেকে তার মুখমণ্ডলের যতটা দেখা যাচ্ছে তা দেখে এনায়েতের মনে হল, ও লোকটার সঙ্গে আগে যেন কোথায় একবার দেখা হয়েছিল! এনায়েত বলল,—তোমাকে কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে?

বুড়ো হেসে বলল,—আমারও তো কেমন যেন চেনা মনে হচ্ছে তোমাকে! আমার নাম ঝগড়ু সর্দার। বস্তারের বাসিন্দা। এ পথে প্রতিবছর আসি। হয়তো চলতে চলতে কোনও সময় তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এই যেমন হল।

হতে পারে। এনায়েতরাও তো কম দিন হল না আসছে এ পথে। পথে বহুবার বহু ঠগিদলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। বেশ কয়েকবার একসঙ্গে দু-তিন দল মিলে কাজও করেছে। হয়তো তেমন কোনও দলে ছিল লোকটা। এনায়েত এরপর তাকাল ফিরিঙ্গিটার দিকে। তাকে দলে দেখেই সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হয়েছে এনায়েতরা। অবশ্য ফিরিঙ্গি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তারা থাকেও। আর ম্যাকফানসো বা গার্টারদের দলগুলোই তো চালায় ফিরিঙ্গিরা। তবুও ঠগিদের দলে ফিরিঙ্গি একটু কম দেখা যায়। ফিরিঙ্গিটা যেন এনায়েতের দৃষ্টি দেখে তার মনের ভাব পড়তে পেরে বলল,—কানপুর রেসিডেন্সিতে

BanglaBook.org

গোলন্দাজের চাকরি করতাম। নেশার ঝোঁকে সামান্য একটা ঝগড়া ঝামেলায় আমার দেশেরই এক ফিরিঙ্গি ক্যাপ্টেনকে ছুরি মেরে ফেলেছিলাম সাত বছর আগে। আমাকে ফোর্ট উইলিয়ামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ফাঁসি দেওয়ার জন্য। মাঝপথে পালালাম। তারপর ভিড়ে গেলাম এই ঝগড়ু সর্দারের দলে। এখন নিজেই ফাঁসি দিচ্ছি। আমার নাম 'হপকিন্স'। নিয়ামতভিটুর ওপর আমার হাতের কাজটা সম্ভবত তোমরা আড়াল থেকে দেখেছ।

মোস্তাফা বলল,—হ্যাঁ দেখেছি, তোমার হাতের কাজ বেশ ভালো।

ঝগড়ু সর্দার হেসে বলল,—হপ সাহেব সঙ্গে থাকায় আমাদের বেশ সুবিধা হয়। লোকেরা চট করে সন্দেহ করে না। মাঝে মাঝে আমরা ওকে কোম্পানির লোক বলে চালিয়ে দিই।

প্রাথমিক পরিচয় সাঙ্গ হওয়ার পর কাজের কথায় ফিরে এল এনায়েত। সে জানতে চাইল,—এ পথে তোমরা কোনও বড় দল দেখেছ? দুটো উট, খচ্চর আর তেইশজন লোক। একজন দাড়িওয়ালা মুসলমান আর তিনজন বাঙালি আছে। বন্দুকধারী দুটো লোকও আছে। আমরা সে দলটারই পিছু ধাওয়া করে আসছি।

ঝগড়ু বলল,—হ্যাঁ দেখেছি তো। আজ ভোরেই তারা এ পথ ধরে গেছে। এতগুলো লোক, তাই পিছু নিলাম না। ওরা কারা? দেখে তো রইস আদমি বলে মনে হল।

এনায়েত বলল,—হ্যাঁ, রইস আদমি। বাঙালি তিনজন জহরত ব্যবসায়ী, ঢাকা থেকে আসছে। আর মুসলমানটা হাতির দাঁতের জিনিস বিক্রি করে। আমরা ওদের সঙ্গে রাতও কাটিয়েছি। জব্বলপুর থেকে দুটো দলের আলাদা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন ওরা একসঙ্গে ভোপালের পথ ধরেছে।

জহরত ব্যবসায়ীর কথা শুনেই ঝিলিক দিয়ে উঠল ঝগড়ু সর্দার আর ফিরিঙ্গির চোখ। বুড়ো ঠগিটা এরপর বলল,—কিন্তু ওরা তো তোমাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি। তোমরা ঝিরনী দেবে কী ভাবে?

BanglaBook.org

এনায়েত বলল,—সেটাই তো সমস্যা। দেখি যদি নরসিংহপুরে গিয়ে দুটো দল আলাদা হয় সেই আশাতেই চলছি।

হপ সাহেব এবার বলে উঠল,—আমরা একসঙ্গে হলে কিন্তু সংখ্যায় ওদের বেশি হব।

—মানে?

—মানে হল, আমরা একসঙ্গে মিললে প্রায় চল্লিশজন। বন্দুকধারী দুজনকে কবজা করতে পারলেই আর সমস্যা হবে না। যাদের ঝিরনী দেওয়া যাবে না, তাদের কোদালির কোপে শেষ করে দেওয়া হবে। কথা শেষ করে সাপের মতো হিস্‌হিস্‌ একটা শব্দ করল ফিরিঙ্গিটা।

প্রস্তাবটা মন্দ দেয়নি এই ফিরিঙ্গি। এনায়েত শুনেছে একশো লোকের দলকেও ঝিরনী দিয়েছে ঠগির দল। ব্যাপারটা একটু দুঃসাহসিক হলেও অসম্ভব কিছু নয়। আর শেষ পর্যন্ত যদি হাতির দাঁতের কারবারি আর ঢাকার দলটা একসঙ্গেই ভুপাল যায়, তাহলে এনায়েতদের দল একলা তাদের কিছু করতে পারবে না। অতএব...। এনায়েত তাকাল দুর্গার দিকে।

দুর্গা একটু ভেবে নিয়ে ঠগি সর্দার ঝগড়ুকে বলল,—আমরা অনেকদূর থেকে দলটার পিছু ধাওয়া করছি। হক আমাদের বেশি। যদি ওদের পুরো দলটাই থাকে তবে যা পাওয়া যাবে তার আধাআধি বখরা হবে। আর যদি শুধু ঢাকার দলটা থাকে তবে তিন ভাগের এক ভাগ তোমরা পাবে। রাজি?

একটু ভেবে নিয়ে ফিরিঙ্গি আর ঝগড়ু সর্দার বলল,—হ্যাঁ রাজি।

সবাই একসঙ্গে বলে উঠল,—জয় ভবানী। মোস্তাফা ডাকতে গেল দলের অন্য লোকদের। দুর্গা এনায়েতকে বলল,—বাঘ যখন দেখা গেল, তখনই বুঝতে পেরেছিলাম ভালো কোনও ব্যাপার অপেক্ষা করে আছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এনায়েত আর ঝগড়ুর মিলিত দল রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ল শিকারের পিছু ধাওয়া করতে।

BanglaBook.org

দশ

নেকড়ের পাল যেমন শিকারের পিছু ধাওয়া করে, জহরত ব্যবসায়ীদের খোঁজে তেমনই ছুটে চলল তারা। জঙ্গল পেরিয়ে ভোরবেলা তারা উপস্থিত হল নরসিংহপুর শহরের উপকণ্ঠে এক গ্রামে। সেখানে পথচলতি এক সাপুড়ের সঙ্গে কথা বলে দুটো খবর জানতে পারল তারা। একটা খবর হল গতকাল সন্ধ্যায় ব্যবসায়ীদের দলটা নরসিংহপুর শহরে ঢুকেছে। আর দ্বিতীয় খবরটা হল কোম্পানির অশ্বারোহী বাহিনীর একটা দলও গতকাল মাঝরাতে ঝড়ের বেগে এ পথ ধরে গেছে। তারা যাচ্ছে সগরে। সেখানে নাকি ভিলেরা বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই সেনা পাঠাচ্ছে কোম্পানি। নরসিংহপুরের কোম্পানির ব্যারাকও নাকি ফাঁকা। সগর নিয়ে বেশ ব্যস্ত কোম্পানি।

খবর তাহলে এনায়েতদের পক্ষে অনুকূলই। কিন্তু এনায়েতরা শহরে ঢুকবে না। ঠিক হল মোস্তাফা আর ঝগড়ু সর্দারের দলের মাধব জমাদার বলে একজন লোক শহরে ঢুকে ব্যবসায়ীদের দলের খবর নেবে। তারপর শহর ছেড়ে বেরিয়ে ভূপাল যাওয়ার রাস্তায় উঠবে। আর এনায়েত-ঝগড়ুদের দলটা ঘুরপথে গিয়ে সে রাস্তায় অপেক্ষা করবে তাদের জন্য। সেই মতোই কাজ হল। দুজন শহরে ঢুকল, আর এনায়েতরা অন্যপথ ধরল। চলতে চলতে এনায়েত ঝগড়ুকে বলল,—ওরা আমাদের পরিচিত, কিন্তু আমাদের সঙ্গে তোমাদের এতগুলো লোক দেখে আবার তারা সন্দেহ না করে!

ঝগড়ু তাকাল ফিরিঙ্গি ঠগির দিকে। ফিরিঙ্গি বলল,—একটা উপায় আমি ভেবে রেখেছি। কিছুদিন আগে কোম্পানির এক ফিরিঙ্গিকে ঝিরনী দিয়েছিলাম। তার পোশাকগুলো আমাদের কাছে আছে। সেই পোশাকে আমাকে বেশ মানাবে। তোমরা বলবে সাহেব

BanglaBook.org

আমাদের এ পথ ধরে সগরে নিয়ে যাচ্ছেন কোম্পানির কাজ করানোর জন্য। যুদ্ধ বাঁধলে তখন সৈন্যদের খিদমত করার জন্য নানা লোকের দরকার হয়, সে কাজেই যাচ্ছি আমরা।

এনায়েত তারিফ করল ফিরিঙ্গির বুদ্ধির। সত্যি ভালো সঙ্গী পেয়েছে ঝগড়ু সর্দার। এনায়েত ঝগড়ুকে এরপর একবার বলল,—আমার শুধু বারবার মনে হচ্ছে তুমি আমার চেনা। কিন্তু কোথায় দেখেছি কিছুতেই তা মনে পড়ছে না।

ঝগড়ু সর্দার হেসে বলল,—দুজনেই তো ভবানীর সেবক আমরা। কোথাও নিশ্চয়ই দেখা হয়ে থাকবে। আমার মনে পরলে বলব।

শহরটাকে বেড় দিয়ে ভূপাল যাওয়ার পথের অন্য মুখটাতে পৌঁছে গেল দলটা। কিছুক্ষণের মধ্যে মোস্তাফা আর মাধব জমাদার খবর নিয়ে এল। বেশ ভালো খবর। হাতির দাঁতের কারবারি নাকি শহরেই রয়ে গেছে। আর ঢাকার ব্যবসায়ীরা ভূপালের এক মশলার কারবারির পাঁচজনের ছোট দলের সঙ্গে মাঝরাতে উঠে রওনা দিয়েছে এই রাস্তায়। মাধব জমাদার আবার কাজ খোঁজার অছিলায় কোম্পানি-কুঠির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে খবর নিয়ে এসেছে। সগরের গোলমালের ব্যাপারে কোম্পানির সবাই ভীষণ ব্যস্ত। এমনকী এ রাস্তায় কোম্পানির টহলদারি সেপাইদেরও পর্যন্ত উঠিয়ে নিয়ে মজুত করা হয়েছে কুঠিতে।

এনায়েতরা বেশ একটু উল্লসিত হল খবরটা শুনে। ঝগড়ু আবার একটু বিমর্ষও হল, কারণ, লাভের ভাগটা তাদের কমে যাবে। এনায়েত তাকে আশ্বস্ত করে বলল,—মা ভবানীর কৃপায় তেমন ভালো কিছু যদি পাওয়া যায় তখন নিশ্চয়ই তোমাকে খুশি করার ব্যবস্থা করব। তা ছাড়া ওদের ঝিরনী দেওয়ার পর আমরা এক সঙ্গে কাজ করতে পারি। পথ আর পথিকের অভাব নেই এ দেশে।

তার কথা শুনে ফিরিঙ্গি ঠগিটা হেসে বলল,—ঠিকই বলেছ তুমি। ভবিষ্যতেও আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি। আমার অনুমান

BanglaBook.org

ওদের থেকে আমরা তিন প্রহর সময় পিছিয়ে আছি। এখন কথা বলে সময় নষ্ট না করে পা চালিয়ে চললে আশা করি সন্ধ্যার মধ্যেই আমরা ওদের ধরে ফেলে রাত শেষে আবার নতুন শিকারের খোঁজে পথে নামতে পারব।

তার কথার পর সময় নষ্ট না করে নেকড়ের দল আবার চলতে শুরু করল দ্রুত গতিতে।

একবারও বিশ্রামের জন্য থামেনি তারা। পথে দু-একজন নিম্নশ্রেণির পথিকের সঙ্গে কথা বলে এনায়েতরা জানতে পারল তারা ঠিক পথেই এগোচ্ছে। ক্রমশই ব্যবধান কমে আসছে শিকার ও শিকারিদের মধ্যে। বেলা গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকাল। অবশেষে সূর্য ডোবার কিছু আগে এনায়েতরা দেখতে পেল তাদের! এ জায়গার আশেপাশে পাঁচ-সাত ক্রোশের মধ্যে কোনও লোকালয় নেই। রাস্তার এক পাশে দিগন্তবিস্তৃত পতিত জমি, আর অন্য পাশে বড় বড় গাছে তিন দিক ঘেরা জঙ্গল। তার মধ্যে এক খণ্ড ফাঁকা জমি। দিন শেষে সেখানেই রাত কাটাবার উদ্যোগ নিচ্ছে লোকগুলো। তাদের শেষ রাত।

তাদের দেখা মাত্রই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। হ্যাঁ মাত্র বারো জন লোক। অসুবিধা হবে না। লোকগুলো এখনও তাদের দেখতে পায়নি। জহরত ব্যবসায়ীদের সামনে তারা কী ভাবে উপস্থিত হবে, সে পরিকল্পনা আগেই হয়ে গেছে। একটা পুঁটলি থেকে পোশাক বার করা হল। ফিরিঙ্গিটা পরে ফেলল জুতো সমেত সেই পোশাক। তাকে এবার সত্যিই কোম্পানির উচ্চপদস্থ লোকের মতো দেখাচ্ছে। কে বলবে তার হাতের ছোঁয়ায় এনায়েতদের চোখের সামনেই একটা মানুষ কবরে চলে গেল!

জহরত ব্যবসায়ীদের কাছে যাওয়ার আগে শেষ পরিকল্পনাটা এবার

BanglaBook.org

সেরে নিতে হবে। এনায়েত বলল,—কে ঝিরনী দেবে?

ঝগড়ু সর্দার বলল,—শিকারটা যখন তোমাদের তখন তুমিই ঝিরনী দিও। আর আঙ্গুছাও তোমরা পড়িও। আমাদের একজন লোক তোমার সঙ্গে থাকবে তোমার শিকারের গলায় আঙ্গুছা পরাবার পর তাকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলার জন্য। গব্বাগুলো আমাদের লোক খুঁড়ে দেবে।

এনায়েত বলল,—ঠিক আছে, 'তামাকু লাও' বলে দুই প্রহরে ঝিরনী তুলব আমি।

এনায়েত-ঝগড়ুর দলবল চাপা স্বরে একবার বলে উঠল, 'জয় মা ভবানী।' তারপর আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এগোল লোকগুলোর দিকে।

তিনগণ্ডা লোকের দলটাকে তাদের দিকে আসতে দেখে প্রথমে ঘাবড়ে গেল লোকগুলো। বন্দুকধারী দুজন তাদের বন্দুক তাক করল। মশলা ব্যবসায়ীদের একজন কোমর থেকে টেনে বার করল একটা ভূপালি কুকরি। এ লোকগুলো ডাকাত হলে মরার আগে তারাও কয়েকজনকে খতম করে দিয়ে যাবে। জহরত ব্যবসায়ীদের দলপতি ভগবান দাস শক্ত করে আঁকড়ে ধরল তার হাতের ছড়িটা। একটা গুপ্তি লুকানো আছে ওর মধ্যে।

কিন্তু এনায়েতদের দলটা কাছাকাছি যেতেই বেশ বিস্মিত হল জহরতকারবারিরা। আরে পথের সেই লোকগুলো! আবার একজন সাহেবও আছেন! দলটার সামনে এনায়েত আর সেই সাহেব।

এনায়েত আর ফিরিঙ্গিটা ভগবান দাসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এনায়েত ভগবান দাসকে বলল,—কোম্পানির সাহেবের সঙ্গে পথে দেখা হল। শুনেছেন তো সগরে গোলমাল শুরু হতে যাচ্ছে। সাহেব তার লোকজন নিয়ে ওখানে যাচ্ছেন। আমরা কাজের সন্ধান করছি জেনে আমাদেরও সঙ্গে নিলেন। আর ভূপাল যাব না। কাল একটু এগিয়ে সগরের রাস্তা ধরব।

BanglaBook.org

কোম্পানির পোশাক পরা ঠগিটা এবার গম্ভীর ভাবে জহরত ব্যবসায়ীদের পরিচয় জানতে চাইল। যেন তিনি অজানা জায়গাতে এতগুলো লোক দেখে বেশ সন্দিগ্ধ। লোকগুলোর সঙ্গে বন্দুক আছে! দিনকাল তো ভালো নয়! এনায়েত সঙ্গে সঙ্গে সাহেবকে আশ্বস্ত করার অভিনয় করে বলল,—হুজুর, এরা রইস, ইমানদার ব্যবসায়ী। কোম্পানির লোকদের খুব সম্মান করে। আমরা এদের সঙ্গে পথ চলেছি। আপনি নিশ্চিন্তে এদের সঙ্গে রাত কাটাতে পারেন।

তার কথা শুনে খুশি হলেন সাহেব। খুশি হল ঢাকার ব্যবসায়ীরাও। কোম্পানির সাহেব বলে কথা! ভগবান দাস সাহেবকে খাতির করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে তার এক অনুচরকে সাহেবের জন্য মাদুর আর তামাকের ব্যবস্থা করতে বলল। নিজের সম্ভ্রম বজায় রাখার জন্য সাহেব অন্যদের থেকে কিছুটা তফাতে মাদুরের ওপর হুঁকো হাতে বসলেন। জহরত ব্যবসায়ীরা ও মশলা ব্যবসায়ীরাও বসল নিজেদের মাদুরে। তাদের কিছু লোক আর এনায়েতদের কিছু লোকও নিজেদের নিজেদের রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার নামল রাস্তার পাশে সেই নির্জন বনে।

চাঁদ উঠল এক সময়। ক্ষয়াটে, ফ্যাকাসে, আধখাওয়া রুটির মতো একটা চাঁদ। অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গেই জহরত ব্যবসায়ীদের তাঁবুর বাইরে ক'টা মশাল জ্বালানো হয়েছিল। কিন্তু মশালের আলো অন্ধকার দূর করতে পারছে না। সেই ছোট্ট ফাঁকা জমিতে হেঁটে চলা মানুষগুলোকে মনে হচ্ছে তারা যেন মানুষ নয়, অশরীরী অবয়ব মাত্র। সাহেব একইভাবে গাছের তলায় বসে আছেন। ফাঁকা জমিটার তিনদিকের জঙ্গলে জমাট বাঁধা অন্ধকার। ক্ষয়াটে চাঁদের আলো সেখানে প্রবেশ করছে না। ঝিঁঝিঁ পোকার অবিশ্রান্ত কলতান ভেসে আসছে সেখান থেকে।

চাঁদ ওঠার বেশ কিছুক্ষণ পর খাওয়া শেষ হল সব দলেরই। চুলার আগুন নিভিয়ে দেওয়া হল। তাঁবু দুটোর সামনেই একটা ফরাসে বসল

BanglaBook.org

ব্যবসায়ীদের দল। সারাদিনের পথশ্রমের ক্লান্তি নিয়ে তাদের লোকজনরাও বসল সেখানে। দীনু আর ঝগড়ু সর্দারও সেখানে গিয়ে বসল। কিছু সময়ের মধ্যেই তাদের সঙ্গে গল্প জমিয়ে দিল দীনু। এনায়েত আর ফিরিঙ্গি ঠগিটা দুটো গাছের তলায় বসে। তাদের অন্য লোকজনরাও এদিকে-সেদিকে বসে বা দাঁড়িয়ে। প্রথম প্রহরে যখন শেয়াল ডাকল তখনও তন্ময় হয়ে দীনুর গল্প শুনছে সবাই।

বেড়ে চলল রাত। এক সময় সারা দিনের পথশ্রমের ক্লান্তিতে হাই উঠতে লাগল সবার, জহরত ব্যবসায়ীরা হয়তো আগেই তাদের তাঁবুতে চলে যেত কিন্তু সাহেবটা একই ভাবে গাছের তলায় বসে আছে। তাকে বাইরে রেখে নিজেরা তাঁবুতে রাত কাটাবে—এ কাজটা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছে না তারা! হাজার হোক কোম্পানির ফিরিঙ্গিসাহেব বলে কথা! অগত্যা ঢুলতে-ঢুলতে দীনুর গল্প শুনে চলল সবাই। অর্ধেক লোক প্রায় তন্দ্রাচ্ছন্ন। বন্দুকধারী দুজনও তাদের বন্দুক দুটো নামিয়ে রাখল। সঙ্গে যখন কোম্পানির ফিরিঙ্গি সাহেব স্বয়ং আছেন তখন আর ভয় কী? এর মধ্যে জহরতের কারবারি আর মশলা ব্যবসায়ীদের প্রত্যেকের পিছনে গিয়ে কখন যেন দুজন করে লোক এসে দাঁড়িয়েছে। ভাবখানা এমন, তারা যেন গল্প শোনার জন্য দাঁড়িয়েছে। এনায়েত আর ঝগড়ু সর্দারের একজন করে লোক।

মশালগুলো তখন নিবু নিবু হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে কোথা থেকে যেন একখণ্ড মেঘ এসে ঢেকে দিচ্ছে চাঁদটাকে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে চার দিক। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দু-প্রহরের শেয়াল ডাকবে। এনায়েত এবার উঠে দাঁড়াল। ফিরিঙ্গি সাহেবটাও উঠল। তারা দুজনে গিয়ে দাঁড়াল বসে থাকা লোকগুলোর কাছে। শুধু তাদের পিছনে দাঁড়ানো লোকগুলো তাকাল এনায়েতের দিকে। এখন শুধু সংকেতের অপেক্ষা। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হলুদ রুমালের ফাঁস চেপে বসবে লোকগুলোর গলায়।

এনায়েতের দিকে তাকিয়ে আছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো।

BanglaBook.org

পাথরের মূর্তির মতো শেয়ালের ডাক শোনার জন্য কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে সে। শেয়ালের ডাক শুনলেই সে ঝিরনী তুলবে। তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ফিরিঙ্গি ঠগিটা। হঠাৎ একখণ্ড মেঘ চাঁদকে ঢেকে দিল। চাঁদ মুখ তুললেই নির্ঘাত শেয়ালের পাল প্রহর ঘোষণা করবে। কিন্তু শেয়াল ডাকার আগেই অন্ধকারের মধ্যে সেই ফিরিঙ্গি ঠগিটা এনায়েতের বদলে একটা অদ্ভুত ঝিরনী তুলল, 'সিপাহী লোগ রশি লাও।' কী যেন একটা ঠান্ডা জিনিসের স্পর্শ লাগল এনায়েতের পাঁজরে। চাঁদ মুখ তুলল আবার কিন্তু তার সঙ্গে তিনদিকের জঙ্গলে জ্বলে উঠল মশালের আলো। শিয়ালও ডাকল, কিন্তু এনায়েতের ঝিরনী দেওয়া হল না। অবাক হয়ে সে দেখল পাশে দাঁড়ানো ফিরিঙ্গি ঠগির পিস্তলের নলটা তার পাঁজর ছুয়ে আছে। দুর্গা-দীনু-মোস্তাফা সবারই এক অবস্থা। ঝগড়ু সর্দারের প্রত্যেক লোকের হাতে পিস্তল, সেগুলো তাক করা তাদের দিকে। জায়গার যে দিকটা ফাঁকা সেদিকে ছুটবার চেষ্টা করল এনায়েতের দলের একজন, কিন্তু কিছুটা এগিয়েই বন্দুকের গুলিতে মুখ থুবড়ে পড়ল সে।

জঙ্গলের ভিতর থেকে ফাঁকা জমি থেকে বেরিয়ে এসেছে কোম্পানির অশ্বারোহী বাহিনী, আর কিছু লোক। সগর যায়নি তারা। নির্দেশমতো তারা অপেক্ষা করছিল এই বনে। তারা ঝটপট বেঁধে ফেলল এনায়েত ও তার সঙ্গীদের। কোম্পানির লোকগুলোর সঙ্গে একজনকে দেখে বেশ অবাক হল এনায়েতরা। আরে এই লোকটাকেই তো কবর দিয়েছিল ঝগড়ু সর্দার আর ফিরিঙ্গিরা! এনায়েতরা তিনজন নিজের চোখে দেখেছে সে ঘটনা। মুর্দা লাশ জিন্দা হয় কী ভাবে? ফিরিঙ্গি আর ঝগড়ু সর্দারই বা কে? মাথাটা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে এনায়েতের। সে ফিরিঙ্গিটাকে প্রশ্ন করল, 'কে তুমি?'

ফিরিঙ্গি হেসে জবাব দিলেন,—আমার নাম ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হেনরি স্লিম্যান। আজ থেকে অবশ্য আমার একটা নতুন নাম হল—

BanglaBook.org

'ঠগি স্লিম্যান।'

মশালের আলোতে এবার আলোকিত হয়ে উঠেছে জায়গাটা। ঝগড়ু সর্দার এবার এগিয়ে এসে এনায়েতকে বলল,—আমাকে চিনতে পারছ?

এনায়েত জবাব দিল,—না।

বুড়ো লোকটা বলল,—ঠিকই ধরেছিলে তুমি। আমার সঙ্গে আগে একবার তোমার দেখা হয়েছিল, বহু বছর আগে কলকাতার কালীঘাটের মন্দিরে। সেবার আমি মায়ের কাছে ছাগ বলি দেবার পর তুমি আমাকে আস্ত একটা রুপোর টাকা দিয়েছিলে মনে পড়ে?

হতবাক এনায়েত।

বুড়ো এরপর বলল,—আমার আরও একটা পরিচয় আছে, এ পথে আসার সময় গোহাটের পাশে বটগাছ তলায় যাকে তোমরা শুইয়ে এসেছিলে তার বাবা। এই বলে একটা ছুরি বার করে বৃদ্ধ সেটা এনায়েতের পাঁজরে বসিয়ে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু স্লিম্যান নিরস্ত করলেন তাকে।

দুই প্রহরের শেয়াল ডাকা রাতে নরসিংহপুর জেলার এই অখ্যাত বনপথে যে কুনাট্যের যবনিকাপাত হল তার পিছনে যে ইতিহাসটা আছে তা জানা দরকার স্লিম্যানের। এনায়েত ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষী। পরদিন ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে জব্বলপুরের দিকে যাত্রা শুরু করল দলটা। যে হাতে এনায়েত ওরফে ফিরিঙ্গিয়া তার হলুদ রুমালের ফাঁসে ন'শো জনের বেশি মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে, এ দেশের পথে প্রান্তরে তার সেই হাত আজ দঁড়িবাঁধা। সেই দড়ি ধরে ঘোড়ার পিঠে চড়ে চলেছেন গর্বিত এক নায়ক-ঠগি স্লিম্যান। কুঠিতে ফিরে প্রথমে তাঁকে ঝগড়ু সর্দার ওরফে পুরঙ্গোয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ আর সঙ্গের বাজিকরের হাতে পুরস্কার তুলে দিতে হবে। যারা দুজন তাঁর সঙ্গে না থাকলে কোনওদিনই উন্মোচিত হত না কুয়াশাবৃত এক ভয়ংকর ইতিহাসের আবরণ।

BanglaBook.org

পরিশিষ্ট

'ঠগি স্লিম্যান'—এই নামেই স্লিম্যান বিখ্যাত হয়েছিলেন পরবর্তী কালে। ইতিহাসের কুখ্যাততম হত্যাকারী ফিরিঙ্গিয়া ওরফে এনায়েতের দলের বেশ কিছু সদস্যের ফাঁসি হয়। রাজসাক্ষী হওয়ায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় এনায়েতের। স্লিম্যান কৌশলে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন এবং তার সাহায্যে ঠগি নিধন যজ্ঞে নামেন তিনি। কোম্পানি তাকে ঠগি ও ডাকাতি দমন বিভাগের কমিশনার নিযুক্ত করেন। এনায়েতের সহায়তায় ১৮৩৫-১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ—এই ক'টা বছরের মধ্যে ১৪০০ ঠগির গলায় ফাঁসির দড়ি পড়ান।

উল্লেখিত কাহিনির কিছু অংশ ঐতিহাসিক ভাবে সত্য, কিছুটা কল্পনা আর কিছুটা লোককথা। তথ্য প্রমাণের কষ্ঠিপাথরে বিচার করা কোনও ঐতিহাসিক নিবন্ধ নয়, এটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত নিছকই একটি উপন্যাস মাত্র।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

কত কক্ষে কাগজ পোড়ে

ভিক্ষু রাহুলশ্রীভদ্র অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন সেই বিরাট স্থাপত্যের দিকে। রত্নদধি। বহুতল বিশিষ্ট প্রধান গ্রন্থাগার। রত্নদধির দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে আকারে তার থেকে কিছুটা ছোট আরও দুটি বহুতল গ্রন্থাগার। রত্নসাগর ও রত্নরঞ্জক। প্রাকারের ওপাশে অনতিদূরে দণ্ডায়মান অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণির ফাঁক গলে গলে, বিকালের সোনালি আলো এসে পড়েছে লাল ইটের তৈরি বিশাল চত্বরের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে থাকা ওই তিনটি স্থাপত্যের ওপর। রত্নদধির রজন আর লাক্ষার প্রলেপের ওপর সোনালি রং করা স্তম্ভ, খিলান, অলিন্দ, গবাক্ষ অস্তাচলগামী সূর্যালোকে সত্যিই সোনার তৈরি বলে মনে হচ্ছে।

ভিক্ষু রাহুল বহু বছর আছেন এখানে। ওই স্থাপত্য তিনটির দিকে তাকালে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায় তাঁর। রাহুলশ্রীভদ্র পদমর্যাদায় একজন গোশো, অর্থাৎ অধ্যাপক। তাঁর জ্ঞানের পরিধির জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন। এমনকী মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রীভদ্রও রাহুলের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে আস্থাশীল। কিন্তু ওই রত্নদধি, রত্নসাগর, রত্নরঞ্জকের দিকে তাকালেই রাহুলের নিজেকে বড় দীন, নিঃস্ব বলে মনে হয়। মনে হয় এ জীবনে কিছুই তাঁর জানা হল না। লোকে যে তাঁকে পণ্ডিত কেন বলে কে জানে! কত ক্ষুদ্র তাঁর জ্ঞানের পরিধি!

মানুষ তো মরণশীল। যে ভগবান বুদ্ধ রোগ, জরা, মৃত্যুর থেকে মানুষের মুক্তি খুঁজতে লুম্বিনীর প্রাসাদ ছেড়ে পথের ধূলিকণা গায়ে মেখে নিয়েছিলেন তিনিও জরা, মৃত্যুকে এড়াতে পারেননি। কিন্তু তবুও তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী। কারণ, তিনি প্রেম, করুণা, জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করেছেন এ পৃথিবীকে। আলোকবর্তিকা হয়ে মার্গ দর্শন করাচ্ছেন ভবিষ্যতের মানুষদের। তিনি হয়তো স্বশরীরে এ পৃথিবীতে

BanglaBook.org

নেই, কিন্তু তাঁর চিন্তা, চেতনা, দর্শন সবই আজও জীবন্ত হয়ে আছে পণ্ডিতচূড়ামণি শীলভদ্র, জ্ঞানভদ্র, জিনমিত্র, স্থিরমতি, চন্দ্রপাল প্রমুখ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের লেখনীতে, ওই রত্নদধির শতকক্ষে থরে থরে সাজানো তালপাতা, রেশম, তুলোটের রাশি রাশি পুঁথিতে। বুদ্ধর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ওই গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কক্ষের জ্ঞানভাণ্ডারে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জেগে আছেন শান্তরক্ষিত, শান্তিদেব, কম্বলপাদ, শবরীপাদের মতো সিদ্ধপুরুষরা।

শুধু কি বৌদ্ধ বা হিন্দু ধর্মশাস্ত্র? কী নেই, কারা নেই ওই রত্নদধি, রত্নসাগর বা রত্নরঞ্জকে? ভগবান বুদ্ধের জন্মের অনেক আগের শ্লোকও অনুলিখিত হয়ে আছে ওইসব রাশিকৃত পুঁথিতে। কালিদাস আছেন তাঁর মেঘদূতে, আর্য্যভট্ট তাঁর সংখ্যাতত্ত্বে। এ ছাড়া বুদ্ধ পরবর্তী পাণিনি আছেন সংস্কৃত পুঁথিতে, এমনকী অদূর অতীতের বানভট্টর হর্ষচরিত, বাকপতিরাজের গৌরবহ, আর নবীন কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতও আছে ওই তিন বহুতলের কোনও না কোনও কক্ষে।

এক কথায় বলতে গেলে সভ্যতার উষালগ্ন থেকে এ দিন পর্যন্ত এই প্রাচীন দেশের যাবতীয় ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা অক্ষর হয়ে ধরা আছে ওই বাড়িগুলির মধ্যে। পুঁথির সংখ্যা দশ লক্ষ। সারা পৃথিবীতে আর কোথাও এত পুঁথি এক সঙ্গে সঞ্চিত নেই। রাহুল মনে মনে ভাবেন এই জ্ঞানসাগরের কতটুকুই বা পাঠ করতে পেরেছেন তিনি?

ওই রত্নদধি, রত্নসাগর, রত্নরঞ্জকই এই মহাবিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র। এই গ্রন্থাগারগুলোর জন্যই তো সুদূর চীন, কাম্পুচি, তিব্বত, সিংহল, যবদ্বীপ এমনকী আরও সুদূর ম্যাসিডনিয়া থেকে ছাত্র-পণ্ডিতের দল এখানে ছুটে আসেন। ইদানীং একে মহাবিদ্যালয়ের পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয় বলা হচ্ছে। রাহুল মনে করেন সেটাই যুক্তিযুক্ত। এ মহাবিদ্যাশ্রমে আটটি মহাকক্ষ ছাড়াও আরও তিনশোটি কক্ষ আছে। মহাবিহার

BanglaBook.org

বিক্রমপুরী, তক্ষশীলা, ওদন্তপুরী থেকে কিছু কালের জন্য ছাত্র পাঠানো হয় এখানে। তখন ছাত্রসংখ্যা আরও বাড়ে, আর কী না পড়ানো হয় এখানে! বৌদ্ধ ও হিন্দুশাস্ত্র ছাড়াও শব্দবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, শিল্পস্থানবিদ্যা, আয়ুর্বেদ, ভেষজবিদ্যা, সংখ্যাশাস্ত্র এমনকী সমুদ্রবিদ্যা, মহাকাশবিদ্যাও পড়ানো হয় এখানে। শিক্ষান্তে কৃতি ছাত্রদের কুলপতি বা পণ্ডিত উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তারপর তাঁরা এখানেই কেউ কেউ রয়ে যান, যেমন রয়ে গেছেন রাহুলশ্রীভদ্র, কেউ বা আবার জ্ঞানের আলোকবর্তিকা নিয়ে ফিরে যান নিজের দেশে, সে দেশকে আলোকিত করার জন্য। তাই একে বিশ্ববিদ্যালয় বলাই শ্রেয়। কত পণ্ডিতের স্পর্শে, পদধূলিতে ধন্য এর মাটি। তাই তো সম্রাট হর্ষবর্ধনও নিজের পরিচয় দিতেন 'আমি নালন্দার পণ্ডিতদের দাস' বলে। হ্যাঁ, এর নাম নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়।

সন্ধ্যা নামবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। রত্নদধির দিকে তাকিয়ে আছেন রাহুল। সূর্য ডুবলেই সন্ধ্যা আরতি শুরু হবে প্রার্থনা কক্ষে। তার প্রস্তুতিতে রাহুলের পাশ দিয়ে প্রার্থনাকক্ষের দিকে সারবদ্ধভাবে হেঁটে চলেছে বৌদ্ধশ্রমণ, আবাসিক ছাত্রদের দল। নালন্দার মহাধ্যক্ষ থেকে কনিষ্ঠতম ছাত্র, সবাইকেই কিছু অনুশাসন মেনে চলতে হয় এখানে। তারই এক অঙ্গ প্রতি সন্ধ্যায় আরতির সময় প্রার্থনা কক্ষে উপস্থিত হওয়া। ব্যাধির প্রকোপ না থাকলে দিন শেষে সবাই উপস্থিত থাকে সেখানে। এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা সংক্রান্ত কোনও জরুরি নির্দেশ থাকলে মহাধ্যক্ষ সেখানেই তা ঘোষণা করেন। তাই প্রার্থনা কক্ষে সবার উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। এর ব্যতিক্রম শুধু কিছু মানুষ। ওই যারা মঠের প্রধান তোরণের মাথায় সার বেঁধে বসে আছেন। লোলচর্ম, মুণ্ডিত মস্তক, অতিবৃদ্ধ যে মানুষগুলোকে দূর থেকে পাথরের মূর্তি বলে ভ্রম হয়। যাদের বলা হয় মহাস্থবির ভিক্ষু। ওরা ও জায়গা ছেড়ে কোথাও যান না, নীচেও নামেন না। রোদ, জল, শীত উপেক্ষা করে তোরণের মাথায় বসে তাঁরা বুদ্ধর ধ্যান করেন।

BanglaBook.org

সারা বছর আহার-পানীয়ও গ্রহণ করেন না। শুধু বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন মাটির সরায় পরমান্ন ও এক ভাঁড় জল রেখে আসা হয় তাঁদের সামনে। ওই একদিনই চোখ মেলে খাদ্যগ্রহণ করেন তাঁরা।

ওদের কেউ কেউ নাকি দু-তিনশো বছর ধরে বসে আছেন ওখানে। জ্ঞানবৃদ্ধর দল। ওঁরা দৈনন্দিন অনুশাসনের বাইরে। শ্রমণদের বিশ্বাস এ মঠের আসল প্রহরী ওঁরাই। চোখ বন্ধ থাকলেও ওঁরা সবকিছু দেখতে পান। যদি কোনওদিন কোনও দুর্যোগের সম্ভবনা দেখা দেয়, তার পূর্বাভাস জানিয়ে ওঁরাই সবাইকে সতর্ক করে দেন। ঠিক যেমন বহুবছর আগে একবার ভূমিকম্পর সময় ভূমির দিকে আঙুল নির্দেশ করে তার আগাম খবর জানিয়ে দিয়েছিলেন জ্ঞানবৃদ্ধ শ্যেনপাদ। মঠের বাইরে অনেক লোকের জীবনহানি হলেও আগাম সতর্কবাণীর জন্য এ মঠে কারও কোনও ক্ষতি হয়নি সে ঘটনায়।

পাহাড়ের আড়ালে সূর্য ডুবল একসময়। ঢং ঢং করে সন্ধ্যা আরতির প্রস্তুতি ঘণ্টা বাজল। চিন্তাজপ ছিন্ন হল রাহুলের। চারপাশে তাকিয়ে তিনি দেখলেন চত্বর প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। সবাই গিয়ে উপস্থিত হয়েছে প্রার্থনা কক্ষে। গ্রন্থাগারগুলোর দিকে তাকিয়ে নিজের ক্ষুদ্রতার কথা ভাবতে ভাবতে দেরি হয়ে গেছে রাহুলের। তিনি তাড়াতাড়ি পা বাড়ালেন প্রার্থনা কক্ষের দিকে।

BanglaBook.org

বিশাল প্রার্থনা কক্ষ। এ মাথা থেকে ও মাথা প্রায় দেখা যায় না। দেওয়ালের গায়ে কুলুঙ্গিতে সার সার প্রদীপ জ্বলছে। তার আলোতে মাটিতে আসন পেতে বসে আছে ভিক্ষু ছাত্ররা। এত হাজার মানুষ সমবেত অথচ কোনও শব্দ নেই সভাগৃহে! সবাই তাকিয়ে আছে ঘরের শেষ প্রান্তে প্রদীপমালায় ভূষিত ভগবান বুদ্ধের বিশাল মূর্তির দিকে। পদ্মের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা পিতলের তৈরি বিশাল বুদ্ধমূর্তি। ডান হাতে তাঁর বরদ মুদ্রা, বাঁ-হাতে বস্ত্রাঞ্চল, সর্বাঙ্গে স্বচ্ছ

চীবর জড়ানো। করুণা ধারার আধার তাঁর ওই চোখ দুটো। ওষ্ঠাধারে জেগে আছে আবছা হাসি। এ মূর্তি এই নালন্দাতেই নির্মিত। ছাত্ররাই বানিয়েছে এ মূর্তি। ধূপ জ্বলছে। তার সৌরভ ভেসে বেড়াচ্ছে সারা ঘরে। মূর্তিবেদীর পাদমূলে বসে আছেন মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রীভদ্র সহ অন্যান্য বিভাগীয় প্রধান, মহাভিক্ষুরা। তাদের কিছুটা তফাতে পণ্ডিতদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে আসন পেতে বসলেন রাহুলশ্রীভদ্র।

আবার ঘণ্টা বাজল। বাইরে সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে। সন্ধ্যা আরতি শুরু হল। ধূপের ধোঁয়া, প্রদীপ শিখার নাচন, ঘণ্টাধ্বনি আর ভিক্ষু সন্ন্যাসীদের মন্ত্র কণ্ঠের উপসনা সঙ্গীত ছড়িয়ে পড়ল সুবিশাল এই প্রার্থনা কক্ষের প্রতিটা কোণে। চোখ বুজে, দুই হাত বুকের কাছে জড়ো করে ভগবানের প্রার্থনায় সামিল হল সবাই। শতায়ু অতিবৃদ্ধ ভিক্ষু থেকে এখানে পড়তে আসা কনিষ্ঠতম শিশু পর্যন্ত।

বেশ কিছু সময় ধরে প্রার্থনা চলল। ঘণ্টাধ্বনি থেমে গেলে একটা ছোট্ট বেদীর ওপর বলার জন্য উঠে দাঁড়ালেন নালন্দার মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রীভদ্র। আর তার সঙ্গে বিভিন্ন ভাষার অনুবাদকরা। বহু ভাষাভাষী ছাত্র আছে এখানে, তার জন্যই অনুবাদকের ব্যবস্থা। শাক্যশ্রীভদ্র আজ ছাত্র, অধ্যাপক, কর্মীদের জন্য কোনও কিছু ঘোষণা করলেন না। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর ছোট্ট দুটি শ্লোক বললেন—

'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ জাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।'

এর অর্থ হল, 'এ আসনে বসে আমার দেহ যদি শুকিয়ে যায়, চর্ম, অস্থি, মাংস প্রলয়ে ডুবে যায়, দুর্লভ বোধজ্ঞান না পেলে এ

BanglaBook.org

আসন ছেড়ে আমি উঠব না।' বুদ্ধর কঠোর তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাতে অপদেবতা 'মার' যখন তাঁকে প্রলুব্ধ করছিল, নানাভাবে ভয় দেখাচ্ছিল, তখন বোধিসত্ত্ব এই কথাগুলো স্বগতোক্তি করেছিলেন। এক কথায় এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল, যে-কোনও আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়েই নিজের কর্তব্যে অবিচল থাকা। হঠাৎ আজ এই শ্লোক আবৃত্তি করলেন কেন মহাধ্যক্ষ? এর পিছনে কি বিশেষ কোনও ইঙ্গিত আছে? নিজের আসনে বসে ভাবতে লাগলেন রাহুলশ্রীভদ্র।

শ্লোক শেষ করে আর কিছু না বলে বেদী ছেড়ে নামলেন মহাধ্যক্ষ। নানা ভাষায়, নানা ভাবে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বিশাল প্রার্থনা কক্ষের এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্তে উচ্চারিত হল মহাধ্যক্ষর কথাগুলো। তারপর মহাধ্যক্ষর ইঙ্গিতে সভা শেষের ঘণ্টা বাজল। উঠে দাঁড়িয়ে বুদ্ধমূর্তির উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনাকক্ষ ছেড়ে বাইরে বেরোতে লাগল সবাই। প্রত্যেকেই ফিরে যাবে নিজের কাজে। ভিক্ষুশ্রমণরা ফিরে যাবেন তাঁদের দৈনন্দিন সান্ধ্য কাজে। শিক্ষক-অধ্যাপকরা তাঁদের কক্ষে ফিরে গিয়ে পরদিনের পাঠদানের প্রস্তুতি নেবেন। ছোট ছোট ছাত্ররা নিজের কক্ষে পৌঁছে প্রদীপের আলোয় পাঠ মুখস্ত করবে। তাদের অনুশীলন করাবে উঁচু শ্রেণির ছাত্ররা। এজন্য প্রতি কক্ষে একজন ছোট ছাত্রর সঙ্গে একজন বড় ছাত্রর থাকার ব্যবস্থা এই আবাসিক বিদ্যালয়ে।

রাহুলও উঠে দাঁড়ালেন বাইরে যাবার জন্য। ঘরে ফিরে তাকেও পাঠদানের প্রস্তুতি নিতে হবে। যদিও বহু বছর ধরে পাঠদান করছেন তিনি। কঠিনতম শ্লোকগুলোও ছাত্রদের সামনে নির্ভুলভাবে নিখুঁত উচ্চারণে ব্যাখ্যা সহ বলে যেতে পারেন তিনি। তবুও শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের আগে পাঠের বিষয়বস্তু আজও নিজে একবার পাঠ করে নেন তিনি। বেশ বয়স হল, স্মৃতি যদি প্রতারণা করে? ছাত্রদের পাঠদানে নিজের সামান্য ত্রুটিও নিজের ক্ষমাহীন ত্রুটি বলে মনে করেন পণ্ডিত রাহুলশ্রীভদ্র।

BanglaBook.org

রাহুল বাইরে বেরোতে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন এই বিশ্বদ্যিালয়ের প্রধান, পণ্ডিত শাক্যশ্রীভদ্র। দুই পণ্ডিত প্রথমে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানালেন পরস্পরকে। তবে আগে রাহুল মাথা নোয়ালেন, তারপর শাক্যশ্রীভদ্র। এটাই কেতা। বয়সে কিঞ্চিত ছোট হলেও পণ্ডিত শাক্যশ্রীভদ্র পদমর্যাদায় রাহুলের চেয়ে বড়। কাজেই সম্মান তাঁর আগে প্রাপ্য।

শাক্যশ্রী ঈষৎ চাপা স্বরে রাহুলের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আপনি একবার কিছু সময় পর আমার কক্ষে আসতে পারবেন? কিছু জরুরি আলোচনা আছে। জরুরি এবং গোপনীয়।'

রাহুল মৃদু বিস্মিত হলেন তাঁর কথায়। তারপর মুণ্ডিত মস্তক নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করলেন।

এরপর শাক্যশ্রী আর রাহুলকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত প্রার্থনাকক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

কী গোপনীয় কথা? তিব্বত থেকে খোথলোৎসা নামের এক অনুবাদকের ক'দিনের মধ্যেই এখানে আসার কথা। সে সম্পর্কে কি কোনও নির্দেশ? নাকি অন্য কোনও ব্যাপার?—এ সব ভাবতে ভাবতে বাইরে বেরিয়ে নিজের কক্ষের দিকে এগোলেন রাহুলশ্রীভদ্র।

BanglaBook.org

দুই

ইট বাঁধানো প্রশস্ত চত্বরে রত্নদধির ঠিক বিপরীতেই পণ্ডিতদের থাকার ব্যবস্থা। দ্বিতল বিশিষ্ট সার সার ঘর। পণ্ডিত রাহুল দ্বিতলে অলিন্দের শেষ প্রান্তের এক কক্ষে থাকেন। মাঝারি মাপের কক্ষ। কোনও বাহুল্য নেই সে ঘরে। রাশি রাশি পুঁথির মাঝে শুধু আছে নিতান্ত সাদামাটা এক শয্যা। মৃত্তিকা নির্মিত একটা জলাধার, সামান্য কিছু তৈজসপত্র। সেসবও মৃত্তিকার তৈরি। আর আছে পিতলের তৈরি পিলসুজ। সেটা

অবশ্য তাঁকে উপহার দিয়েছেন উপাধ্যক্ষ, ধাতুবিদ্যা বিভাগের প্রধান গৌতমশ্রীভদ্র।

ঘরে ফিরে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাহুল বেশ কিছুক্ষণ পাঠে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আজ যেন পাঠে তেমন মন বসল না তাঁর। মাথার মধ্যে কেবলই ঘুরপাক খেতে লাগল মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রীর কথা। কেন তিনি ডেকে পাঠালেন তাঁকে? পুঁথি ছেড়ে এক সময় উঠে পড়লেন তিনি। তারপর বাতি নিভিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে নীচের চত্বরে এসে দাঁড়ালেন। পাহাড়ের ওদিক থেকে ঠান্ডা বাতাস ভেসে আসছে। সে বাতাসে তিরতির করে কাঁপছে চত্বরের বিভিন্ন জায়গাতে দাঁড়িয়ে থাকা ভগবান বুদ্ধের মূর্তির সামনে জ্বলতে থাকা প্রদীপগুলো। প্রতি সন্ধ্যায় ভিক্ষুরা ওই প্রদীপগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে যান। চত্বরের ডানপাশে ত্রিতল বিশিষ্ট ছাত্রদের আবাসস্থল প্রাকারের প্রান্তসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। বাতায়ন থেকে বিচ্ছুরিত আলোক শিখায় ঝলমল করছে সেই ত্রিতল স্থাপত্য। যেন আজ দীপাবলি! সেখান থেকে ভেসে আসছে পাঠরত ছাত্রদের কণ্ঠস্বর। অনেকটা ভ্রমরের গুঞ্জনের মতো।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছে প্রবেশ তোরণের কাছেই দারু নির্মিত মহাধ্যক্ষর কক্ষ। সেখানেও আলো জ্বলছে। রাহুলশ্রীভদ্র এগোলেন সেদিকে।

নিজের কক্ষে বসে রাহুলের আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন পণ্ডিত চূড়ামনি শাক্যশ্রী। রাহুল প্রবেশ করলেন তাঁর ঘরে। মহাধ্যক্ষর কক্ষও রাহুলের ঘরের মতোই বাহুল্যবর্জিত। তাঁর কক্ষের মতোই সামান্য জিনিস আছে শাক্যশ্রীর কক্ষে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান হলেও তিনি রাজা নন, বৌদ্ধশ্রমণ। বৈভব তাঁকে মানায় না। সম্রাট থেকে সামান্য নাগরিক যুগ যুগ ধরে যে সম্পদ এ মহাবিদ্যালয়কে দান করে এসেছেন তার পরিমাণ বিপুল হলেও তা ব্যয়িত হয় ছাত্র কল্যাণে, সে সম্পদ মহাধ্যক্ষর জন্য নয়। শুধু একজন শ্রমণ সর্বক্ষণ

BanglaBook.org

নিযুক্ত থাকেন মহাধ্যক্ষর দৈনন্দিন কার্যকলাপে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু তিনি কোনও অর্থেই ভৃত্য নন। মহাধ্যক্ষর সাহায্যকারী মাত্র। শ্রমণরা পালা করে এ কাজের ভার নেন। কক্ষে একাই ছিলেন শাক্যশ্রী। প্রথামাফিক সম্মান বিনিময়ের পর রাহুল আসন গ্রহণ করলেন।

প্রদীপদানিতে বেশ বড় একটা মৃৎপ্রদীপ জ্বলছে. তার আভা এসে পড়েছে মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রীর মুখে। রাহুলের মনে হল মহাধ্যক্ষর মুখমণ্ডল কেমন যেন চিন্তাক্লিষ্ট। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন শাক্যশ্রী, তারপর নীরবতা ভঙ্গ করে রাহুলকে কিছুটা চমকিত করে বললেন, 'জ্ঞানশ্রেষ্ঠ, আপনি দীর্ঘদিন এ বিদ্যালয়ের ভালো-মন্দের সঙ্গে নিয়োজিত আছেন। এবং তা আমার এখানে পদার্পণের আগে থেকেই। ভগবান বুদ্ধর একনিষ্ঠ সেবক আপনি। এ বিদ্যাশ্রমের যাবতীয় বিষয় আপনার নখদর্পণে। একটা কথা আমাকে বলতে পারেন, ঠিক এই মুহূর্তে আমরা, এই মহাবিদ্যালয়, রাজনৈতিকভাবে, ধর্মীয়ভাবে ঠিক কতটা নিরাপদ?'

পণ্ডিত রাহুলশ্রীভদ্র একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিলেন, 'যদিও আমি এই মহাবিদ্যালয়ের প্রাকারের বাইরে দীর্ঘদিন যাইনি, তবে কথাপ্রসঙ্গে নবাগত ছাত্রদের মুখ থেকে যতটুকু সংবাদ পাই তাতে বিপদের আশঙ্কা আছে বলে মনে হয় না। যদিও আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক পাল রাজাদের রাজত্বের অবসান ঘটেছে। গৌড়ে বর্তমানে রাজা লক্ষণ সেনের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। তবুও তাঁর দিক থেকে কোনও বিপদ আসবে না বলেই আমার ধারণা। হতে পারেন তিনি হিন্দু, কিন্তু বৃহৎ অর্থে বলতে গেলে এ মহাবিদ্যালয় তো শুধু বৌদ্ধদের নয়, হিন্দুদেরও। হিন্দুধর্ম বিষয়ক এত পুঁথি, এত ধর্মগ্রন্থ, সাহিত্য গ্রন্থ পৃথিবীর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। রাজা লক্ষণ সেনও নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে অবগত আছেন। বহিঃপৃথিবীর রাজনীতি থেকে এ মহাবিদ্যালয় সবসময় নিজেকে দূরে রাখে। আমরা শুধু জ্ঞান দান

BanglaBook.org

করি। কোনও রাজা-মহারাজার দিক থেকে তো বিপদের সম্ভবনা দেখছি না।'

এরপর একটু থেমে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, একথা ঠিক যে বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযানের মতো উপসম্প্রদায়ের উৎপত্তির জন্য, বৌদ্ধ ধর্মে তান্ত্রিকতার অনুপ্রবেশের কারণে বৌদ্ধধর্ম কোথাও কোথাও দুর্বল হয়েছে বা পথভ্রষ্ট হয়েছে। হিন্দু বৈদিক পণ্ডিত শঙ্করাচার্যের দেখানো পথ ধরে হিন্দুধর্মেরও পুনরুত্থান শুরু হয়েছে। কিন্তু সে সবের আঁচ বৌদ্ধ ধর্মের ওপর এসে পৌঁছোতে আরও অনেক সময় লাগবে। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে লেখা আছে আত্মা অবিনশ্বর। পাবক তাকে পোড়াতে পারে না, শস্ত্র তাকে ছেদ করতে পারে না। ভগবান বুদ্ধ তো প্রেমের কথা, করুণার কথা বলে গেছেন। মানবপ্রেমের যে পথ তিনি দেখিয়েছেন তা ওই আত্মার মতোই অবিনশ্বর। শস্ত্র তাকে ছেদ করতে পারবে না। আগুন তাকে পোড়াতে পারবে না। যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবে এই ধর্ম, ভগবান বুদ্ধর বাণী, তাঁর জীবনাদর্শ। যা রক্ষিত আছে ওই রত্নদধি, রত্নসাগর, রত্নরঞ্জকের বিভিন্ন কক্ষে।'

রাহুলের কথা শোনার পর মহাধ্যক্ষ বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন প্রাজ্ঞ। হিন্দুরাজা বা হিন্দুধর্ম থেকে বিপদের আশঙ্কা আমি করছি না।'

'তবে? আপনি কী ধরনের বিপদের সম্ভাবনা দেখছেন?'

মহাধ্যক্ষ একটু চুপ করে থেকে জবাব দিলেন, 'যবন। তুর্কি ঘোড়সওয়ার হানাদার। পাটলিপুত্রর উপকণ্ঠে বেশ কিছু বৌদ্ধ মঠ, শিক্ষাকেন্দ্র তারা ধ্বংস করেছে। নির্বিচারে হত্যা করেছে বৌদ্ধ শ্রমণদের। ওদের দলপতির নাম বখতিয়ার। এক সময় সে বিন কাশেম বা মহম্মদ ঘোরীর অনুচর ছিল। যে ঘোরী আজমীরের রাজা পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করেছিলেন।'

এরপর তিনি বললেন, 'সামন্তরাজ আনন্দ পালের গুপ্তচর কুঞ্চক এ খবর সংগ্রহ করেছে। বর্তমানে ওই তুর্কী হানাদাররা অবস্থান

BanglaBook.org

করেছে শোন আর গঙ্গার সঙ্গম তটের জঙ্গলে। যদিও সে জায়গা এখান থেকে বেশ দূর, কিন্তু আমি যেন একটা অশুভ ইঙ্গিত পাচ্ছি।

'কী ইঙ্গিত?' প্রশ্ন করলেন রাহুল।

মহাধ্যক্ষ বললেন, 'আজ একজন শ্রমণ প্রধান তোরণের মাথায় উঠেছিলেন কী একটা কাজে। তিনি দেখেছেন মহাস্থবির কাকপাদ চোখ মেলেছেন। হঠাৎ তিনি জেগে উঠলেন কেন? বছরের একটা দিনই তো তাঁরা চোখ মেলেন পরমান্ন গ্রহণের জন্য। আর চোখ মেলেন দুর্যোগ হলে। এ ঘটনায় আশঙ্কা দানা বাঁধছে মনে। আমি এখন আপনাকে নিয়ে প্রধান তোরণের মাথায় অলিন্দে যেতে চাই। যদি জ্ঞানবৃদ্ধ কাকপাদ বিপদ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করেন।' এই বলে নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রীভদ্র।

মহাধ্যক্ষর কক্ষ থেকে বাইরে বেড়িয়ে প্রধান তোরণের অভিমুখে এগোলেন দুজন। স্তূপের প্রদীপগুলো এখন নিভু নিভু হয়ে এসেছে। আশ্রমিকদের পাঠের গুঞ্জনধ্বনি অনেকটাই স্তিমিত। তাদের ঘরের আলোগুলো একে একে নিভতে শুরু করেছে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। তার আলো ছড়িয়ে পড়েছে শান বাঁধানো প্রশস্ত চত্বরে, রত্নদধি, রত্নসাগর, রত্নরঞ্জকের গায়ে। রত্নদধির পঞ্চমতলে এক প্রকোষ্ঠে বাতি জ্বলছে। ওখানেই প্রধান গ্রন্থাগারিক পণ্ডিত কৌশিকী থাকেন। প্রবীণ মানুষ তিনি।

প্রধান তোরণের দিকে এগোতে এগোতে শাক্যশ্রী রত্নদধির পঞ্চম তলের সেই প্রকোষ্ঠের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সম্ভবত পণ্ডিত কৌশিকী এখনও কাজ করে চলেছেন। খ্রোথুলোৎসা যে আর ক'দিনের মধ্যে এখানে হাজির হবেন তা তো আপনি জানেন। তিনি কিছু চর্চাপদ অনুবাদ করে তিব্বতে নিয়ে যাবেন। মহাগ্রন্থাগারিক হয়তো সে সংক্রান্ত কোনও কাজেই নিযুক্ত আছেন।'

রাহুলশ্রীভদ্র বললেন, 'পণ্ডিত, অনুবাদক খ্রোথুলোৎসার আগমন বার্তা ইতিপূর্বে আমাকে আপনি দিয়েছিলেন। এমনও আপনি বলেছিলেন

BanglaBook.org

যে তাঁর আতিথেয়তার তদারকি আমাকেই করতে হবে। আজ আমার মনে হয়েছিল যে খ্রোথুলোৎসা প্রসঙ্গে কোনও কথা বলার জন্যই আপনি আমাকে আপনার কক্ষে যেতে বলেছেন। তা পণ্ডিত খ্রোথুলোৎসা কী কী পুস্তক অনুবাদ করবেন তা জানা যাবে কি?'

মহাধ্যক্ষ বললেন, 'তিনি পাঁচটি পুঁথি অনুবাদ করবেন। আমিই পঞ্চসিদ্ধাচার্যের পুঁথি নির্বাচিত করে দিয়েছি তাঁর অনুবাদের জন্য। ওই পাঁচটি পুঁথিতেই মোটামুটি ভাবে ধরা আছে বৌদ্ধ ধর্মের মূল বিষয় ও তার ব্যাখ্যা। শীলভদ্র, জ্ঞানমিত্র, জিনমিত্র, শান্তরক্ষিত, আর শবরীপাদ, এই পাঁচ জনের পুঁথি।'

রাহুলশ্রীভদ্র এরপর বললেন, 'আচ্ছা, তুর্কিরা হঠাৎ বৌদ্ধ মঠ, শিক্ষাকেন্দ্রগুলোকে তাদের আক্রমণের লক্ষবস্তু হিসাবে বেছে নিচ্ছে কেন?

মহাধ্যক্ষ বললেন, 'প্রাচীন বৌদ্ধ মঠ, শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে সম্রাট থেকে সাধারণ নাগরিক, যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন মূল্য জিনিস, সোনা-হিরা-জহরত ইত্যাদি দান করে আসছেন। আমাদেরও এ মঠেই যেমন রক্ষিত আছে ভগবানের উদ্দেশ্যে সম্রাট হর্ষবর্ধনের দান করা মানিক্যখচিত স্বর্ণকলস, ধর্মপালের দেওয়া স্বর্ণছত্র। তুর্কীদের লক্ষ ওই সব সম্পদ সংগ্রহ করা। তা ছাড়া এইসব মঠ-শিক্ষাকেন্দ্র তাদের পক্ষে আক্রমণ করা সুবিধাজনক, কারণ, এসব ক্ষেত্রে বলতে গেলে তাদের কোনও প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় না।'

কথা বলতে বলতে তাঁরা পৌঁছে গেলেন তোরণের সামনে। তোরণ স্তম্ভর গায়ে ছোট্ট কক্ষে প্রহরারত মুণ্ডিত মস্তক মাঝবয়সি এক শ্রমণ। তাঁর হাতে ধরা পিতল বাঁধানো একটা কাষ্ঠ দণ্ড। সেদিকে তাকিয়ে মহাধ্যক্ষ মৃদু হেসে বললেন, 'তোরণের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বলতে তো ওই কাষ্ঠদণ্ড। ও দিয়ে শৃগাল, কুকুরের অনুপ্রবেশ রোধ করা গেলেও তুর্কীদের প্রতিহত করা যাবে না।'

স্তম্ভ সংলগ্ন সোপান বেয়ে তোরণের মাথায় উঠতে হয়। পাঁচ

BanglaBook.org

হাত চওড়া, একশো হাত লম্বা তোরণের মাথার ওপরের জায়গাটা দেখতে অনেকটা ঝুলন্ত অলিন্দর মতো। তার কিছুটা তফাতে তফাতে বসে আছেন মহাস্থবির জ্ঞানবৃদ্ধরা। মুণ্ডিত মস্তক, শীর্ণ চেহারা, লোল চর্ম। চোখ বোজা, ধ্যানরত নিশ্চল মূর্তি সব। চাঁদের আলোতে তাঁদের দেখে মনে হচ্ছে, তাঁরা যেন মানুষ নন, প্রেতমূর্তি! কেউ কেউ হয়তো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এমন ভাবে ধ্যানরত। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। খুব সাবধানে ধ্যানরত কয়েকজনকে অতিক্রম করে শাক্যশ্রী আর রাহুল এসে দাঁড়ালেন একজনের সামনে। মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম জানালেন তাঁকে। মহাস্থবির জ্ঞানবৃদ্ধ কাকপাদ। কেউ বলে তাঁর বয়স দুশো বছর, কেউ তিনশো। কেউ বা বলে পাঁচশো বছর। সঠিক বয়স তাঁর জানা নেই রাহুলশ্রীভদ্রর। তবে আজন্ম তাঁকে তিনি এ জায়গাতে এ ভাবেই বসে থাকতে দেখে আসছেন। বয়সের ভারে তাঁর শরীর এতটাই জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে এসেছে যে হঠাৎ তাঁকে দেখলে নিশ্চিত কোনও অপরিচিত লোক বালক ভেবে ভুল করবেন। হ্যাঁ, তিনি চোখ মেলেছেন! রোমহীন অক্ষিপল্লবের মাঝে চোখের মণি দুটো স্থির নিশ্চল। অনেকটা মৃত মাছের চোখের মতো। শাক্যশ্রী ও রাহুল তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও মহাস্থবিরের দৃষ্টি যেন তাঁদের ছাড়িয়ে অনেক দূর প্রসারিত।

প্রাথমিক অবস্থায় তাঁদের দুজনের মনে হল, তাঁদের উপস্থিতি যেন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছেন না তিনি। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি একবার নড়ে উঠলেন। তারপর কাকপাদ তাঁর কাঠির মতো শীর্ণ বামবাহু প্রসারিত করে তর্জনী নির্দিষ্ট করলেন উত্তর-পূর্ব কোণে। ওদিকেই তো শোন আর গঙ্গার সঙ্গম!

মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রীভদ্র এবার তাঁর উদ্দেশ্যে ঈষৎ কম্পিত স্বরে বললেন, 'হে জ্ঞানবৃদ্ধ, কোনও দুর্যোগ কি আসছে? কী দুর্যোগ?'

কাকপাদ এবার তাঁর ডানবাহু প্রসারিত করলেন। এবার তাঁর তর্জনী নির্দিষ্ট সেই দিকে, যেদিকে চাঁদের আলোতে দাঁড়িয়ে আছে

BanglaBook.org

রত্নদধি, রত্নসাগর, আর রত্নরঞ্জক। তিন বহুতল গ্রন্থাগার।

তাঁর অঙ্গুলি নির্দেশ দেখে চমকে উঠলেন রাহুল। কী ইঙ্গিত করতে চাইছেন মহাজ্ঞানী কাকপাদ! মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রী আর রাহুল একবার পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন।

জ্ঞানবৃদ্ধ কাকপাদ, আরও কিছু পল তাঁর দু-বাহু পূর্বের ন্যায় দুদিকে প্রসারিত করে রাখলেন। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর দু-বাহু জানুর কাছে নেমে এল, দু-চোখের পাতা আবার মুদে গেল। ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন তিনি। দুই পণ্ডিত বুঝতে পারলেন সে চোখের পাতা আর বর্তমানে খুলবে না। তাঁদের ইঙ্গিত প্রদানের জন্যই জ্ঞানবৃদ্ধ কাকপাদের অক্ষিপল্লব উন্মিলিত ছিল। তাঁর উদ্দেশ্যে আর একবার প্রণাম জানিয়ে দুজন নীচে নেমে এলেন।

নিশ্চুপভাবে হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা চত্বরের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে আছে ভগবান বুদ্ধের বিশাল এক মূর্তি। হাতে ধরা পদ্মকোরক। চাঁদের আলোতে করুণাধারা ঝরে পড়ছে তাঁর চোখ বেয়ে। সন্ধ্যায় মূর্তির পাদমূলে প্রদীপ জ্বালিয়ে গেছিল শ্রমনরা। প্রায় সবক'টা প্রদীপই এখন নিভে গেছে। দু-একটা শুধু ম্রিয়মান হয়ে জ্বলছে। তাতে বেদিমূলের অন্ধকার যেন আরও গাঢ় লাগছে। প্রথমে মুখ খুললেন শাক্যশ্রী। তিনি বললেন, 'মহাজ্ঞানী কাকপাদের ইঙ্গিত দেখে মনে হচ্ছে আমার অনুমানই হয়তো সত্যি। তুর্কিরা হানা দেবে এখানে। আনন্দপাল ওদিকে গুপ্তচর পাঠিয়েছেন। তার সঙ্গে বার্তাবাহী কবুতর আছে। আশা করছি আগামী দ্বিপ্রহর বা সন্ধ্যায় তুর্কিদের গতিপ্রকৃতির সংবাদ মিলবে। তারা যদি এ শিক্ষাকেন্দ্রে সত্যিই তরবারী হানা দেয়, ভূগর্ভে রক্ষিত সম্পদের সন্ধান তারা পাবে না ঠিকই, এত ছাত্র আছে এখানে। নিষ্ঠুর তুর্কিদের তরবারি তাদের জীবন বিপন্ন করতে পারে। শ্রমন বা ভিক্ষুদের নিরাপত্তার কথাটা আমি তেমন ভাবছি না। আমি ভাবছি ছাত্রদের কথা। এ বিদ্যাশ্রমে পাঠ নিতে আসা ছোট ছোট ছাত্রদের কথা।

BanglaBook.org

ভবিষ্যৎ প্রজন্মর কাছে যারা পৌঁছে দেবে, ভবিষ্যৎ পৃথিবীর কাছে যারা বহন করে নিয়ে যাবে পরম করুণাময়ের প্রেম, ক্ষমা, মৈত্রী-শান্তির বাণী।'

একটু ভেবে নিয়ে রাহুলশ্রীভদ্র বললেন, 'যদি দেখা যায় সত্যিই বিপদ নেমে আসছে তাহলে সেক্ষেত্রে ছাত্রদের সাময়িকভাবে বিক্রমশীলা মহাবিহারে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। বিশেষত বালক ও শিশুদের।'

মহাধ্যক্ষ বললেন, 'হ্যাঁ, তেমন মনে হলে সে সিদ্ধান্তই নিতে হবে। সঠিক পরামর্শ দিয়েছেন আপনি। এমনকী কিছুটা দূর হলেও বয়স্ক ছাত্রদের রক্তমৃত্তিকা বৌদ্ধ বিহারেও পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আমার, আপনার বা শ্রমণদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আমি তেমন চিন্তিত নই। আমরা ভাগবানের সেবক। আমাদের প্রতি ভগবানের যা ইচ্ছা তাই হবে।'

'কিন্তু আসল রত্নরাজীর নিরাপত্তার ব্যাপারে কী করবেন? জ্ঞানবৃদ্ধ কাকপাদ ওদিকে অঙ্গুলি দর্শন করলেন কেন?' এ প্রশ্ন করে রাহুল তাকালেন চাঁদের আলোতে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রন্থাগারগুলির দিকে।

মহাধ্যক্ষ একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'ওই তিন গ্রন্থাগারে যেসব রত্ন আছে সেসব আশা করি তুর্কিদের অজ্ঞানতা হেতু তাদের কাছে মূল্যহীন। তবে একটা কথা আমি বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবছিলাম। তুর্কি আক্রমণ নয়, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোনও দুর্ঘটনা যদি কোনও দিন ঘটে, তখন ওই সব অমূল্য রত্নপুঁথি যদি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তখন কী হবে? চিরতরে হারিয়ে যাবে ওই সব দুর্মূল্য লেখা। তাই আমি ঠিক করেছি বিভিন্ন বিষয়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ পুঁথিগুলোর অনুলিপি করিয়ে সেগুলো অন্যান্য বৌদ্ধশিক্ষা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেব। প্রধান গ্রন্থাগারিক ওই সব পুঁথির একটা তালিকাও প্রস্তুত করেছেন। সে কাজ দ্রুত শুরু হবে। খ্রোথুলোৎসাও আসছেন, তাঁর মাধ্যমে কিছু পুঁথির অনুলিপি তিব্বতেও পাঠাবার ইচ্ছা আছে আমার।'

BanglaBook.org

রাহুলশ্রীভদ্র শুনে বললেন, 'নিরাপত্তা বা অন্য কোনও কারণেই হোক, ওই অনুলিপির পরিকল্পনাটা বেশ ভালো। এতে নালন্দার অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডারের কিয়দংশ আমরা ছড়িয়ে দিতে পারব পৃথিবীতে। কত ছাত্রকেই বা আর আমরা এখানে স্থান দিতে পারি? পাঠ দিতে পারি? স্থানাভাবে অনেককেই তো ফিরিয়ে দিতে হয়। মূল্যবান পুঁথিগুলির অনুলিপি অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্রে থাকলে ছাত্ররা সেখানে গিয়েও ওইসব পুঁথির রসাস্বাদন করতে পারবে। ওই সব শিক্ষাকেন্দ্রগুলোও পরিপুষ্ট হবে।'

এরপর একটু থেমে রাহুলশ্রীভদ্র বললেন, 'এমনও হতে পারে আমরা বৃথাই দুশ্চিন্তায় কালক্ষেপ করছি। পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা এ মঠের উপস্থিতিই হয়তো জানা নেই তুর্কিদের। বৌদ্ধ হোক বা হিন্দু, সবাই এই শিক্ষাকেন্দ্রকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। এমন আর কেউ নেই যে, সে গিয়ে এই মঠের খবর, গচ্ছিত সম্পদের খবর তুর্কিদের কানে তুলে দেবে, তাদের পথ দেখিয়ে এখানে আনবে। অনেক রাত হল, মহাধ্যক্ষ এবার আপনি কক্ষে ফিরে বিশ্রাম নিন।'

মহাধ্যক্ষ বললেন, 'হ্যাঁ, অনেক রাত হল। এবার যাই। কাল দ্বিপ্রহরে আপনি একবার আমার কক্ষে আসবেন।'

মাথা ঝুঁকিয়ে পারস্পরিক বিদায় অভিবাদন জানিয়ে তাঁর দুজন দুদিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিলেন কিন্তু মহাধ্যক্ষ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হয়তো একজন আছে, যে আমাদের ক্ষতি চায়।'

'কে, সে?' বিস্মিতভাবে জানতে চাইলেন রাহুলশ্রীভদ্র।

মহাধ্যক্ষ, শাক্যশ্রী জবাব দিলেন, 'তিনি যোগবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ তক্ষকশ্রী। বারংবার নিষেধ করা সত্ত্বেও তন্ত্রচর্চা ও ছাত্রদের অযাচিত ভাবে প্রহার করার অভিযোগে যাঁকে কয়েক বৎসর পূর্বে এই শিক্ষাকেন্দ্র থেকে বহিষ্কার করা হয়। যাবার আগে তিনি বলে গেছিলেন তিনি একদিন আমাদের সমুচিত শাস্তি বিধান করবেন।'

'তক্ষকশ্রী! তিনি এখন কোথায় থাকেন?'

BanglaBook.org

মহাধ্যক্ষ জবাব দিলেন, 'শুনেছি ওই শোন-গঙ্গা সঙ্গমেই কোনও এক জঙ্গলে তিনি এক পরিত্যক্ত মঠে একাকী থাকেন ও তন্ত্র সাধনা করেন।' এরপর আর কোনও কথা না বলে নতমস্তকে চিন্তাক্লিষ্ট মহাধ্যক্ষ ধীর পায়ে এগোলেন তাঁর কক্ষের দিকে।

তিন

ভিক্ষু মুদগল বলতেন—তার পায়ে নাকি হরিণের গতি। কিন্তু সে পা-ও যেন আর চলতে চাইছে। ক্রমশ অবসন্ন হয়ে আসছে। সারা রাত ধরে হাঁটছে সে। শুধু সারা রাত কেন, গত দুই পক্ষকাল ধরে শুধু হেঁটে চলেছে সে। মাঝে মাঝে হয়তো কোনও গ্রামে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নিয়েছে। দয়াপরবশত হয়ে কেউ কিছু ভিক্ষা দিলে তা দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছে। তারপর আবার হাঁটা। কত গ্রাম-নগর-নদী-জঙ্গল, তার ছোট্ট পা-দুটো অতিক্রম করেছে। কিন্তু সত্যি এবার সে যেন আর হাঁটতে পারছে না। সূর্যোদয় হচ্ছে। তার আলো ছড়িয়ে পড়ছে বনের আনাচে-কানাচে। সামনে একটা বিরাট বটবৃক্ষ দেখে তার তলায় বিশ্রাম নেবার জন্য বসতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় সে শুনতে পেল ঘণ্টাধ্বনি।

সেই ঘণ্টাধ্বনি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মুহূর্তের মধ্যে যেন তার সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। সঙ্গের ছোট্ট পুঁটলি আর ভিক্ষাপত্র রেখে সে চটপট উঠে পড়ল গাছের শাখায়। কিছু দূরে দাড়িয়ে আছে বিরাট বড় এক স্থাপত্য। ঘণ্টাধ্বনি সেখান থেকেই আসছে। প্রবেশ তোরণটাও দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হল। সেখানে রয়েছে বিশাল এক বুদ্ধমূর্তি। নতুন সূর্যের আলোতে সোনালি মূর্তিটা ঝলমল করছে। বিস্ময়সূচক একটা শব্দ বেরিয়ে এল ছেলেটার কণ্ঠ থেকে—'নালন্দা!'

কিছু সময় মন্ত্রমুগ্ধর মতো সেদিকে তাকিয়ে থাকার পর সে গাছ

BanglaBook.org

থেকে নেমে পড়ল। তারপর মাটি থেকে তার জিনিসপত্র তুলে নিয়ে এগোল সেদিকে। কিছু সময়ের মধ্যেই সে পৌঁছে গেল সেই প্রবেশ তোরণের কাছে। কিন্তু সে তোরণের সামনে গেল না। কিছুটা তফাতে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা ভয় কাজ করতে শুরু করল তার বুকের ভিতর। দ্বারী তাকে শিক্ষামঠে প্রবেশ করতে দেবে তো? সে তো সম্পূর্ণ অপরিচিত এখানে। যদি তার প্রবেশ অনুমতি না মেলে? গাছতলায় দাঁড়িয়ে সে লক্ষ করতে লাগল প্রবেশ তোরণটা।

নালন্দা তখন জেগে উঠেছে। ছাত্র-শিক্ষক-অধ্যাপকরা নিজ নিজ কক্ষে প্রস্তুত হচ্ছেন পাঠ-গৃহে যাবার জন্য। ভিক্ষুশ্রমণরাও তাঁদের দৈনন্দিন কাজে নেমে পড়েছেন। কেউ বাগিচা থেকে ফুল চয়ন করছেন তথাগতর পুজোর জন্য, কেউ-বা কাঠের দ্রোণ বা কলসে জল তুলছেন কূপ থেকে, কেউ-বা স্তূপ বা চত্বরের বিভিন্ন স্থানে দাঁড়িয়ে থাকা পাথর, ধাতুনির্মিত মূর্তিগুলোকে স্নান করাচ্ছেন, কেউ-বা আবার রত্নদধির সোনালি গিল্টি করা স্তম্ভগুলো রেশম বস্ত্রে ঘষে-মেজে পরিষ্কার করছেন।

একদল শ্রমণ বাইরে বেড়িয়ে প্রধান তোরণের সামনে পাথুরে চত্বরটা জল দিয়ে ধুতে লাগল। ছেলেটার একবার মনে হল যে তাদের কাছে গিয়ে ভিতরে ঢোকার অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু তার সাহসে কুলালো না। বিশাল তোরণের ফাঁক দিয়ে কর্মচঞ্চল শিক্ষাকেন্দ্রের ভিতরের কিয়দংশ দেখা যাচ্ছে। সে দেখতে পাচ্ছে, তার মতো ছোট ছোট ছেলের দল সার বেঁধে পুঁথি বগলে হেঁটে যাচ্ছে। সম্ভবত তারা যাচ্ছে শিক্ষা কক্ষে। সেও কি ওদের মতো পাঠ নেবার সুযোগ পাবে এই বিদ্যামঠে? ওদের মতন দল বেঁধে যেতে পারবে পাঠ নেবার জন্য? সে জন্যই তো সে এত দূরে ছুটে এসেছে। ভিক্ষু মুদগলিত এক সময় এখানে পাঠ নিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, পৃথিবীর সেরা শিক্ষাকেন্দ্র এই নালন্দা মহাবিদ্যালয়।

BanglaBook.org

হঠাৎ ছেলেটা দেখতে পেল উলটোদিক থেকে বেশ কয়েকটা গো-শকট আসছে। শকটগুলো শাক-সবজিতে পরিপূর্ণ। শ্রমণরাও ওই শকটগুলোকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই প্রধান তোরণের ফটক সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে গেল। কাছের এক গ্রাম থেকে শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য খাদ্যসামগ্রী আসছে। এত পরিমাণ শাক-সবজি শস্য নিয়ে শকটগুলো পরিপূর্ণ যে বলদগুলো সেই বোঝা টানতে পারছেন না। গাড়োয়ানদের সাহায্য করার জন্য তাই একদল বাচ্চা ছেলে শকটগুলোকে ঠেলে আনছে। তারা এ বিদ্যালয়ের মুণ্ডিত মস্তক, নাল সারাং পড়া ছাত্র নয়, সাধারণ পোশাক পরা গ্রাম্য বালক। শকট খালি করে তারা আবার গ্রামে ফিরে যাবে। তাদের দেখে একটা বুদ্ধি খেলে গেল ছেলেটার মনে। কিছুটা পিছু হটে সে একটা শকট অন্য ছেলেদের সঙ্গে ঠেলতে শুরু করল। একে একে শকটগুলো প্রবেশ করছে তোরণের ভিতর। একটা শকটের পিছু পিছু সেও ভিতরে প্রবেশ করল। কিছুটা এগোবার পর বিশাল চত্বরের ঠিক মাঝখানে এসে ছেলেটা দাঁড়িয়ে পড়ল। আর শকটগুলো চলে গেল রন্ধনশালার দিকে।

চারপাশে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল ছেলেটা। এবার সে কোথায় যাবে? কার সঙ্গে কথা বলবে? বিশাল চত্বরের চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে পাথর আর লাল ইটের তৈরি ছোট-বড় নানা স্থাপত্য। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা তিনটে স্থাপত্য দেখে চমকে গেল সে! এতবড় স্থাপত্য এর আগে সে দেখেনি। সবচেয়ে উঁচু বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক বুদ্ধমূর্তি। আরও স্তূপ, মূর্তি আছে চারপাশে, কিন্তু ওটাই সবচেয়ে বড়। পিতলের তৈরি বুদ্ধমূর্তি সকালের আলোতে সোনার মতো ঝলমল করছে।

ওটাই তবে সেই রত্নদধি, যেখানে পৃথিবীর সব জ্ঞান সঞ্চিত আছে। ভিক্ষু মুদগল একবার বলেছিলেন এর কথা! মনে মনে বলল ছেলেটা। চারপাশে অনেক লোকজন। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নানা কাজে মগ্ন।

BanglaBook.org

পঠন কক্ষগুলো থেকে সম্মিলিত ছাত্রদের পাঠ ভ্রমরের গুঞ্জনের মতো ভেসে আসছে। চত্বরের মাঝে মাঝে আম্রকুঞ্জ। তার নীচে বসেও ছাত্ররা পাঠ নিচ্ছে। নানা বয়সি ছাত্ররা। মুণ্ডিত মস্তক, পিঙ্গলবর্ণের পোশাক পড়া শিক্ষক-অধ্যাপকরা তাদের পাঠদান করছেন। মন্দিরের ভিতর থেকে ভেসে আসছে প্রার্থনা ধ্বনি—'বুদ্ধং শরনম গচ্ছামি, ধম্মং শরনম গচ্ছামি...।' সে শব্দ ছাত্র-শিক্ষকদের পঠনপাঠনে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে না, বরং সেই মন্ত্রধ্বনি যেন আবহ সঙ্গীতের কাজ করছে এই বিদ্যামঠে। সকালের উজ্জ্বল আলোর মতোই সেই প্রার্থনা সঙ্গীত সবার মনে শুচি-পবিত্রতা-একাগ্রতা এনে দিচ্ছে। ভিতরে প্রবেশ করার পর একটু ভয় ভয় লাগলেও ছোট ছেলেটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল সব কিছু। দু-একজন শ্রমণ-ভিক্ষু তার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে দু-একবার তাকালেও তাকে কোনও প্রশ্ন করল না।

এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এক সময় সে উপস্থিত হল চত্বরের শেষ প্রান্তে মৃগদাবের সামনে। একটা অশোক গাছকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার একটা স্থান কাঠের খুঁটির অনুচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। তার ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে বেশ কয়েকটা কস্তুরী মৃগ। কয়েকটা শাবকও আছে। তাদের দেখে ছেলেটা দাঁড়িয়ে পড়ল সেখানে। সেই বৃত্তাকার জায়গার মাঝখানে দাঁড়িয়ে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু হরিণগুলেকে কাঠের পাত্র থেকে ছোলার দানা নিয়ে খাওয়াচ্ছেন। ছেলেটা দেখতে লাগল ব্যাপারটা। বেশ মজা লাগছে তার। ভিক্ষু তাঁর পাত্র থেকে এক মুঠো দানা নিয়ে ছুড়ে দিচ্ছেন। আর হরিণের দল লাফিয়ে উঠে গলাধঃকরণ করছে সেগুলো।

হরিণকূলকে খাওয়ানো শেষ করে সেই শ্রমণ এরপর সেই বৃত্তাকার জায়গা থেকে বাইরে আসার জন্য পা বাড়ালেন। ছেলেটাও অন্য দিকে যাবার জন্য পা বাড়াতে যাচ্ছিল, ঠিক সে সময়ই ঘটনাটা হল। ঘেরা জায়গার আগল ঠেলে শ্রমণ বাইরে বেরোতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎই সেই উন্মুক্ত আগলের ফাঁক গলে বাইরে বেরিয়ে এল একটা

BanglaBook.org

হরিণ শিশু। বাইরে বেরিয়ে চারপাশে তাকিয়ে সে মনে হয় ঘাবড়ে গেল। সে ছুটতে শুরু করল এদিক-ওদিক। ভিক্ষুও তাকে ধরার জন্য তার পিছনে ছুটতে লাগলেন। কিন্তু ছটফটে হরিণ শিশুকে ধরা তার কর্ম নয়। বিদ্যুৎ শিখার মতো একবার এদিকে, অন্যবার ওদিকে ছুটে চলেছে সে।

আরও কয়েকজন শ্রমণও চারপাশ থেকে ছুটে এলেন সেই হরিণ শিশুকে ধরার জন্য। কিন্তু কেউ তাকে ধরতে পারছে না। সারা চত্বরে তাঁদের ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল প্রাণীটা। তারপর এক সময় সে সোজা ছুটতে লাগল উন্মুক্ত তোরণের দিকে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা চিৎকার করে উঠলেন, 'ধরো ধরো! বাইরে বেরিয়ে পাহাড়ের জঙ্গলে ঢুকে গেলে ওকে আর পাওয়া যাবে না।'

কথাটা কানে যাওয়া মাত্রই ছেলেটার পা-দুটোতে কেমন যেন শিহরন খেলে গেল। নিজের অজান্তেই যেন সে তার পুঁটলি আর ভিক্ষাপাত্র মাটিতে নামিয়ে রাখল। তারপর হরিণ পায়ে ছুটতে শুরু করল পলায়মান সেই হরিণ শিশুর দিকে। চত্বরে দাঁড়িয়ে সবাই প্রত্যক্ষ করতে লাগল সেই দৃশ্য। প্রাণীটা তখন তোরণের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, ঠিক সেই সময় ছেলেটা এক লাফে ধরে ফেলল তাকে। সে দৃশ্য দেখে ছোট শিশুরা তালি দিয়ে উঠল। শ্রমণরা তার কাছে ছুটে এল। প্রশংসার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে হরিণ শাবকটা নিয়ে তারা পা বাড়াল যথাস্থানে তাকে রাখার জন্য।

ছোট্ট প্রাণীটাকে ধরতে গিয়ে ছেলেটা মাটিতে পড়ে গেছিল। গায়ের ধুলো ঝেড়ে এরপর সে তার পুঁটলির সন্ধানে পা বাড়াতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই তার সামনে এসে দাঁড়ালেন একজন। মুণ্ডিত মস্তক, গৌরবর্ণের প্রশান্ত মুখমণ্ডল, পরনে পীতবর্ণের সংঘাতী, ডান হাতে বুকে ধরা আছে লাল শালু জড়ানো পুঁথি।

রাহুলশ্রীভদ্র। এক কক্ষে পাঠ দান শেষ করে তিনি কক্ষান্তরে গমন করতে যাচ্ছিলেন। ব্যাপারটা দেখে তিনি অবাক হয়ে গেছেন। এইটুকু

BanglaBook.org

ছেলের পায়ে এত গতি! তাই তিনি এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন ছেলেটার সামনে। ভালো করে তাকালেন ছেলেটার দিকে। রাহুল অনুমান করলেন সম্ভবত এ বালক দ্বাদশবর্ষীয় হবে। তার মাথায় কুঞ্চিত ঘন কেশদাম, ধুলোমলিন গৌরবর্ণ দেহ, পরনে মলিন পোশাক। তবে তার আয়তকার চোখ দুটো উজ্জ্বল। যা তার সব মলিনতাকে মুছে দিচ্ছে। রাহুল তাকে দেখে বুঝতে পারলেন এ ছেলেটি মহাবিদ্যালয়ের আবাসিক কেউ নয়। ছেলেটা বহিরাগত। তাঁকে দেখে মৃদু ভয়ের ভাব ফুটে উঠল ছেলেটার মুখে। ধরা পড়ে যাওয়ার ভাব। এই শ্রমণ যদি তাকে অনধিকার প্রবেশের জন্য এখনই বহিষ্কার করেন?

রাহুল সস্নেহে ছেলেটার কাঁধে হাত রেখে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি নিশ্চয়ই কাছের গ্রামে থাকো? ওই খাদ্যবাহী গোশকটের সঙ্গে এখানে প্রবেশ করেছ? তোমার পায়ে তো বেশ গতি। ঠিক হরিণের মতোই।'

ছেলেটা একটু ভয়ে ভয়ে জবাব দিল, 'আমি লক্ষণাবতী থেকে আসছি।'

'লক্ষণাবতী! সে তো অনেক দূর। বহু যোজন পথ। কার সঙ্গে তুমি এখানে এসেছ?' বিস্মিতভাবে জানতে চাইলেন রাহুলশ্রীভদ্র।

'একাই এসেছি। আমার কেউ নেই।' আমতা আমতা করে জবাব দিল ছেলেটা।

'অতদূর থেকে একা এসেছ? তোমার কেউ নেই? নাম কী তোমার?' আরও বিস্মিত হয়ে রাহুল জিগ্যেস করলেন তাকে।

ছেলেটা জবাব দিল, 'আমার নাম কঙ্ক। না, আমার কেউ নেই। জন্মের সময় আমার মাতৃবিয়োগ হয়। আমার পিতা ছিলেন পাল রাজার এক সামন্তর বার্তাবাহক। যুদ্ধে তিনিও মারা যান। লক্ষণাবতীর উপকণ্ঠে গঙ্গা তীরে এক মঠে আমি প্রতিপালিত হয়েছি।'

ছেলেটার কথা শুনে রাহুল ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। বাংলায় পাল রাজত্ব শেষ হয়ে সেন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও যুদ্ধের আগুন

BanglaBook.org

এখনও পুরোপুরি নেভেনি। পাল যুগে রাজ অনুগ্রহপ্রাপ্ত ভূস্বামীরা মাঝে মাঝেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে সেন রাজার বিরুদ্ধে। তখন যুদ্ধ বাধে। প্রাণহানি হয়। বহু শিশু অনাথ হয়। তাদের কেউ কেউ মঠে আশ্রয় নেয়। এই বালক তাহলে সেই হতভাগ্যদেরই একজন। কিন্তু ও এখানে কেন? কে তাকে এখানে পাঠাল?—এই ভেবে তিনি জানতে চাইলেন। 'তুমি যে মঠে থাকো সে মঠের অধ্যক্ষর নাম কী? তিনি কি কোনও বিশেষ কার্যহেতু তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন?'

কঙ্ক জবাব দিল, 'তাঁর নাম ভিক্ষু মুদগল, এক সময় তিনি এই শিক্ষানিকেতনে পাঠ লাভ করেছিলেন। মঠে তিনি একাই থাকতেন। শিশুকাল থেকে তিনি আমাকে পাঠদান করেছেন। কিছুদিন আগে হঠাৎ একদল যবন এসে হাজির হল মঠে। মুদগলকে হত্যা করল। মঠ জ্বালিয়ে দিল। আমাকেও ধরার জন্য ঘোড়সওয়াররা পিছু ধাওয়া করেছিল। কিন্তু আমার সঙ্গে ছুটে তারা পারেনি। মৃত্যুর আগে মুদগল আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি নালন্দায় যাও। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র নালন্দা। সেখানে গিয়ে তুমি জ্ঞানচর্চা করো। এই যে চারপাশে এত হানাহানি, রক্তপাত, ভগবান বুদ্ধর বাণীই একমাত্র পৃথিবীকে মুক্ত করতে পারবে এর হাত থেকে। নালন্দায় শিক্ষা লাভ করে তুমি বুদ্ধর বাণী প্রচার করবে। সে জন্যই আমি এখানে এসেছি।'

একটানা কথাগুলো বলে কঙ্ক উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শ্রমনের প্রত্যুত্তরের জন্য।

ভিক্ষু মুদগল ছিলেন ভগবান বুদ্ধর প্রিয় শিষ্য। তবে সে বহু শতাব্দী আগের মুদগল। কঙ্ক যে মুদগলের কথা বলছে তাঁকে স্মরণ করতে পারলেন না রাহুলশ্রীভদ্র। যুগ যুগ ধরে কত ছাত্রই তো শিক্ষা নিতে এসেছে এই মহাবিদ্যালয়ে। তারপর তাদের অনেকেই ছড়িয়ে পড়েছেন, সারা দেশে, সারা পৃথিবীতে। কঙ্ক বর্ণিত ভিক্ষু মুদগল হয়তো তাদেরই কেউ।

একটু ভেবে নিয়ে রাহুল বললেন, 'কিন্তু এ মহাবিদ্যালয়ে

BanglaBook.org

অন্তর্ভুক্তির জন্য নির্দিষ্ট কিছু বিধি-নিয়ম আছে। অন্য কোনও শিক্ষাকেন্দ্রর অধ্যক্ষের সুপারিশ প্রয়োজন, অথবা তোমার যা বয়স তাতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হবে। যে পরীক্ষা মাত্র কিছুদিন আগে সম্পন্ন হয়েছে, আবার এক বৎসর ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হবে। ভিক্ষু শ্রমন আর আবাসিক ছাত্র ছাড়া এখানে বাইরের কাউকে থাকতে দেওয়া হয় না। তোমার দেরি হয়ে গেছে। এখন তো আর...'

রাহুলশ্রীভদ্রর কথা শেষ হবার আগেই কঙ্ক তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরে ভীত কণ্ঠে বলে উঠল, 'দোহাই আপনাদের, আমাকে আপনারা বিতারিত করবেন না। আমাকে এখানে শিক্ষালাভের সুযোগ দিন, বহু দূর থেকে আমি এখানে আসছি। পথে শ্বাপদ অনুসরণ করেছিল, সামন্তর সেনারা ধাওয়া করেছিল, খাদ্যাভাবে অনেকদিন শুধু ঝরনার জল, বা বুনো ফলের বীজ খেয়েছি। এই দেখুন আমার পদযুগল, কাঁটায় কেমন ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, তবুও আমি এখানে এসেছি। দোহাই আপনাদের।' বলতে বলতে কঙ্কর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল।

রাহুলশ্রীভদ্র এ ঘটনায় বিব্রত বোধ করে তাকে বললেন, 'শান্ত হও, শান্ত হও।'

কঙ্ক আবার উঠে দাঁড়াল।

রাহুল কী যেন একটা ভেবে নিয়ে তাকে এরপর প্রশ্ন করলেন, 'ভিক্ষু মুদগলের কাছে এ যাবৎকাল তুমি কী কী অধ্যায়ন করেছ?'

মলিন কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছে কঙ্ক জবাব দিল, 'ভগবান বুদ্ধর জীবনী, কিছুটা সংখ্যাশাস্ত্র, কিছুটা ধাতুবিদ্যা।'

রাহুলশ্রীভদ্র নিজে বুদ্ধ-জীবন চর্চা বিভাগের অধ্যাপক। কিছুক্ষণ আগে উচ্চশ্রেণির ছাত্রদের এ বিষয়ে পাঠ দান করছিলেন তিনি। কঙ্কর কথা শুনে তিনি বললেন, 'তুমি বুদ্ধর জীবন চর্চার পাঠ নিয়েছ? আচ্ছা বলো তো এ কথার অর্থ কী?'

এরপর তিনি কঙ্কর উদ্দেশ্যে একটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন—

BanglaBook.org

'সো বোধিসত্ত্বো রতনবরো অতুল্যো।
মনুসসলোকে হিতমুখতায় জাতো।
সাকানং গামে জনপদে লুম্বিনেয্যে।'

রাহুলশ্রীভদ্র শ্লোক বলার পর কঙ্ক কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে জবাব দিল, 'এর অর্থ হল, শ্রেষ্ঠরত্নের মতো অতুলনীয় যে বোধিসত্ত্ব, তিনি লুম্বিনী-জনপদে শাক্যদের গ্রামে, মানবের মঙ্গল ও সুখের অন্য জন্মগ্রহণ করিলেন।'

নিখুঁত ব্যাখ্যা! চমকে উঠলেন রাহুলশ্রীভদ্র। তিনি যে শ্লোক বলেছেন তা পালি সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা পুরাতন গ্রন্থ 'সুত্তনিপাত'-এর শ্লোক। এ লেখা কঙ্কর থেকেও অনেক বেশি বয়সের ছাত্রদের পাঠ করানো হয় এখানে। রাহুল ভেবেছিলেন, কঙ্ক এর জবাব নিশ্চয়ই দিতে পারবে না। তখন তিনি তাকে সে এখনও এ মহাবিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণের যোগ্য নয় বলে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে একবছর পরে আসতে বলবেন। পুলকিত রাহুল এরপর উৎসাহিত হয়ে তাকে জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা বলো তো, এককথায় 'বোধিসত্ত্ব' শব্দের অর্থ কী?'

কঙ্ক প্রথমে জবাব দিল, 'বোধিসত্ত্ব' শব্দের অর্থ, "বোধি" মানে যে জ্ঞানে মানুষের মুক্তি ঘটে। আর এই জ্ঞানের জন্য যে "সত্ত্ব" অর্থাৎ প্রাণী চেষ্টা করে তাকে "বোধিসত্ত্ব" বলে।'—এ কথা শেষ করে কঙ্ক আবার বলল, 'দোহাই আপনার। আপনি এখানে থাকার, শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করে দিন। তার বিনিময়ে আপনি যে কার্য সম্পাদন করতে বলবেন তাতেই আমি রাজি।'

এবারও সঠিক উত্তর দিয়েছে এই বালক। মন্ত্রমুগ্ধের মতো রাহুলশ্রীভদ্র কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থাকার পর বললেন, 'দ্যাখো, এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু নিয়মনীতি আছে। তুমি

BanglaBook.org

এ বিদ্যালয়ে ছাত্র হবার যোগ্য, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে এখানকার নিয়মনীতি সবাইকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হয়। মঠের সুশৃঙ্খল পরিচালনার স্বার্থেই এসব নিয়ম প্রয়োজন। এ মঠের কেউই সে সব নিয়ম লঙ্ঘন করতে পারি না। আমি একটা কাজ করতে পারি। এই বিদ্যালয়ে মহাধ্যক্ষের কাছে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি। তিনি যদি পঠনপাঠনের অনুমতি দেন তোমাকে, তবেই তুমি এখানে থাকতে পারবে। নচেৎ নয়।'

তাঁর কথা শুনে কঙ্ক বলল, 'তাহলে আপনি আমাকে এ মহাবিদ্যালয়ের মহাধ্যক্ষের কাছে নিয়ে চলুন।'

রাহুলশ্রীভদ্র বললেন, 'নিয়ে যাব, কিন্তু এখন নয়, দ্বিপ্রহরে। আমি এখন শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করতে যাব। তোমার সঙ্গে বাক্যালাপে আমার দেরি হয়ে গেল। ওই যে দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি দেখছ, ওখানে তুমি আমার জন্য প্রতীক্ষা করো।' এই বলে তিনি আঙুল তুলে দেখালেন রত্নদধির প্রবেশ পথের পাশে বিশালাকার বুদ্ধমূর্তির দিকে। এই বলে রাহুলশ্রীভদ্র পাঠ দানের জন্য পা বাড়ালেন নির্দিষ্ট কক্ষের দিকে। সেখানে যেতে যেতে তার চোখে পড়ল একজন ঘোড়সওয়ার এসে দাঁড়াল নালন্দার পশ্চাত তোরণে। ঘোড়া থেকে নেমে তোরণ অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করল লোকটা।

BanglaBook.org

চার

পাঠ দানের সময় আজ রাহুলশ্রীভদ্রের নিজেরই কেন জানি মনোসংযোগের অভাব অনুভূত হল। কখনও তাঁর চোখে ভেসে উঠতে লাগল, কঙ্কর আয়তকার চোখ দুটো, কখনও আবার তাঁর মনে ভেসে উঠল জ্ঞানবৃদ্ধ কাকপাদের নিশ্চল দৃষ্টি। রত্নদধির দিকে তাঁর অঙ্গুলিহেলন। কী বলতে চাইলেন কাকপাদ? তবে রাহুলের

দীর্ঘদিনের পাঠ দানের অভ্যাস। সব পাঠই তাঁর মুখস্থ। কাজেই মন চঞ্চল হলেও পাঠ দানে কোনও ত্রুটি ঘটল না। পরপর বেশ কয়েকটা শ্রেণিকক্ষে পাঠ দান করলেন তিনি। দ্বিপ্রহরে পাঠ দানের সমাপ্তি ঘণ্টা বাজলে তিনি শ্রেণি কক্ষ ছেড়ে বেড়িয়ে এগোলেন রত্নদধির দিকে। দ্বারপ্রান্তে বিশাল বুদ্ধমূর্তির ছায়ায় বেদিমূলে বসেছিল কঙ্ক। পুঁটলি থেকে কী যেন বের করে খাচ্ছিল সে। রাহুল তার কাছে উপস্থিত হতেই একটু অপ্রস্তুতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'গত রাত থেকে খাওয়া হয়নি। তাই খাচ্ছিলাম। খাবেন আপনি? বেশ মিষ্ট।' এই বলে সে তার ছোট্ট মুঠিটা মেলে ধরল রাহুলশ্রীভদ্রর সামনে। তার হাতে আছে কোনও নাম না জানা বুনো ফলের বীজ।

কঙ্কর সরলতা আকৃষ্ট করল রাহুলকে। মৃদু হেসে তার হাত থেকে একটা বীজ তুলে মুখে পুরলেন। মিষ্ট কোথায়? এ যে বিষম কষা! খিদের জ্বালায় তাই চিবুচ্ছে ছেলেটা। তার অবস্থা দেখে বেশ মায়া হল রাহুলশ্রীভদ্রর। তিনি বললেন, 'এবার তাহলে মহাধ্যক্ষর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যাওয়া যাক।'

ছেলেটা বলল, 'হ্যাঁ, চলুন।' পুঁটলিটা আবার যষ্ঠীর মাথায় বেঁধে সেটা ঘাড়ে ফেলে রাহুলকে এরপর অনুসরণ করল সে। পাঠ গ্রহণ শেষ হয়েছে। দলে দলে ছাত্র এবার ফিরে যাচ্ছে নিজেদের কক্ষের দিকে। কেউ কেউ আবার পাত্র হাতে এগোচ্ছে রন্ধনগৃহের দিকে আহার সংগ্রহর জন্য। একদল ছোট ছোট ছেলেদের যেন খাওয়ার ইচ্ছেই নেই। পাঠ সম্পন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গেই কক্ষ থেকে বেড়িয়ে কাষ্ঠনির্মিত গোলক নিয়ে সারা প্রাঙ্গণ জুড়ে ছোটাছুটি করছে।

এসব দেখতে দেখতে রাহুলশ্রীভদ্রর পিছু পিছু কঙ্ক চত্বর পেরিয়ে মহাধ্যক্ষর কক্ষাভিমুখে এগোল। তাঁর কক্ষের ঠিক বাইরে অনেক কবুতর রাখা আছে খাঁচাতে। ডাকহরকরা কবুতর। দ্বার প্রান্তে কঙ্ককে দাঁড় করিয়ে মহাধ্যক্ষের কক্ষে প্রবেশ করলেন রাহুল। নিজের আসনেই বসেছিলেন মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রীভদ্র। কেমন যেন চিন্তাক্লিষ্ট মুখমণ্ডল।

BanglaBook.org

রাহুলকে দেখে তিনি বললেন, 'আসন গ্রহণ করুন। আমি আপনার প্রতীক্ষাতেই ছিলাম। মহা গ্রন্থাগারিক কৌশিকীকেও আসতে বলেছি। তিনিও কিছু সময়ের মধ্যেই এই কক্ষে উপস্থিত হবেন।'

মহাধ্যক্ষর কথা শুনে রাহুল একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আমি একজনকে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এনেছি। দ্বারপ্রান্তে আছে সে। তাহলে তাকে অপেক্ষা করতে বলি, আমাদের আলোচনা সাঙ্গ হলে তারপর আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করাব?'

মহাধ্যক্ষ জানতে চাইলেন, 'কে তিনি? কোনও শ্রমণ, ছাত্র? কোনও প্রার্থনা বা অভিযোগ আছে?'

রাহুল জবাব দিলেন, 'তার একটা প্রার্থনা আছে ঠিকই। তবে সে শ্রমণ বা আবাসিক নয়। দ্বাদশবর্ষীয় এক বালক। লক্ষণাবতী থেকে আসছে।'—এ কথা বলার পর কঙ্কর সঙ্গে তার সাক্ষাতের কথা, সমস্ত কথোপকথন বিবৃত করলেন রাহুলশ্রীভদ্র।

মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রী তাঁর কথা শুনে একটু বিস্মিত ভাবে বললেন, 'ভিক্ষু কৌশিকী তো এখনও উপস্থিত হননি। ততক্ষণে ওই বালকের সঙ্গে সাক্ষাত সেরে নেই। ওকে নিয়ে আসুন।'

রাহুলশ্রীভদ্রর সঙ্গে মহাধ্যক্ষের কক্ষে প্রবেশ করল কঙ্ক। শাক্যশ্রীর সামনে দাঁড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে সে প্রণাম জানাল মহাধ্যক্ষকে।

মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রীভদ্র কঙ্ককে ভালো করে একবার দেখলেন। তারপর তিনি বললেন, 'শুনলাম তুমি ইতিপূর্বে বুদ্ধ জীবনচর্চা, ধাতুবিদ্যা এ সবের কিছু পাঠ নিয়েছ। বলো তো, বোধিসত্ত্বের ছয়টি নাম কী কী?'

'শাক্যসিংহ, শৌদ্ধোদনি, মায়াদেবীসুত, অর্কবন্ধু, সর্বার্থসিদ্ধ ও গৌতম।' জবাব দিল কঙ্ক।

সঠিক উত্তর পেয়ে মহাধ্যক্ষ এরপর জানতে চাইলেন, 'তুমি তো মুদগল নামের এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর আশ্রয়ে ছিলে। ভিক্ষু শ্রমণরা যখন মাধুকরীর জন্য অন্যত্র গমন করেন তখন কোন আটটি জিনিস তার

BanglaBook.org

পক্ষে সঙ্গে নেওয়া যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়?'

কঙ্ক উত্তর দিল, 'তিনটি বস্ত্র খণ্ড, একটি পাত্র, একটি বাসি বা ছোট কাটার, একটি সূচ, জল ছেঁকার একটি নেকড়া ও কোমরে একটি তাগা। এ জিনিসগুলো বহন করা একজন ভিক্ষুর পক্ষে যথেষ্ট। এর বেশি প্রয়োজন নেই।'

এবারও নির্ভুল উত্তর দিল এই বালক। মহাধ্যক্ষ একবার তাকালেন রাহুলশ্রীভদ্রর দিকে। মহাধ্যক্ষের চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হল তিনি বলতে চাইলেন, 'এ বালক বেশ জানে।'

মহাধ্যক্ষ এবার তার ধাতুবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করলেন, 'মূর্তি নির্মাণের জন্য নমনীয় পিতল কোন কোন ধাতু, কী পরিমাণে মিশিয়ে তৈয়ার করা হয়? তরল ধাতু কোনটি?'

কঙ্ক সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'তরল ধাতু হল পারদ, আর নমনীয় পিতল তৈয়ার হয় ৬৫ ভাগ তামা ও ৩৫ ভাগ দস্তা দিয়ে।'

প্রশ্নোত্তর পর্ব চালাতে চালাতে বাইরের দিকে তাকালেন মহাধ্যক্ষ। গবাক্ষ দিয়ে বাইরের চত্বরটা দেখা যাচ্ছে। তার কিনারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে তিনটি গ্রন্থাগার। সূর্যের আলোতে ঝলমল করছে তিনটি বহুতল। যেন জ্ঞানের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে বিশাল স্থাপত্যগুলো থেকে। ওখান থেকেই মহাগ্রন্থাগারিক কৌশিকীর আসার কথা। গ্রন্থাগারগুলোর দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য কেমন যেন নিশ্চুপ হয়ে গেলেন মহাধ্যক্ষ। রাহুল লক্ষ করলেন যে মহাধ্যক্ষের কপালের চিন্তার ভাঁজগুলো যেন প্রকট হয়ে উঠেছে। আর এর পরই শাক্যশ্রীভদ্র অনেকটা স্বগোতক্তির স্বরেই এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসলেন, 'কত কক্ষে কাগজ পোড়ে?'

তাঁর প্রশ্নর অর্থ না বুঝতে পেরে কঙ্ক বলে উঠল, 'মানে?'

রাহুলশ্রীভদ্র প্রথমে হতচকিত হয়ে গেছিলেন এ কথা শুনে। কিন্তু মহাধ্যক্ষকে রত্নদধির দিকে তাকিয়ে এ প্রশ্ন করতে দেখায় মুহূর্তের মধ্যে 'কক্ষ' শব্দের মানে বুঝতে পেরে, বাক্যের মধ্যে যে ইঙ্গিত

BanglaBook.org

লুকিয়ে আছে তা অনুধাবন করে কেঁপে উঠলেন রাহুল। তবে এ কঠিন প্রশ্নর উত্তর তাঁর নিজেরও জানা নেই। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র নন। বিজ্ঞানের প্রাথমিক কিছু ব্যাপারেই শুধু সামান্য জ্ঞান আছে তাঁর।

কঙ্ক তাকিয়ে আছে তাঁদের মুখের দিকে। রাহুল তাকে প্রশ্নের মানে বুঝিয়ে দেবার জন্য বললেন, 'এ "কক্ষ"-র অর্থ গৃহ বা বাসস্থান নয়, এ "কক্ষ" হল উত্তাপের একক। মহাধ্যক্ষ তোমার কাছে জানতে চাচ্ছেন, কত উত্তাপে কাগজ ভস্মীভূত হয়?'

ছেলেটা বলল, 'এবার বুঝলাম। জল ২৮ কক্ষ তাপমাত্রার অধিক উষ্ণতায় বাস্পীভূত হয় জানি। স্বর্ণের গলনাঙ্ক ৩০০ কক্ষ তাও জানি। কিন্তু কত কক্ষে কাগজ পোড়ে তা জানি না।'

মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রী এবার যেন তাঁর সম্বিত ফিরে পেলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'না না, এ প্রশ্নর উত্তর তোমার জানার কথা নয়। তুমি অন্য সব প্রশ্নর সঠিক উত্তর দিয়েছ। তুমি যা জানো সেটাই যথেষ্ট। তুমি এখন বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো। তোমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত—তুমি যাঁর সঙ্গে আমার কাছে এল, এই পণ্ডিত রাহুলশ্রীভদ্র তোমাকে জানিয়ে দেবেন।'

মহাধ্যক্ষের কথা শুনে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেল কঙ্ক।

সে চলে যাবার পর মহাধ্যক্ষ, রাহুলশ্রীভদ্রকে বললেন, 'শেষ প্রশ্নটা করা আমার অনুচিত হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কী এর উত্তর আমারও জানা ছিল না। রসায়ন বিভাগের প্রধান পণ্ডিত সুত্রান্তিক আজ আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছিলেন। তিনি এক অগ্নিনিরোধক রাসায়নিক তৈয়ার করেছেন। পুঁথিতে যার প্রলেপ দিলে পুঁথি পুড়বে না। প্রাচীন এক বৈদিক পুঁথি থেকে তিনি ওই রাসায়নিকের কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। কথা প্রসঙ্গে তিনিই আমাকে জানালেন যে তুলোট কাগজ, তালপাতা নির্মিত পুঁথি ৬৬ কক্ষ তাপমাত্রায় ভস্মীভূত হয়।

BanglaBook.org

হঠাৎ এ কথাটা মনে পড়ে গেছিল আমার।'

রাহুলশ্রীভদ্র তাঁর কথা শুনে বললেন, 'মার্জনা করবেন। বাইরে তাকিয়ে আপনার হঠাৎ কাগজ পোড়ার কথা মনে এল কেন? আমি যা আশঙ্কা করছি তা কি সত্যি? জ্ঞানবৃদ্ধ কাকপাদ কি রত্নদধির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কোনও বিপদ সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক করতে চাইলেন?'

গবাক্ষ দিয়ে বাইরে রত্নদধির দিকে চেয়ে মহাধ্যক্ষ বললেন, 'সম্ভবত তাই।'

ঠিক এই সময় কক্ষে প্রবেশ করলেন প্রধান গ্রন্থাগারিক পণ্ডিত কৌশিকী। প্রৌঢ় মানুষ তিনি। জন্মসূত্রে সিংহলী। গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। কোনও সুদূর অতীতে, শৈশবে তিনি নালন্দায় পাঠ নিতে এসেছিলেন, তারপর এখানেই থেকে গেছেন। তাঁর মুখমণ্ডলে সব সময় এক টুকরো হাসি লেগে থাকে। পণ্ডিত হলেও তিনি অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেননি। সারাদিন তিনি মগ্ন থাকেন রত্নদধি, রত্নসাগর, রত্নরঞ্জকের জ্ঞানসমুদ্রে। ওই তিনটি বহুতল গ্রন্থাগারের অজস্র কক্ষে অগুনতি পুঁথির মধ্যে কোথায় কোন পুঁথি রাখা আছে নির্ভুলভাবে তিনি বলে দিতে পারেন। বলা যেতে পারে তিনি ওই জ্ঞান সমুদ্রের কাণ্ডারী। ছাত্র-অধ্যাপকদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেন। তাঁদের জ্ঞান আহরণ অনেকটাই পণ্ডিত কৌশিকী নির্ভর।

প্রথামাফিক অভিবাদন বিনিময়ের পর মহাগ্রন্থাগারিক আসন গ্রহণ করলেন।

কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ ভাবে কেটে গেল। মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রী বললেন, 'মহাসামন্ত আনন্দপালের দূত কুঞ্চক আজ খবর নিয়ে এসেছিল।'

রাহুল বললেন, 'হ্যাঁ, সে অশ্বারোহীকে আমি প্রবেশ করতে দেখেছি।'

মহাধ্যক্ষ এরপর বললেন গুপ্তচর মহাসামন্তর কাছে খবর পাঠিয়েছে

BanglaBook.org

সেই তুর্কি অশ্বারোহী বাহিনী এদিকেই আসছে। হয়তো আর এক পক্ষকাল বা তার চেয়ে কম সময়ের মধ্যে এখানে এসে পড়বে তারা। আসার পথে তারা আরও দুটো বৌদ্ধমঠ ধ্বংস করেছে, শ্রমণদের পুড়িয়ে মেরেছে। এমনকী ছোট ছোট শিশুদেরও রেহাই দেয়নি। নৃশংস যবনদের দলটা এখন অবস্থান করছে এক জঙ্গলের মধ্যে। ঠিক যে জঙ্গলে তন্ত্রসাধনা করেন এই বিদ্যাশ্রম থেকে বিতাড়িত তক্ষক। আজ সন্ধ্যায় এ মহাবিদ্যালয়ের মন্ত্রণা সভা আহ্বান করতে চলেছি। সান্ধ্য প্রার্থনার পর সে সভায় সব বিভাগের অধ্যক্ষ, শ্রমণ-ভিক্ষুরা উপস্থিত হবেন। আপনারাও থাকবেন। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিভাগীয় প্রধানদের নেতৃত্বে বিভিন্ন মঠে যত দ্রুত সম্ভব ছাত্রদের পাঠিয়ে দেব। তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারটা সর্বাগ্রে ভাবা প্রয়োজন। কিন্তু আমার চিন্তা ওই তিন বহুতলে রক্ষিত বিপুল পরিমাণ জ্ঞান ভাণ্ডার নিয়ে। যা আমার আপনার জীবনের চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান। যদি তুর্কি আক্রমণে ওই বিদ্যাভাণ্ডার কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, ওই তিনটি রত্নভাণ্ডারে নিরাপত্তা বিধান কীভাবে করা যাবে?'

প্রধান গ্রন্থাগারিক কৌশিকী একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'এই বিপুল পরিমাণ গ্রন্থ এত দ্রুত কোথাও স্থানান্তর করা সম্ভব নয়। তবে আপনার নির্দেশমতো অতি প্রাচীন, অতি মূল্যবান আকর গ্রন্থগুলোর তালিকা প্রস্তুত করেছি আমি। কাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই একশত অনুকারক শ্রমণ তাঁদের কাজ শুরু করবেন। দিবা-রাত্রি কাজ চলবে। কয়েক দিনের মধ্যে ওই সব মূল্যবান পুঁথির অনুলিপি প্রস্তুত করে গো-শকটে পুঁথিগুলোকে অন্যত্র পাঠাতে হবে। বিপর্যয় যদি সত্যিই নেমে আসে তবে ওই পুঁথিগুলো অন্তত রক্ষিত হবে। ওর মাধ্যমেই ভবিষ্যতে মানুষ জ্ঞানের আলো দেখবে, ভগবানের বাণী সম্পর্কে অবগত হবে। এই স্বল্প সময়ে এ ছাড়া বিকল্প কোনও রাস্তা খোলা নেই আমাদের কাছে।'

রাহুল এবার বললেন, 'আচ্ছা, মহাসামন্ত আনন্দপাল বা লক্ষণসেন

BanglaBook.org

আমাদের রক্ষা করতে পারেন না? তাঁরা পরস্পর বিবাদমান হলেও আমাদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত এক তৃতীয়াংশ পুঁথি তো হিন্দুশাস্ত্র সম্পর্কিত। বহু হিন্দু ছাত্র-গবেষকও তো নালন্দায় পাঠ নিতে আসে।'

মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রী বিষণ্ণ হেসে বললেন, 'আমি মহাসামন্ত আনন্দপালের দূতকে সে প্রশ্ন করেছিলাম। সে জানিয়েছে আমাদের এই মহাদিব্যানিকেতন রক্ষা করার সামর্থ্য আনন্দপালের নেই। লক্ষণসেনের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে তিনি সর্বসান্ত। তাঁর সৈন্যবাহিনীর সামান্যই আর অবশিষ্ট আছে। ভবিষ্যতে নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে তিনি আর তাঁর লোকক্ষয় করতে চান না। তিনি নিজেই তুর্কি বাহিনীর আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পেতে পুরীর রাজার আশ্রয় লাভ করতে যাচ্ছেন। তিনি আমাদের শুভাকাঙক্ষী বলে দূত মারফত তুর্কিদের আগমন বার্তা জানিয়ে আমাদের সতর্ক করলেন। আর লক্ষণাবতী অনেক দূরের কথা। সেখানে কাউকে পাঠিয়ে রাজা লক্ষণসেনের সাহায্য প্রার্থনা করে সেনাবাহিনী আনতে আনতে তার আগেই তুর্কিরা এখানে এসে পড়বে।'

মহাধ্যক্ষ এরপর বললেন, 'পুরো ব্যাপারটা নিয়ে ভাবুন আপনারা। আজ সন্ধ্যায় মন্ত্রণা সভায় আপনারা মতামত দেবেন। আর মহাগ্রন্থাগারিক, আপনি গ্রন্থাগারে ফেরার আগে এখন একবার রসায়নবিভাগের প্রধান সুত্রান্তিকের সঙ্গে সাক্ষাত করে যাবেন। তিনি আপনার দর্শন প্রার্থনা করেছেন।' কথা শেষ করলেন মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রীভদ্র।

তাঁর কথায় সম্মতি প্রকাশ করে কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন মহাগ্রন্থাগারিক কৌশিকী।

রাহুলশ্রীভদ্রও তাঁর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর বললেন, 'ওই বালকের ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত কী?'

মহাধ্যক্ষ একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'আপনি তো জানেনই আমাদের সবাইকে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হয়। এ কথা ঠিকই

BanglaBook.org

ওই বালক নালন্দায় শিক্ষাগ্রহণের পক্ষে উপযুক্ত। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষা হয়ে গেছে। এই হেতু কয়েকদিন আগে দুজন চৈনিক ছাত্রকেও ফিরিয়ে দিয়েছি আমি। আর এ নিয়ে মণ্ডলে আলোচনা করার মতো পরিস্থিতিও এখন নেই। অবস্থাটা আপনি নিজেই অনুধাবন করতে পারছেন। তবুও আপনার ইচ্ছা থাকলে আপনার অতিথি হিসাবে এখানে আপনার কক্ষে থাকার অনুমতি দিতে পারি। দুর্যোগ যদি কেটে যায় তবে ওর সম্বন্ধে মণ্ডলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করতে পারি। দেখুন আপনি কী করবেন।'

বাইরে বেরিয়ে এলেন রাহুলশ্রীভদ্র। দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল কঙ্ক। রাহুল একবার ভাবলেন যে ছেলেটাকে বলে দেন, এই মুহূর্তে তাঁর আর কিছু করার নেই। কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি আর সে কথা বলতে পারলেন না। কঙ্ক চেয়ে আছে তাঁর দিকে। একটা অসহায়তা, বিপন্নতা স্পষ্ট জেগে আছে তার বড় বড় চোখ দুটোতে। বেশ ভয়ে ভয়ে কঙ্ক এরপর জানতে চাইল, 'মহাধ্যক্ষ কী বললেন? তিনি কি আমাকে নালন্দায় পাঠ গ্রহণের অনুমতি দিলেন?'

রাহুলশ্রীভদ্র বললেন, 'তোমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া তাঁর পক্ষে এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। তুমি আমার অতিথি হিসাবে আমার সঙ্গে ক'দিন থাকো। তারপর দেখি কী হয়? এবার চলো আমার কক্ষে।'

তাঁর কথা শুনে একটু বিমর্ষভাবে কঙ্ক বলল, 'ও তিনি এখন অনুমতি দিলেন না। ঠিক আছে তবে এখন আপনার সঙ্গেই থাকি। তবে তিনি নিশ্চয়ই ক'দিনের মধ্যেই আমাকে ভরতি করে নেবেন, তাই না?'

রাহুল তার কথার কোনও জবাব দিলেন না। যা পরিস্থিতি তাতে এই বিদ্যাশ্রমের জন্য কী অপেক্ষা করছে কে জানে! রাহুল তাকালেন রত্নদধির দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে কঙ্ক বলে উঠল, 'যে প্রশ্নর জবাব দিতে পারলাম না তা আপনি জানেন? কত কক্ষে কাগজ পোড়ে?'

চমকে উঠলেন রাহুল। তারপর জবাব দিলেন, 'আমার জানা ছিল

BanglaBook.org

না। মহাধ্যক্ষ জানালেন, ৬৬ কক্ষ তাপমাত্রায় কাগজ গোড়ে।'

'৬৬ কক্ষ...৬৬ কক্ষ।' কথাগুলো মৃদুস্বরে বলতে বলতে রাহুশ্রীভদ্রকে অনুসরণ করল কঙ্ক।

অধ্যাপক আবাসনের দ্বিতলে তাকে নিয়ে নিজের কক্ষে প্রবেশ করলেন রাহুলশ্রীভদ্র। ঘরে পা রেখেই কঙ্ক চারপাশে চোখ রেখে বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'এত পুঁথি! আপনি এসব আমাকে পাঠ করতে দেবেন?'

তিনি হেসে জবাব দিলেন, 'মর্ম অনুধাবন করতে পারলে পাঠ কোরো।'

তাঁর কথায় হাসি ফুটে উঠল কঙ্কর ঠোঁটের কোণে।

একটা কাঠায় এরপর দুজন মিলে আহার সারলেন। রাহুল তারপর একটা পুঁথি নিয়ে বসলেন। আর কঙ্ক অসীম আগ্রহে দেখতে শুরু করল পুঁথিগুলো। রাহুল পুঁথি পাঠ করতে করতে খেয়াল করলেন, কঙ্ক অতি যত্ন সহকারে এক-একটা পুঁথির আবরণী খুলছে। তারপর আবার সেটাকে বেঁধেছেঁদে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখছে।

দুপুর গড়িয়ে এক সময় বিকাল হল। গবাক্ষ দিয়ে তাকিয়ে কঙ্ক দেখতে পেল সূর্যের তেজ স্তিমিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার বয়সি ছোট ছোট ছেলেরা কক্ষর বাইরে চত্বরে এসে উপস্থিত হয়েছে। তারা দল বেঁধে ছোটাছুটি করছে, কাষ্ঠ গোলক নিয়ে খেলছে। দেখে ভারী ভালো লাগল কঙ্কর। তবে একটা মৃদু বিষণ্ণতাও তাকে ছুঁয়ে গেল। সে কোনওদিন খেলার সঙ্গী পায়নি। আর এরপরই তার মনে হল, এতদিন পায়নি তো কী হয়েছে? এবার নিশ্চয়ই পাবে। মহাধ্যক্ষ নিশ্চয়ই তাকে ক'দিন পরই নালন্দায় ছাত্র হিসাবে গ্রহণ করবেন। হয়তো তিনি তার স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদি এই মহাবিদ্যালয়ের পক্ষে উপযোগী কি না তা রাহুলশ্রীভদ্রর মাধ্যমে দেখে নিতে চাইছেন। তাই এই বিলম্ব। কঙ্ক লক্ষ করতে লাগল সেই ক্রীড়ারত ছাত্রদের।

পাহাড়ের আড়ালে সূর্য ডোবার সময় হল। খেলা শেষ করে

BanglaBook.org

ছাত্ররা নিজ নিজ বাসস্থানের দিকে এগোল। একটু পরই তাদের প্রার্থনা কক্ষে সমবেত হতে হবে রোজকার মতো। কিছুক্ষণের মধ্যে রাহুলশ্রীভদ্রও পুঁথি ছেড়ে উঠে পড়লেন। তাঁকেও যেতে হবে প্রার্থনা কক্ষে। তিনি কঙ্কর উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমি এখন প্রার্থনা কক্ষে যাব। তারপর মণ্ডলের সভাতে উপস্থিত থাকতে হবে। আমার ফিরতে বিলম্ব হবে। তুমি এখানেই থেকো।'

কঙ্ক তার কথা শুনে বলল, 'আমি আপনার সঙ্গে প্রার্থনা কক্ষে যাব।'

রাহুলশ্রীভদ্র একটু চুপ করে থেকে জবাব দিলেন, 'প্রার্থনা কক্ষে প্রবেশ অধিকার কেবলমাত্র এই বিদ্যাশ্রমের ছাত্র অধ্যাপক-শ্রমণদের। তুমি আমার অতিথি, এই বিদ্যালয়ের এখনও কেউ নও। ওখানে তোমার প্রবেশ অধিকার নেই।'

কঙ্ক শুনে বলল, 'তবে আপনি আমাকে একটা ছোট বুদ্ধমূর্তি এনে দিন, যতদিন প্রার্থনা কক্ষে না যেতে পারি ততদিন এ কক্ষে বসেই উপাসনা করব।'

প্রস্তুতি ঘণ্টা বাজল; রাহুলশ্রীভদ্র বেরিয়ে গেলেন সান্ধ্য উপাসনায় যোগদানের জন্য। একলা কক্ষে বসে কঙ্ক দেখতে লাগল সার বেঁধে ছাত্র-শ্রমণের দল এগিয়ে চলেছে প্রার্থনা কক্ষের দিকে।

বিশাল চত্বরে ছড়িয়ে থাকা স্তূপ, বুদ্ধমূর্তির সামনে দীপ জ্বলে উঠতে শুরু করেছে। আলোকমেলায় সেজে উঠেছে চত্বরটা। প্রার্থনা কক্ষে সন্ধ্যারতি শুরু হল। সেখান থেকে ভেসে আসতে লাগল ঘণ্টাধ্বনি। সম্মিলিত কণ্ঠের—'বুদ্ধং শরনম গচ্ছামী...।' ভেসে আসতে থাকল ধূপের মিষ্টি গন্ধ। কঙ্ক ব্যথিতভাবে চেয়ে রইল সেই প্রার্থনা কক্ষর দিকে। সেখানে যে তার প্রবেশ অধিকার জন্মায়নি।

প্রার্থনা সভার পর মন্ত্রনা সভায় যোগ দিলেন রাহুলশ্রীভদ্র। শ্রমণ, অধ্যাপকরা মিলে দীর্ঘ আলোচনার শেষে ছাত্রদের নিরাপত্তার কথা ভেবে মহাধ্যক্ষর সিদ্ধান্তেই সম্মত হলেন। সিদ্ধান্ত হল ছাত্র-

BanglaBook.org

অধ্যাপকরা সাময়িকভাবে অন্য শিক্ষাকেন্দ্রে চলে যাবেন। শুধু ভিক্ষু-শ্রমণরা কিছুতেই মঠ ছাড়তে রাজি হলেন না। তবে ঠিক হল মঠ পরিত্যাগের আসল কারণ ছাত্রদের জানানো হবে না। তাতে আতঙ্ক ছড়াতে পারে। কর্মপদ্ধতি ব্যাহত হতে পারে। সভা শেষ করে বেশ রাতে কক্ষে ফিরলেন রাহুলশ্রীভদ্র। গবাক্ষের পাশেই কঙ্ক তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। সারা কক্ষ অন্ধকার। শুধু এক ফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে কঙ্কর মুখে। কী সুন্দর তার মুখমণ্ডল। রাহুল বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন সে দিকে।

পাঁচ

BanglaBook.org

শোন আর গঙ্গার সঙ্গমে গভীর জঙ্গল। দিনমানে এ জঙ্গলের কোনও কোনও স্থানে সূর্যালোক প্রবেশ করে না। রাতে প্রবেশ করে না চন্দ্রাতপ। এখানেই প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত অতি প্রাচীন এক মঠে একাকী বসবাস করেন নালন্দা থেকে বিতাড়িত বৌদ্ধ তান্ত্রিক তক্ষকশ্রী। চারপাশে কোনও জনমানব নেই। প্রতিবেশী বলতে শুধু কিছু শৃগাল আর সর্প। অন্ধকার নামলে যারা জ্বলজ্বল চোখ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যা নামলে এখানে নালন্দার মতো প্রাঙ্গণে দীপমালা প্রজ্জ্বলিত হয় না। প্রার্থনা কক্ষের ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায় না। তবে মাঝে মাঝে রাতের অন্ধকারে নরকরোটি-শোভিত বেদিতে হোম অগ্নি জ্বলে। তা অন্ধকারকে দূর করে না, বরং যেন চারপাশের অন্ধকারের ভয়াবহতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। আর সেই ভৌতিক অগ্নির সম্মুখে বসে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা লাভের আশায় মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেন কৃষ্ণবর্ণের পোশাক পরিহিত মুণ্ডিত মস্তক দীর্ঘদেহী এক তন্ত্রসাধক। তার বাম হাতে থাকে তীক্ষ্ণ কাষ্ঠ কীলক, ডান হাতে ধরা থাকে একটা জানু অস্থি। সারা মঠ চত্বরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকে তন্ত্র সাধনায়

ব্যবহৃত নানা প্রাণীর গলিত শব-অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, হাড়গোড়, নর করোটি। আর সে সবের সন্ধানেই মাঝে মাঝে হানা দেয় শ্বাপদের দল। নানা ধরনের হিংস্র প্রাণী, বাঘ, নেকড়ে, হায়না আছে এ অরণ্যে। তবে তাদের অপেক্ষা হিংস্র, ধূর্ত কেউ বর্তমানে ঘাঁটি গেড়েছে এ জঙ্গলে।

সারাদিন মঠেই ছিলেন তক্ষকশ্রী। সূর্য ডোবার কিছু আগে এক প্রকার বাধ্য হয়েই মঠ ছেড়ে বেরোলেন তিনি। প্রায় দুদিন ধরে তিনি অভুক্ত। জঙ্গলের মধ্যে মাঝে মাঝে শ্বাপদের অর্ধভূক্ত হরিণ, শুকর ইত্যাদির মৃতদেহ পাওয়া যায়। তেমন কোনও দেহাবশেষ পাওয়া গেলে মঠে নিয়ে এসে আগুনে ঝলসে উদরপূর্তি করতে পারেন সে আশাতেই বেরোলেন তিনি।

বনের মধ্যে খাদ্যান্বেষণে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তিনি। না, কোথাও কোনও খাদ্যর চিহ্ন নেই। হয়তো আর একটু দূরত্ব অতিক্রম করলে, কিছু মিলতে পারে এই ভেবে তিনি ক্রমশ অরণ্যের গভীর থেকে গভীরতর অংশে প্রবেশ করতে লাগলেন। ক্ষুধা ক্রমশ আরও বাড়তে লাগল। অরণ্যে অন্ধকার নেমে আসছে। চলতে চলতে হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন একটা গাছের গুঁড়ির পাদদেশের কোটর থেকে বেড়িয়ে আছে একটা বালু সর্পর লেজ। এ সর্প নির্বিষ, খিদের জালায় অনোন্যপায় হয়ে তিনি কর্তব্য স্থির করে নিলেন। লেজ ধরে সাপটাকে বার করে এনে বৃক্ষ শাখাতেই এক আছাড়ে তার ভবলীলা সাঙ্গ করলেন।

তক্ষকশ্রী এরপর কাঠকুটো জড়ো করে চকমকি পাথর ঠুকে আগুন জ্বেলে সে আগুনে সাপটাকে পোড়াতে শুরু করলেন, বাইরের পৃথিবীতে সূর্য ডুবে গেল, অন্ধকার নামল। কিন্তু সময়ের মধ্যেই তক্ষকশ্রীর রন্ধন কার্য সমাপ্ত হল। ঝলসানো সাপটা থেকে এক খণ্ড মাংস ছিঁড়ে মুখে দিতেই বমনের উপক্রম হল তাঁর। কী বিস্বাদ, আর দুর্গন্ধ। মুখ থেকে সঙ্গে সঙ্গে সর্প মাংস ফেলে দিলেন তিনি। নিজের

BanglaBook.org

দুর্দশায় চোখে জল এসে গেল। একবার তিনি ভাবলেন সেই মুহূর্তেই গায়ে অগ্নি সংযোগ করে আত্মহত্যা করবেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে হল, না আমাকে প্রতিশোধ নিতে হবে। ওই নালন্দার মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রী, তাঁর অধীনের শ্রমণ, ভিক্ষুরা—যারা আমাকে বিতাড়িত করল নালন্দা থেকে, তাদের কাউকে আমি রেহাই দেব না।

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল তক্ষকশ্রীর। চোখ দিয়ে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার ছিটকে বেরোতে লাগল। রাগে, দুঃখে, অপমানে অগ্নিকুণ্ডর সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কাঁপতে লাগলেন। ঠিক এই সময় জঙ্গলের গভীর থেকে একটা শব্দ তাঁর কানে ভেসে এল। হ্রেষারব! উপূর্যপরি বেশ কয়েকবার। তা হলে কি পথিকদল জঙ্গলে আস্তানা গেড়েছে? এ জঙ্গল তো বন্য অশ্ব নেই! মানুষ থাকলে নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে খাদ্যও আছে।

আবার শোনা গেল সেই হ্রেষাধ্বনি। তক্ষকশ্রী সেই শব্দ শুনে অনুমান করে নিলেন যে সে জায়গা খুব কাছে না হলেও খুব দূরেও নয়। সেই শব্দর উৎসস্থলের দিকে এগোলেন তক্ষকশ্রী।

জঙ্গলের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে একটা তাঁবু পড়েছে। কয়েকটা মশাল জ্বলছে। তাঁবুর প্রবেশ মুখে তুর্কি তরবারি হাতে দণ্ডায়মান একজন হাবসী রক্ষী। আর তাঁবুর কিছুটা তফাতে একটা অগ্নিকুণ্ডে ঝলসানো হচ্ছে ছাল ছাড়ানো একটা আস্ত হরিণের দেহ। তাকে ঘিরে বসে আছে বেশ কিছু লোক। মাথায় পাগড়ি, শুশ্রুমণ্ডিত রুক্ষ চেহারা। পরনে সালওয়ার। তার জেল্লা ধুলোয় ঢাকা পড়ে গেছে। প্রত্যেকের পাশে ঘাসে শোয়ানো আছে বাঁকানো তুর্কি তলোয়ার, বর্তুলাকার তামার ঢাল। আশপাশের গাছের গুড়িতে অনেকগুলো ঘোড়া বাঁধা। অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে তারা মাঝে মাঝে পা ছুঁড়ছে, চামড়ের মতো লেজ ঝাপটাচ্ছে, হ্রেষাধ্বনি করছে। কিছুতেই তারা এক জায়গাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে চায় না। কোথায় এই নদী-জঙ্গলের দেশ, আর কোথায় সেই রুক্ষ পাহাড় আর

BanglaBook.org

মরুময় মুলুক গজনী! যে লোকগুলো অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে আছে তাদের এই ঘোটকবাহিনীই পাহাড়-পর্বত-মরুভূমি পার করে এ দেশে পৌঁছে দিয়েছে।

আর এগোতে এগোতে তাদের লোহার নাল বাঁধানো খুরের নীচে নারী-শিশু নির্বিশেষে কত মানুষ যে পিষ্ট হয়েছে, তুর্কি তলোয়ারে কর্তিত কত নরমুণ্ড যে পথে ছিটকে পড়েছে তার হিসাব নেই। যেখানে যেখানে পৌঁছেছে এই ঘোড়াগুলো, সেখানে আকাশ লাল হয়ে গেছে আগুনের লেলিহান শিখায়, মাটি লাল হয়ে গেছে রক্তে। মাত্র আঠারোটা তুর্কি ঘোড়া, আঠারো জন অশ্বারোহী, এরা পিছু পিছু বয়ে আনচ্ছে রক্তনদী। হিন্দু-বৌদ্ধ, ভিক্ষুক, শ্রমণ, নারী, শিশু, সবার রক্ত মিশে যাচ্ছে সেই রক্ত নদীতে। এ দেশে তুর্কি ঘোড়ার খুব কদর। তাই ঘোড়া ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে এ দেশে প্রথমে প্রবেশ করেছিল ওই লোকগুলো। তাই প্রথমে কেউ তাদের সন্দেহ করেনি। যখন তাদের চিনতে পেরেছে তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। রক্তের হোলি খেলা শুরু হয়ে গেছে তাদের যাত্রাপথে।

তাঁবুর ভিতরে একটা মশাল জ্বলছে। সেখানে গালিচার ওপর বসে ছিলেন এক স্থূলকায় প্রৌঢ় ব্যক্তি। মাথায় রেশমের পাগড়ি। স্ফীত মুখমণ্ডলে মেহেদীর রঙে রাঙানো দাড়ি। পরনের সালোয়ারে সোনার সুতোর কাজ করা থাকলেও সে পোশাকের সর্বত্র কালো কালো দাগ। হিন্দুর রক্ত, বৌদ্ধর রক্ত। ও দাগ কখনও উঠবে না। লোকটার পাশে শোয়ানো আছে একটা কোষবদ্ধ বাঁকা তরোবারি। এই মুহূর্তে সেটা শান্ত হলেও মৃত্যুর মতো হীমশীতল অনুভূতি হয় ওই তুর্কি তরোবারিটা দেখলে। ওর আঘাতে শূন্যে উড়ে যায় বৌদ্ধ-শ্রমণের মুণ্ড, ওরই সূচাগ্র প্রান্ত দিয়ে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয় শিশুরা। তরোবারির চামড়ার কোষটাও শুকনো রক্তের দাগে কালো হয়ে গেছে, তবে ওর স্বর্ণখোচিত হাতলটা দেখলে বোঝা যায় ওই অস্ত্রের মালিক কোনও সাধারণ ব্যক্তি নন। হ্যাঁ, তিনি গজনীর সুলতান

BanglaBook.org

'মইজুদ্দিন মুহম্মদ বিন-সামে' ওরফে 'মুহম্মদ ঘুরী'র বিশস্ত সেনাপতি বক্তিয়ার খিলজি। তিনি সেই মহম্মদ ঘুরীর সেনাপতি, যিনি তরাইনের যুদ্ধে দিল্লি ও আজমেরের রাজা পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ও বন্দি করেছিলেন। তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে রাজার দু-চোখ অন্ধ করে তাঁকে বেঁধে নিয়ে গেছিলেন গজনী মুলুকে।

বিন-সামের অসমাপ্ত কার্য সম্পাদনের ভার আজ তাঁর প্রবীণ চার অনুচরের ওপর ন্যস্ত। গজনীর দায়িত্বে তাজউদ্দিন, নাসিরউদ্দিন কুবাচা মুলতানের দায়িত্বে, আর দিল্লির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কুতুবুদ্দিনকে। ওই তিন জায়গাতেই অবশ্য আজ বিন-সামের অনুচরদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অধরা শুধু বাঙ্গালা দেশ। আর সে দেশ অধিকারের দায়িত্ব নিয়েই বিন-সামের অন্যতম প্রধান সেনাপতি বক্তিয়ার এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। বাঙ্গালাতে ইতিপূর্বে দু-একবার অভিযান চালিয়েছে বক্তিয়ারের উত্তরসূরীরা। তবে সে সব অভিযান ছিল নিছকই লুঠপাটের জন্য। রাজ্য দখলের জন্য নয়।

সাধারণত রাজমহল পাহাড়ের উত্তরপথ ধরেই বেঙ্গালাতে প্রবেশ করতে হয়। কিন্তু বুদ্ধিমান রাজা লক্ষ্মণ সেন সে পথে সৈন্যবাহিনী মোতায়ন করে রেখেছেন। তুর্কি ঘোড়াগুলো যতই গতিসম্পন্ন হোক, তুর্কি তরবারি যতই ক্ষুরধার হোক না কেন মাত্র আঠারো জন ঘোড়সওয়ার যে রাজা লক্ষণের বাহিনীর মোকাবিলা করতে পারবে না বহু যুদ্ধের সেনাপতি বক্তিয়ার ভালোভাবেই জানেন। তাই তিনি একটা পরিকল্পনা করেছেন। আরও কিছু তুর্কি অশ্বারোহী কিছুদিনের মধ্যেই এসে পড়ার কথা। তারা এসে পৌঁছোলে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তুর্কি বাহিনী ঘুরপথে প্রবেশ করবে বেঙ্গালাতে। ভাগীরথীর তীরে নদীয়া হয়ে বক্তিয়ার এগোবেন লক্ষণাবতীর দিকে। মাঝের সময়টা তিনি এ অঞ্চলেই কাটাবেন। তিনি শুনেছেন এ মুলুকে নাকি বেশ ক'টা বড় বড় বৌদ্ধ-বিহার আছে। আর তাতে নিশ্চয়ই সম্পদও আছে। কাফেররা তাদের সোনা দান করে মন্দির আর

BanglaBook.org

বিহারে। যতবড় বিহার বা মন্দির তত সোনা।

বক্তিয়ার যে অভিযানে অগ্রসর হচ্ছেন তার ব্যয়ভার বহনের জন্য অনেক সম্পদের প্রয়োজন। এ অঞ্চলের ওই সব বৌদ্ধ বিহারগুলোতে হানা দিতে পারলে সম্পদের সংস্থান হবে। এ অঞ্চলে দুটো বৌদ্ধ বিহারের নামও শুনেছেন বক্তিয়ার। নালন্দা আর ওদন্তপুরী। কিন্তু এই নদী, জঙ্গল, পাহাড়ের দেশে ওদের সঠিক অবস্থান এই তুর্কি সেনাপতির জানা নেই। পথে বেশ ক'টা ছোটখাটো বৌদ্ধবিহার ধ্বংস করেছেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও বজ্জাত শ্রমণগুলো মুখ থেকে নালন্দা-ওদন্তপুরীর পথ নির্দেশ বার করতে পারেননি।

তাঁবুতে একাকী বসে নিজের কর্মপন্থা সম্বন্ধে ভাবছিলেন তুর্কি সেনাপতি বক্তিয়ার। হঠাৎ বাইরে মৃদু শোরগোল শোনা গেল। বক্তিয়ার স্থূলকায় হলেও চিতাবাঘের মতো ক্ষিপ্র ও সতর্ক। মুহূর্তের মধ্যে কোষমুক্ত তুর্কি তলোয়ার ঝিলিক দিয়ে উঠল মশালের আলোতে। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁবুর বাইরে এগোতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই তাঁর দুজন অনুচর একটা অদ্ভুত লোককে নিয়ে তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করল। পাঁজরে তলোয়ারের খোঁচা দিয়ে লোকটাকে সেনাপতির সামনে দাঁড় করাল তারা। লোকটা বৌদ্ধদের মতো মুণ্ডিত হলেও তার পরনের পোশাক শুভ্র, পীত বা রক্তিমবর্ণের নয়। যা বক্তিয়ার এ যাবৎকাল দেখে এসেছেন। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার এই যে লোকটার কোমর বন্ধনীতে ঝুলছে একটা লম্বা হাড়। এবং অবশ্যই সেটা মানুষের হাড়। কে এই লোকটা? হিন্দু না বৌদ্ধ? নাকি অন্য কোনও জাতির লোক? কোথা থেকে এল এখানে?

সন্দিহান বক্তিয়ার তাকালেন তাঁর অনুচরদের দিকে।

তাদের একজন বলল, 'মালিক, এ লোকটা হঠাৎই এসে উপস্থিত হয়েছে এখানে। ও কী বলছে কিছুই বুঝতে পারছি না। তাই কাফেরটাকে হুজুরের সামনে হাজির করলাম। গুস্তাকি মাফ করবেন।'

এখানে এই এক সমস্যা। এখানকার হিন্দু আর বৌদ্ধরা যে ভাষায়

BanglaBook.org

কথা বলে তা প্রায়সই বোধগম্য হয় না তুর্কি সেনাপতি বক্তিয়ার আর তাঁর অনুচরদের। তবে বক্তিয়ার সামান্য কিছু হিন্দুস্থানী শব্দ বলতে ও বুঝতে পারেন তা দিয়েই তাঁকে কাজ চালাতে হয়। বক্তিয়ার তাকালেন সেই অদ্ভুত লোকটার চোখের দিকে। লোকটাও তাকিয়ে তাঁর দিকে। তলোয়ারের ডগাটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে রুষ্ট স্বরে বক্তিয়ার তুর্কি আর কিছুটা হিন্দুস্তানি ভাষা মিশিয়ে লোকটাকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কে? কোথা থেকে আসছ? কোন জাতের লোক?'

লোকটা তার ভাষা বুঝতে না পারলেও সম্ভবত অনুমানের ভিত্তিতে জবাব দিল, 'আমার নাম তক্ষকশ্রী। আমিও এই অরণ্যে থাকি। আমি ক্ষুধার্ত। খাদ্য অন্বেষণ এখানে এসেছি।'

এই অদ্ভুত আগন্তুক বক্তিয়ারের কথা ঠিকভাবে বুঝতে না পারলেও বক্তিয়ার কিন্তু আংশিক বুঝতে পারলেন তার কথা। এ লোকটার ভাষা সম্ভবত বেঙ্গালা। কাফের পৃথ্বীরাজকে যখন গজনী নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখন আর একটা কাফেরও গজনী গেছিল। সে লোকটা আবার শায়েরও ছিল। তার নাম চাঁদবর। বক্তিয়ার তার কাছে কিছু হিন্দি আর বেঙ্গালা শব্দ জেনেছিলেন। বিন-সামের বহুদিনের পরিকল্পনা ছিল বক্তিয়ারকে পাঠাবেন বেঙ্গালা-দোয়াব অঞ্চলে। চাঁদবর নামের ধুর্ত কাফেরটাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বক্তিয়ারকে হিন্দি আর বেঙ্গালা ভাষা শেখাবার জন্য। তুর্কি সেনাপতি বক্তিয়ার স্মৃতি হাতড়ে যথাসম্ভব চেষ্টা করে তুর্কি-হিন্দি আর বেঙ্গালা মিশিয়ে তাকে আবার প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কোন জাতি? এই বনে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?'

তক্ষকশ্রী অনুমানের ওপর ভিত্তি করে প্রত্যুত্তর দিলেন, 'আমি বৌদ্ধ তান্ত্রিক।'

'তান্ত্রিক' শব্দের অর্থ না বুঝলেও তুর্কি পুরুষ 'বৌদ্ধ' শব্দটা শুনেই ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে যে হাতে তরবারি ধরা আছে সে

BanglaBook.org

হাতটা কিছুটা পেছনে টেনে নিলেন এই ঘৃণ্য বিধর্মীর বুকে অস্ত্রটা আমুল বিদ্ধ করার জন্য। কিন্তু তিনি সে কাজ করার আগেই এমন একটা শব্দ কানে গেল যে থেমে গেলেন তিনি। তক্ষকশ্রী বললেন, 'আমি নালন্দা থেকে বিতারিত, তাই এ অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছি।'

নালন্দা!—এ শব্দটাই থামিয়ে দিল তাঁকে। তিনি স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন এই অদ্ভুত লোকটা মুখের দিকে।

এ লোকটা কি নালন্দার সন্ধান দিতে পারে তাঁকে? বক্তিয়ার জানতে চাইলেন, 'তুমি নালন্দা কোথায় জানো? সেখানে ধনরত্ন কিছু আছে?'

তাঁর প্রশ্নটা ধরতে পেরে তান্ত্রিক জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ চিনি। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নটা তিনি ঠিক অনুধাবন করতে না পারলেও 'রত্ন' শব্দটা বুঝতে পেরে নালন্দার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তিনটি শব্দ তাঁর মাথায় এল। রত্নদধি, রত্নসাগর, রত্নরঞ্জক—এই শব্দ তিনটি অনেকটা স্বগোতক্তির স্বরেই উচ্চারণ করলেন তক্ষকশ্রী।

'রত্নসাগর' শব্দের অর্থ বুঝতে পারলেন বক্তিয়ার। তবে একটু অন্যভাবে। রত্নের সমুদ্র! তার মানে এত ধনরত্ন রাখা আছে সেখানে যে তাকে সাগর বলা হচ্ছে। মশালের আলোতে ঝিলিক দিয়ে উঠল বক্তিয়ারের চোখ। তিনি বলে উঠলেন, 'তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পারবে সেই রত্নসাগরে? তাহলে আমি তোমাকে মুক্তি দেব।'

এই স্থূলকায় তুর্কির বক্তব্য অনুধাবন করে কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে গেলেন তক্ষকশ্রী। এই যবন সেখানে প্রবেশ করলে কী কী হতে পারে তা অনুমান করলেন তিনি। কিন্তু তার পরই তক্ষকশ্রীর মনে পড়ে গেল মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রীসহ আরও কিছু বৌদ্ধ শ্রমণদের কথা। তাঁদের জন্যই তো তাঁর এই দুরবস্থা। এখন ঠিক এ সময় নিশ্চয়ই তাঁরা পঞ্চব্যঞ্জন, পরমান্ন আহার করে সুখনিদ্রা যাচ্ছে, আর ক্ষুধার জ্বালায় ছুটে বেড়িয়ে তাঁকে এসে দাঁড়াতে হয়েছে যবনদের তরবারির সামনে! তুর্কি তরবারির আঘাতে এই মুহূর্তে, অথবা ক্ষুধার

BanglaBook.org

জ্বালায় আর কিছুদিনের মধ্যেই মৃত্যু ঘটতে পারে তাঁর। আর এর পরই একটা ব্যাপার বৌদ্ধ তন্ত্রিকের মাথায় এল, 'এই যবনদের দল নিশ্চয়ই নালন্দায় থাকবে না। সোনাদানা দামি জিনিস যা আছে তা লুঠপাট করে চলে যাবে। তা যাক, সে সবে তক্ষকশ্রীর নিজেরও বিশেষ মোহ নেই। তিনি যদি যবনদের নালন্দায় নিয়ে যান, আর তার বিনিময়ে যদি লুঠপাঠ করে চলে যাবার আগে তারা তাঁকে নালন্দার মহাধ্যক্ষের আসনে বসিয়ে দিয়ে যান, তবে কেমন হবে?'— এ ব্যাপারটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে তক্ষকশ্রী বললেন, 'আমি সেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু কিছু শর্ত আছে।'

শ-র-ত্! শব্দটা শুনে প্রথমে আত্মভিমানে ঘা লাগল তুর্কি সেনাপতি বক্তিয়ারের। তাঁর তরবারির সামনে দাঁড়িয়ে এই যবনটা তাকে শর্তর কথা বলছে? তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'বিধর্মী তোর এত সাহস আমাকে শর্ত শোনাচ্ছিস। জানিস, এখনই আমি তোর মুণ্ডু নিতে পারি?'

তক্ষকশ্রী শান্ত স্বরে জবাব দিলেন, 'তা পারো। তাতে তোমার কোনও লাভ হবে না।'

বক্তিয়ার আবার চিৎকার করে উঠলেন, 'সে জায়গাতে পৌঁছে না দিলে এখনই কোতল করব তোকে।'

ধূর্ত তান্ত্রিক এবারও ভয় না পেয়ে একই কথা বললেন, 'আমাকে কোতল করলে তুমি সে জায়গার সন্ধান পাবে না।'

থমকে গেলেন বক্তিয়ার। সত্যিই তো এ লোকটাকে খতম করলে কোনও লাভ হবে না। তাহলে হয়তো আর সন্ধানই পাওয়া যাবে না নালন্দার। এই পাহাড়-জঙ্গলের দেশে কোথায় কোন সম্পদ লুকিয়ে আছে অচেনা লোকদের পক্ষে তা খুঁজে বার করা মুশকিল। বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করে ধীরে ধীরে তাঁর তরবারি ধরা হাতটা নীচে নেমে এল। তুর্কি সেনাপতি বক্তিয়ার তাঁর কর্কশ কণ্ঠ যথাসম্ভব মোলায়েম করে বললেন, 'ঠিক আছে তোমার শর্তগুলো শুনি?'

BanglaBook.org

বৌদ্ধ তান্ত্রিক তক্ষকশ্রী হিন্দি আর বেঙ্গালা মিশিয়ে বক্তিয়ারের উদ্দেশ্যে বলতে শুরু করলেন, 'প্রথমত তোমরা সেই বিহার থেকে যা ইচ্ছা নিয়ে চলে যাবার সময় আমাকে মহাধ্যক্ষর আসনে বসিয়ে দিয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত ছাত্র হত্যা চলবে না। আমি তাদের লামা তারানাথের আদর্শে দীক্ষিত করব। তৃতীয়ত...।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে চেষ্টা করার পর তক্ষকশ্রী, তুর্কি সেনাপতিকে তাঁর বক্তব্য বোঝাতে সক্ষম হলেন।

সব কথা শোনা-বোঝার পর আবছা হাসি ফুটে উঠল বক্তিয়ারের ঠোঁটের কোনে। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে আমি রাজি। সেখানে পৌঁছোতে কত সময় লাগবে?'

নালন্দার ভূতপূর্ব অধ্যাপক তক্ষকশ্রী বললেন, 'আগামীকাল প্রত্যুষে যদি যাত্রা করি তবে অশ্বপৃষ্ঠে দিন চার-পাঁচেকের মধ্যেই আশা করি নালন্দা পৌঁছে যাওয়া যাবে।'

'কিন্তু সেখানে সত্যিই রত্নসাগর আছে তো?' আবার জানতে চাইলেন বক্তিয়ার।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' জবাব দিলেন তক্ষকশ্রী।

'রত্নসাগর' শব্দটা শোনার পর থেকেই সেখানে যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন বক্তিয়ার। তাঁর উত্তরসূরীরা, সুলতান মাহমুদ থেকে বিন-সাম যে সম্পদ এ দেশ থেকে লুঠ করে নিয়ে গেছিলেন, হয়তো তার থেকে অনেক বেশি সম্পদ আছে ওই রত্নসাগরে। বক্তিয়ার বললেন, 'কাল কেন? আজই তো আমরা নালন্দার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে পারি।'

তক্ষকশ্রী জবাব দিলেন, 'আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত। তার আগে আমার ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করো।'

বহুদিন পর ঝলসানো হরিণের মাংস আর উৎকৃষ্ট সুরা সহযোগে উদরপূর্তি করলেন তক্ষকশ্রী। তার আহারপর্ব যখন সাঙ্গ হল ততক্ষণে তাঁবু গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। নালন্দা অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে তুর্কি

BanglaBook.org

সেনাপতি চেপে বসেছেন বিশালাকৃতি এক ঘোটকীর পৃষ্ঠে। শক্ত হাতে তার লাগাম ধরে আছেন তুর্কি সেনাপতি বক্তিয়ার। তক্ষকশ্রীকেও এরপর চাপিয়ে দেওয়া হল একটা বিরাট ঘোড়ার পিঠে। তার লাগাম ধরে রইল অন্য একজন অশ্বারোহী। বক্তিয়ার নির্দেশ দিলেন যাত্রা শুরু করার। পিঠে চামড়ার চাবুক, আর পাঁজরে তুর্কি পাদুকার খোঁচা লাগার সঙ্গে সঙ্গে একযোগে ডেকে উঠল ঘোড়াগুলো। সে শব্দে ভয় পেয়ে কর্কশ শব্দে আর্তনাদ করে আকাশের দিকে উড়ে গেল রাতচরা পাখির দল। সওয়ারিদের নিয়ে বন-জঙ্গল ভেঙে ছুটতে শুরু করল তুর্কি অশ্বগুলো। কী প্রচণ্ড তাদের গতি! তক্ষকশ্রীর মনে হল তিনি যেন কোনও শয়তানের পিঠে সওয়ার হয়েছেন।

ছয়

নালন্দায় আসার পর কঙ্কর আরও একটা দিন কেটে গেছে। কক্ষ থেকে অবশ্য সে বেরোয়নি। সে দিন রাহুলশ্রীভদ্র তাকে রেখে বেরিয়েছেন তাঁর দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদনে। কঙ্ক সারাদিন একাকী কক্ষে বসে গবাক্ষ দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছে নালন্দার জীবনযাত্রা। সকালবেলা ছাত্ররা দল বেঁধে শ্রেণিকক্ষে পাঠ নিতে যাচ্ছে, দ্বিপ্রহরে ফিরছে। বৈকালে চত্বরে খেলাধূলায় মত্ত হচ্ছে, আবার সন্ধ্যায় প্রার্থনা সভায় যাচ্ছে। কখনও ছাত্রদের পাঠভ্যাসের গুঞ্জনধ্বনিতে, তাদের কলহাস্যে, কখনওবা ঘণ্টাধ্বনি বা প্রার্থনাধ্বনিতে মুখরিত, সদা চঞ্চল এই নালন্দা। এরই মাঝে কঙ্ক খেয়াল করল বেশ কয়েকটি গো-শকট এসে উপস্থিত হল। তাতে চেপে ছাত্রদের বেশ বড় একটা দল কোথায় যেন নিষ্ক্রান্ত হল। এবং তাদের সঙ্গে কিছু শিক্ষকও। মঠের জীবন স্পন্দন প্রত্যক্ষ করা ছাড়াও কঙ্ক এদিন বেশ কিছু সময় সেই কক্ষের পুঁথিগুলো ঘাঁটল। অধিকাংশ পুঁথিই তার অপরিচিত।

BanglaBook.org

কঠিন কঠিন পুঁথি। কঙ্ক মনে মনে ভাবল, একদিন সে নিশ্চয়ই এই সব পুঁথির রসাস্বাদনের উপযুক্ত হবে। এই শিক্ষাবিহারের মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রী নিশ্চয়ই তাকে নালন্দায় একদিন পাঠ গ্রহণের সুযোগ দেবেন।

তৃতীয়দিন কঙ্ক ভোরে উঠে দেখতে পেল প্রচুর গো-শকট সমবেত হয়েছে চত্বরে। সংখ্যায় তারা প্রায় একশতক হবে। এত গো-শকট কেন? কঙ্ক বেশ আশ্চর্য হল তা দেখে। গত দুদিন গভীর রাতে কক্ষে ফিরেছেন রাহুলশ্রীভদ্র। কঙ্কর সঙ্গে সামান্য কিছু বাক্যালাপ ছাড়া বিশেষ কথা বলার সুযোগ হয়নি তাঁর। ছাত্রদের অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়ার কাজে গত দিন ভীষণ ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল রাহুলশ্রীভদ্রকে। এদিন ভোরবেলা কঙ্কর আগেই ঘুম ভেঙে ছিল রাহুলশ্রীভদ্রর। আজ আর তাঁর প্রত্যুষে শ্রেণিকক্ষে যাবার ব্যস্ততা নেই। তিনি যে ছাত্রদের পাঠদান করেন তারা প্রথম দলের সঙ্গে আগের দিন রওনা হয়ে গেছে। বাচ্চা ছেলেটা গত একটা দিন এ কক্ষে প্রায় বন্দিদশা কাটিয়েছে। তাকে তিনি ব্যস্ততার জন্য সঙ্গ দিতে পারেননি। কঙ্কর অবস্থা বিবেচনা করে বেশ মায়া হল তাঁর। তিনি কঙ্ককে বললেন, 'চলো তোমাকে এই মহাবিদ্যালয়ের প্রধান দ্রষ্টব্য দেখিয়ে আনি।'

কঙ্ক বেশ উৎফুল্ল হল তাঁর প্রস্তাবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা দুজন কক্ষ ত্যাগ করে নীচে নেমে এল।

রত্নদধি, রত্নসাগর আর রত্নরঞ্জকের ওপর ভোরের আলো এসে পড়েছে। নতুন আলোর স্পর্শে অন্য দিনের মতোই ঝলমল করছে বহুতল গ্রন্থাগারগুলো। রাহুলশ্রীভদ্র কঙ্ককে নিয়ে এগোলেন সেদিকে।

চত্বরের ঠিক মাঝখানে গো-শকটগুলো দাঁড়িয়ে আছে. সার বেঁধে গো-শকটে উঠছে ছাত্ররা। দীর্ঘ শ্রেণিতে তারা দাঁড়িয়ে আছে গো-শকটে ওঠার জন্য। সংখ্যায় তারা প্রায় এক সহস্র হবে। সে জায়গা অতিক্রম করার সময় কঙ্ক জানতে চাইল, 'ওরা সব কোথায় যাচ্ছে?'

রাহুলশ্রীভদ্র জবাব দিল, 'ওরা সব যাচ্ছে ওদান্তপুরী বিহারে। মাঝে মাঝে শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য নালন্দা থেকে ছাত্র-শিক্ষকরা

BanglaBook.org

ওদন্তপুরী, বিক্রমশীল, সোমপুরী, জগদ্দল, বিক্রমপুরী ইত্যাদি শিক্ষামঠে যায়। আর সেসব মঠ থেকেও ছাত্র-অধ্যাপকরা আসেন নালন্দায়। যাওয়া-আসার পথে বা নতুন মঠে নানা শিক্ষা লাভ করে ছাত্ররা। অধ্যাপকদের মধ্যেও মত বিনিময় হয়, ধর্ম বিষয়ে তর্ক হয়, তাতে জ্ঞান বাড়ে উভয় পক্ষেরই। যেমন বিক্রমশীল মহাবিহার থেকে একসময় আচার্য অতীশ দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান এ মঠে আসতেন। বিক্রমশীল মহাবিহারে ছাত্র-অধ্যাপকরা যেতেন উত্তমরূপে ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে পাঠ লাভের জন্য। নালন্দা আর বিক্রমশীল মহাবিহারের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে সে সময় বৌদ্ধ শ্রমণরা কৌতুক করে একটা কথা বলতেন—'নালন্দার আছে রত্নদধি, রত্নসাগর, রত্নরঞ্জক, আর বিক্রমশীলের আছেন অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।'

ছাত্রদের কাছে অন্য মঠে তাদের স্থানান্তরকরণের করার কারণ হিসাবে যে কথা বলা হয়েছে, আসল কারণ গোপন করে কঙ্ককেও ঠিক একই কথা বললেন রাহুলশ্রীভদ্র। এরপর তিনি কঙ্ককে বললেন, 'আচ্ছা, ভগবান বুদ্ধর দীপঙ্কর মূর্তি কাকে বলে জানো? তুমি সে মূর্তি দেখেছ?'

কঙ্ক জবাব দিল, 'চোখে দেখিনি। তবে সে মূর্তির কথা শুনেছি। দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি। তার বিশেষত্ব হল মূর্তির কেশদাম দেখতে ঠিক জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো। স্বচ্ছ চীবরের প্রান্তভাগ তিনি বাম হাত দিয়ে বাম কাঁধের কাছে ধরে রেখেছেন, আর দক্ষিণ বাহু ওপর দিকে উত্থিত।'

তার কথা শুনে রাহুলশ্রীভদ্র খুশি হয়ে বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ। দীপঙ্কর বুদ্ধমূর্তি সিংহলে বেশি দেখা যায়। একমাত্র দীপঙ্কর বুদ্ধর মস্তকেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিক্ষা দেখা যায়। তবে এই নালন্দায় দীপঙ্কর বুদ্ধমূর্তিও আছে। এই দ্যাখো—'

এই বলে তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন চত্বরের একপাশে

BanglaBook.org

দণ্ডায়মান একটা দীপঙ্কর বুদ্ধমূর্তির দিকে। এর পর যেতে যেতে তিনি বললেন, ভগবানের নানান ধরনের মূর্তি আছে এখানে। নানা ভঙ্গী, নানা রূপ তাঁর। মৈত্রেয় রূপ, বোধিসত্ত্ব রূপ, যক্ষ রূপ, দণ্ডায়মান বুদ্ধ, ধ্যানী বুদ্ধ, ভদ্রাসন বুদ্ধ, অভয় বুদ্ধ, রাজবেশে বুদ্ধ, আরও বহু ধরনের বুদ্ধমূর্তি। আসলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, দেশের বাইরে সুদূর তিব্বত, চিন, চম্পাদেশ, সিংহল থেকে ছাত্ররা অধ্যায়ন করতে আসার সময় তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতিকেও বহন করে আনে। তারা এখানে এসে কেউ পাথর কুঁদে, কেউ বা ধাতু দিয়ে এসব মূর্তি বানিয়েছেন। তবে প্রার্থনা কক্ষে পুজিত হন পদ্মাসনে দাঁড়ানো ভগবানের অভয় মূর্তি। যা সমস্ত শঙ্কা-গ্লানিকে দূর করে। আর ওই যে চত্বরের পশ্চিম প্রান্তে পরপর দুটি ছোট প্রার্থনা কক্ষ দেখতে পাচ্ছ, ওখানে সারাদিন প্রার্থনা করেন শ্রমণরা। ও দুটি কক্ষে আছে ভগবান বুদ্ধর ধ্যানী মূর্তি আর অমিতাভ মূর্তি।

কথা বলতে বলতে তারা পৌঁছে গেলেন গ্রন্থাগারের সোপান শ্রেণির সামনে। অনুচ্চ, কিন্তু দীর্ঘ এক সোপান শ্রেণি ঘিরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা গ্রন্থাগার তিনটি। রাহুলশ্রীভদ্র সোপান শ্রেণিতে পা রাখার আগে পা থেকে কাঠের পাদুকা খুলে ফেললেন। তারপর নীচু হয়ে বসে সোপান শ্রেণিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানালেন। কত জ্ঞানী-পণ্ডিত-ভগবানতুল্য মানুষের পদধূলিতে ধন্য এই সোপান শ্রেণি। শান্তরক্ষিত, শান্তিদেব, শীলভদ্র, জ্ঞানচন্দ্র, জিনমিত্র, স্থিরমতি, চন্দ্রপল থেকে শুরু করে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তাই এই সোপান শ্রেণিতে পা রাখার আগে সেই পণ্ডিত চূড়ামণিদের উদ্দেশ্যে, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা জ্ঞান ভাণ্ডারগুলির উদ্দেশ্যে সোপান শ্রেণিতে মাথা ঠেকিয়ে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন রাহুলশ্রীভদ্র। সোপানে পা রাখার আগে প্রতিবারই তিনি এ কাজ করেন।

কঙ্কর পায়ে পাদুকা ছিল না। রাহুলশ্রীভদ্রকে দেখে সে-ও সোপান

BanglaBook.org

শ্রেণিতে মাথা ঠেকাল। রাহুলশ্রীভদ্র তা দেখে খুশি হয়ে তাকে বললেন, 'তুমি যদি এ বিদ্যানিকেতনে শিক্ষালাভের সুযোগ পাও তবে প্রার্থনা কক্ষের ভগবান বুদ্ধর মূর্তির মতো একই রূপ শ্রদ্ধা করবে এই সোপান শ্রেণির, এই জ্ঞান ভাণ্ডারকে। আমাদের এ দেশের যাবতীয় সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধর্মচর্চা যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত হয়ে আছে এই তিনটি গ্রন্থাগারে। কালের নিয়মে আমি-তুমি সবাই একদিন এ পৃথিবী থেকে অন্তর্হিত হব, কিন্তু, এই জ্ঞান ভাণ্ডার যুগ যুগ ধরে ভগবান বুদ্ধর মতোই ভবিষ্যতের মানুষকে আলোকিত করবে, অন্ধকার মুছে দিয়ে মানুষকে পথ দেখাবে।'

সোপান শ্রেণি অতিক্রম কঙ্ককে নিয়ে দণ্ডায়মান বিশাল বুদ্ধমূর্তির পাশ দিয়ে প্রথমে রত্নসাগরে প্রবেশ করলেন রাহুলশ্রীভদ্র। কয়েকটা কক্ষ অতিক্রম করে কঙ্ককে নিয়ে তিনি প্রবেশ করলেন বিশাল এক কক্ষে। প্রদীপের আলোতে উজ্জ্বল সে ঘর। এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত অসংখ্য প্রদীপ জ্বলছে। আর এক-একটা প্রদীপের পাশে বসে শ্রমণরা হাঁসের পালক বা খাগের কলম দিয়ে কেউ-বা তালপাতায়, কেউ-বা কাগজে লিখে চলেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের সামনে রাখা আছে একটা করে খোলা পুঁথি। এত মানুষ সমবেত, কিন্তু কাগজে কলমের খসখস শব্দের আঁচড় কাটার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। নিবিষ্ট মনে হাঁসের পালক বা খাগের কলমে লিখে চলেছেন তাঁরা। মহাগ্রন্থাগারিক কৌশিকীর নির্দেশে কাজ শুরু করেছেন শ্রমণরা। সারা দিন সারা রাত কাজ চলবে। কেউ লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাঁর জায়গা নেবেন আর একজন শ্রমণ। কাজ থামবে না। রাতে কাজ করার জন্যও আরও আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছাদ থেকে ঝোলানো হয়েছে মোটা মোটা রজ্জু। সন্ধ্যা নামার আগেই লোক এসে ওই ঝুলন্ত দড়িগুলোতে বাতিদান ঝুলিয়ে দিয়ে যাবে। বিস্মিত কঙ্ক জানতে চাইল, 'এত জন শ্রমণ একসঙ্গে পুঁথি লিখছেন?'

রাহুলশ্রীভদ্র ইশারায় তাকে কথা বলতে বারণ করে ফিসফিস করে

BanglaBook.org

বললেন, 'ওরা প্রাচীন পুঁথিগুলোর প্রতিলিপি তৈরি করছেন। যাতে কোনও পুঁথি কোনও কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হলে তার আর একটা প্রতিলিপি থেকে যায়।'

শ্রমণরা তাঁদের কাজে এতটাই মগ্ন যে রাহুলশ্রীভদ্রর আর কঙ্কর উপস্থিতি তাঁরা টেরই পাচ্ছেন না। মুহূর্তের জন্যও পুঁথির পাতা থেকে চোখ সরিয়ে তাঁদের কেউ একবার তাকালও না কঙ্কদের দিকে। পাছে কঙ্কদের উপস্থিতি শ্রমণদের কাজে বিঘ্ন ঘটায় তাই এরপর রাহুলশ্রীভদ্র সেই মহাকক্ষ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। রাহুলশ্রীভদ্র আর রত্নসাগরেও থাকলেন না। সূর্যলোকে বেরিয়ে তিনি এগোলেন রত্নসাগরের পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা রত্নদধির দিকে।

রত্নদধি! নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রধান স্থাপত্য। শুধু আকারের জন্য নয়, গুরুত্বর বিচারেও। এই স্থাপত্যের আনাচে-কানাচে, প্রতি তলে কত জ্ঞান ভাণ্ডার যে আছে তা হিসাব করা যায় না! পুঁথি আর শুধু পুঁথি! শুধু কাগজের পুঁথি নয়, তাম্রশাসন আর প্রস্তরে খোদাই প্রাচীন পুঁথিও আছে এখানে। তাতে ধরা আছে প্রাচীন ভারতের ধর্ম, মহিমা, জ্ঞান, বিজ্ঞানের ইতিহাস।

রত্নদধির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে করতে রাহুলশ্রীভদ্র কঙ্ককে বললেন, 'জানবে এই রত্নদধি পৃথিবীর সমস্ত স্বর্ণ ভাণ্ডারের চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান।'

কঙ্ককে নিয়ে রাহুলশ্রীভদ্র প্রথমে গিয়ে উপস্থিত হলেন বিশাল এক কক্ষে। কঙ্কর সে কক্ষ দেখে মনে হল বাইরের অর্ধেক চত্বরটাই যেন সেখানে তুলে আনা হয়েছে। কাঠের তৈরি মেঝেতে বসে পুঁথির পাতায় নিমগ্ন হয়ে আছেন বিভিন্ন বয়সি বহু মানুষ। চারপাশের দেওয়াল জুড়ে ছাদ পর্যন্ত অসংখ্য লোহার খাঁচায় রাখা আছে শত সহস্র পুঁথি। গ্রন্থাগারের এটি প্রধান পাঠ কক্ষ। গবাক্ষ দিয়ে বাইরের সূর্যালোক প্রবেশ করছে এই মহাকক্ষে। তা ছাড়া প্রদীপের ব্যবস্থাও আছে। এখানেও কোনও শব্দ নেই। শুধু বাতাসে ভাসছে পুঁথির

BanglaBook.org

প্রাচীন গন্ধ। সেই মহাকক্ষর ভিতর কয়েকটা শূন্য আসনে ফুলমালা রাখা আছে তা দেখতে পেল কঙ্ক। পাঠকক্ষ অতিক্রম করতে করতে রাহুলশ্রীভদ্র চাপা স্বরে কঙ্ককে জানালেন ওই আসনগুলোতে একদা বসতেন পণ্ডিত শীলভদ্র, শীলরক্ষিত, জ্ঞানচন্দ্র, অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মতো পণ্ডিত ব্যক্তিরা। তাই ওসব আসনে ফুলমালা রাখা। প্রতি সন্ধ্যায় ধূপ-দীপ জ্বালানো হয় ওই সব আসনের পাশে।

মহাকক্ষে পুস্তকরাশির পাশে দণ্ডায়মান গ্রন্থাগারের দায়িত্বে থাকা কয়েকজন শ্রমণ নিঃশব্দে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানালেন রাহুলশ্রীভদ্রকে। কঙ্ককে নিয়ে সেই স্থান অতিক্রম করে তিনি এসে দাঁড়ালেন অন্য এক জায়গাতে। সেখান থেকে কাঠের সোপানশ্রেণি উঠে গেছে বহুতল রত্নদধির অন্যান্য তলে। রাহুলশ্রীভদ্র কঙ্ককে নিয়ে উঠতে শুরু করলেন সেই সোপানশ্রেণি বেয়ে। এক একটা তল অতিক্রম করে ওপরে উঠে যেতে লাগলেন তিনি। প্রতি তলে বহু কক্ষ। কঙ্ক ওপরে উঠতে উঠতে দেখতে পেল কক্ষগুলোর ভিতর মাটি থেকে ছাদ পর্যন্ত লোহা বা কাঠের তাকে রাখা আছে সযত্নে সাজানো অসংখ্য পুঁথি। নাকে এসে লাগছে প্রাচীন পুঁথির গন্ধ। মুণ্ডিত মস্তক সংঘাতী পরিহিত দু-একজন শ্রমণকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। নিঃশব্দে চলা-ফেরা করছেন তাঁরা।

পঞ্চমতলে পৌঁছে একটা কক্ষের সামনে এসে দাঁড়ালেন রাহুলশ্রীভদ্র। সে কক্ষের প্রবেশদ্বারের পাশেই প্রমাণ সাইজের দারু কাঠ নির্মিত বুদ্ধমূর্তি রাখা। করুণাঘন চোখে ভগবান বুদ্ধ যেন চেয়ে আছেন কঙ্কর দিকে। রাহুলশ্রীভদ্র বন্ধ দ্বারে মৃদু টোকা দিলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দরজা খুলে গেল। মাথা ঝুঁকিয়ে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে রাহুলশ্রীভদ্রকে কক্ষে প্রবেশের আমন্ত্রণ জানালেন ভিক্ষু কৌশিকী। কঙ্ককে নিয়ে মহাগ্রন্থাগারিকের কক্ষে পা রাখলেন রাহুলশ্রীভদ্র। কঙ্কর দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসলেন কৌশিকী। কঙ্ক চারপাশে তাকাল। এ ঘরটা অবশ্য বেশি বড় নয়। তবে এ ঘরটাও পুঁথিতে ঠাসা। প্রাচীন

BanglaBook.org

গন্ধের সঙ্গে কোনও এক অজানা আরকের সুমিষ্ট ঈষৎ মাদকতাময় গন্ধ এসে লাগল কঙ্ক আর রাহুলশ্রীভদ্রর নাসারন্ধ্রে।

রাহুলশ্রীভদ্র প্রধান গ্রন্থাগারিকের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আসলে এই বালককে গ্রন্থাগার দেখাতে এনেছিলাম। তাই এখানে যখন এলামই তখন ভাবলাম আপনার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। হয়তো আপনার কাজের ব্যাঘাত ঘটালাম। ক্ষমা করবেন।'

মহাগ্রন্থাগারিক এরপর তাঁদের এনে দাঁড় করালেন ঘরের কোনে একটা কাঠের বেদির সামনে। সেই বেদির ওপর রাখা আছে একটা প্রাচীন পুঁথির কিছু পাতা। একটা ময়ূর পালক আর কাঠের একটা পাত্রে রাখা আছে ঘন থকথকে অথচ জলের মতো স্বচ্ছ একটা মিশ্রণ। সুন্দর গন্ধটা মিশ্রণ থেকেই আসছে। কৌশিকী ময়ূরের পালকটা সেই মিশ্রণে ডুবিয়ে সেটা একটা পুঁথির পাতায় বোলাতে বোলাতে বললেন, 'এই অদ্ভুত রাসায়নিকটা আমাদের রসায়ন বিভাগের প্রধান পণ্ডিত সুত্রান্তিক তৈরি করেছেন। এটা অগ্নিনিরোধক রাসায়নিক। এর প্রলেপ লাগালে পুঁথি পুড়বে না, অথচ পুঁথির কোনও ক্ষতি হবে না।'

রাহুলশ্রীভদ্র বললেন, 'হ্যাঁ, পণ্ডিত সুত্রান্তিকের এই অদ্ভুত আবিষ্কারের কথা মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রী জানিয়েছেন আমাকে। সুত্রান্তিক নাকি কোনও এক প্রাচীন বৈদিক পুঁথি থেকে এই মিশ্রণের কৌশল সংগ্রহ করেছেন। আমার এক এক সময় কী মনে হয় জানেন? এই রত্নদধিতে হয়তো এমন কোনও পুঁথি আছে যেখানে মানুষের আকাশে ওড়ার কৌশল বা মৃত মানুষকে জীবন্ত করার পদ্ধতিও লেখা থাকতে পারে। হয়তো প্রাচীন কাহিনিতে লেখা এ ধরনের ঘটনাগুলোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল, ঘটনাগুলো সত্যি ছিল, যা আজ লুকিয়ে আছে বহুতল রত্নদধির নিভৃত কোনও কক্ষে। তালপাতা বা তুলোট কাগজে পোকায় কাটা রেশমি কাপড়ে বন্দি হয়ে।'

তাঁর কথা শুনে মহাগ্রন্থাগারিক কৌশিকী হেসে বললেন, 'তা হতে

BanglaBook.org

পারে। এ দেশের যাবতীয় প্রাচীন জ্ঞান ভাণ্ডারই তো সঞ্চিত হয়ে আছে এখানে। হয়তো ভবিষ্যতে কোনও পণ্ডিত এই পুঁথি সাগর থেকে আবিষ্কার করবেন ওই সব বিজ্ঞান রহস্য।'

কৌশিকী যে পুঁথির ওপর রাসায়নিকের প্রলেপ লাগাচ্ছিলেন সে পুঁথির পাতায় ভালো করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এরপর রাহুলশ্রীভদ্র বললেন, 'এ তো সিদ্ধাচার্য জ্ঞানমিত্রর পুঁথি।'

মহাগ্রন্থাগারিক বললেন, 'হ্যাঁ, জ্ঞানমিত্রর পুঁথি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন তিব্বত থেকে অনুবাদক পণ্ডিত খ্রোথোলুৎসা আর ক'দিনের মধ্যেই এখানে আসছেন। তাঁর হাতে যে পঞ্চ বৌদ্ধাচার্যদের পুঁথি তুলে দেওয়া হবে তাদের ওপরই এই রাসায়নিকের প্রলেপ দেওয়া শুরু করেছি। শীলভদ্র, জ্ঞানমিত্র, জিনমিত্র, শান্তরক্ষিত আর শবরীপাদ।'

একটু চুপ করে থাকার পর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রাহুলশ্রীভদ্র বললেন, 'যদি রত্নদধি, রত্নসাগর, আর রত্নরঞ্জকের সমস্ত পুঁথিতে এমন প্রলেপ দেওয়া যেত তাহলে সবাই নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম।'

ঠিক এই সময় হঠাৎ কাকতলীয়ভাবেই কঙ্ক নিজের মনে বলে উঠল, 'কত কক্ষে কাগজ পোড়ে? ৬৬ কক্ষ! ৬৬ কক্ষ!'

কথাটা কানে যেতেই চমকে উঠে কঙ্কর মুখের দিকে তাকালেন মহাগ্রন্থাগারিক কৌশিকী আর রাহুলশ্রীভদ্র। তাঁদের তাকাতে দেখেই থতমত খেয়ে চুপ করে গেল কঙ্ক। আসলে অগ্নিনিরোধক প্রলেপের কথা শুনেই এ ব্যাপারটা মাথায় এসেছিল তার। কথাগুলো মুখে প্রকাশ করায় বেশ একটু লজ্জিত বোধ করল সে।

কৌশিকী আর রাহুলশ্রীভদ্রর মধ্যে আলোচনার তালটা হঠাৎই যেন কেটে গেল। কোনও এক দুঃস্বপ্নের কথা ভেবে যেন তাঁদের দুজনের কপালেই দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। সামান্য আর দু-একটা কথা বলে মহাগ্রন্থাগারিকের কক্ষ থেকে কঙ্ককে নিয়ে বেড়িয়ে এলেন রাহুলশ্রীভদ্র।

রত্নদধি ছেড়ে অধ্যাপক আবাসনে নিজের কক্ষে ফিরে এলেন

BanglaBook.org

রাহুলশ্রীভদ্র। তারপর স্নান-আহারাদি সেরে সামান্য সময় বিশ্রাম নিয়ে কঙ্ককে কক্ষে রেখে আবার বাইরে বেরোলেন। তাঁকে মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রীর কাছে যেতে হবে। তবে তিনি যাবার আগে কঙ্ককে বলে গেলেন, 'ইচ্ছা হলে তুমি বৈকালে নীচের চত্বরে নেমে বেড়াতে পারো। তবে মঠের প্রবেশ তোরণের বাইরে যেও না বা অন্য কারও কক্ষে প্রবেশ কোরো না।'

রাহুলশ্রীভদ্র চলে যাবার পর কিছুটা সময় কঙ্ক তাঁর পুঁথিগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করে সময় কাটাল। বিকাল হল এক সময়। কঙ্ক গবাক্ষ দিয়ে দেখতে পেল তার সমবয়সি একদল ছেলে বিকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাঠের গোলক নিয়ে নীচের চত্বরে নেমে পড়েছে। একলা কক্ষে থাকতে ভালো লাগছে না কঙ্কর। রাহুলশ্রীভদ্র তো তাকে চত্বরে নামার অনুমতি দিয়ে গেছেন। নীচে নেমে ওই ছেলেগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ালে কেমন হয়? ওরা যদি তাকে তাদের সঙ্গী করে?— এ কথা ভেবে কঙ্ক কিছুক্ষণের মধ্যেই তার কক্ষ থেকে বেড়িয়ে নীচে নেমে সেই ছেলেগুলোর কাছে এসে দাঁড়াল।

ছেলেদের দল এখন নিজেদের মধ্যে দু-দলে ভাগ হয়ে কাষ্ঠ গোলক নিয়ে খেলার প্রস্তুতি শুরু করেছে। কঙ্ক সাহসে ভর দিয়ে তাদের বলল, 'তোমরা আমাকে খেলায় নেবে?'

তাকে দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল নালন্দার ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা। এ তো তাদের মঠের কেউ নয়। তাহলে নিশ্চয়ই আশেপাশের গ্রামের কেউ হবে। হয়তো কোনও কার্যোপলক্ষে মঠে ঢুকেছে। তাকে দেখে একথাই ভেবে নিল তারা। তবে তাদের মধ্যে একজন বলল, 'তুমি কি দ্রুত ছুটতে পারো? তবে খেলায় নেব।'

কঙ্ক মিষ্টি হেসে জাবাব দিল, 'হ্যাঁ, আমি খুব দ্রুত ছুটতে পারি।'

তার কথা শুনে অতঃপর একটা দলভুক্ত করা হল তাকে।

খেলাটা বেশ মজার। একজন সেই কাষ্ঠ গোলকটা দূরে নিক্ষেপ

BanglaBook.org

করবে। আর দু-পক্ষের দুজন ছুটবে সেই কাষ্ঠ গোলক নিয়ে ফিরে আসার জন্য। গোলক নিয়ে যে পক্ষের ছেলে দ্রুত ফিরে আসতে পারবে সে দানে সে পক্ষর জিৎ।

কঙ্ক কেমন ছোটে তা দেখার জন্য প্রথম দানেই তাকে ছোটার জন্য নির্বাচিত করল তার পক্ষের ছেলেরা। গোলক নিক্ষেপ করা হল। তা নিয়ে আসার জন্য ছুটল কঙ্ক আর অপর পক্ষর একজন বালক। কঙ্কর পায়ে হরিণের গতি। হাওয়ার গতিতে প্রতিপক্ষকে অনেক পিছনে ফেলে সে ছুটল গোলক আনার জন্য। এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে গোলক নিয়ে ফিরে এল। উল্লাসে চিৎকার করে উঠল কঙ্ক যে পক্ষর হয়ে কাষ্ঠ গোলক আনতে ছুটেছিল তারা। এ দানে জিৎ হয়েছে তাদের।

এই ছেলেটা এত জোরে ছুটতে পারে দেখে দ্বিতীয় দানেও কঙ্ককে এগিয়ে দিল তারা। প্রতিপক্ষর সেরা দৌড়বাজও নামল এবার। আবার নিক্ষিপ্ত হল গোলক। এবারও অবলীলায় তাকে পরাস্ত করল কঙ্ক। আবার উল্লাসধ্বনি উঠল। আর গম্ভীর হয়ে যেতে লাগল বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের মুখ।

তৃতীয়বার, চতুর্থবারও জয় ছিনিয়ে আনল কঙ্ক। কিন্তু পঞ্চমবার যখন গোলক নিক্ষেপিত হতে যাচ্ছে তখন কঙ্কদের বিপক্ষদলের পরাজিত একজন সদস্য বলে উঠল, 'না, তুমি আমাদের সঙ্গে খেলতে পারবে না। তুমি চলে যাও।'

বিস্মিত কঙ্ক এই প্রশ্ন শুনে বলল, 'খেলতে পারব না কেন? আমি কি খেলার কোনও নিয়ম ভঙ্গ করলাম?'

তার প্রশ্ন শুনে ছেলেটা বলে উঠল, 'না, তুমি নিয়ম ভঙ্গ করোনি। তবে তুমি এ মঠের ছাত্র নও, কেউ নও। আমরা শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে খেলি। তুমি কেন খেলবে আমাদের সঙ্গে?' এ কথা বলার পর সে আবার কঙ্কর দলের ছেলেদের উদ্দেশ্যে বলল, 'ওকে খেলায় নিলে আমরা আর তোমাদের সঙ্গে খেলব না।'

BanglaBook.org

বিপন্ন কঙ্ক এবার তাকাল তার নিজ দলের ছেলেদের দিকে। কিন্তু সেই ছেলেরা ততক্ষণে প্রতিপক্ষের বক্তব্যের গুরুত্ব অনুভব করেছে। এই অজ্ঞাতকুলশীল ছেলেটার জন্য সহপাঠীদের সঙ্গে মনমালিন্য করে লাভ নেই। এ ছেলে হয়তো আজ আছে, কাল নেই। শেষে এর জন্য হয়তো তাদের বৈকালিক খেলাই পণ্ড হবে। কাজেই শেষপর্যন্ত সে দলের একজন তাকে বলল, 'ওরা ঠিক বলছে। তুমি চলে যাও। তুমি তো আর মঠের কেউ নও।'

এ কথা শোনার পর কঙ্ক আর সেখানে দাঁড়াল না। অপমানিত কঙ্ক যে গতিতে গোলকের পিছু ধাওয়া করছিল তার চেয়ে অনেক দ্রুত গতিতে ছুটল নিজের কক্ষে ফেরার জন্য।

রাহুলশ্রীভদ্র যখন কক্ষে ফিরলেন তখন চাঁদ উঠে গেছে। চাঁদের আলোতে গবাক্ষের সামনে বিষণ্ণ মুখে বসেছিল কঙ্ক। রাহুলকে দেখে কঙ্ক বলল, 'তিনদিন তো কাটতে চলল। মহাধ্যক্ষ কি আমার সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত নিলেন? তুমি তো গেছিলে তাঁর কাছে।'

রাহুলশ্রীভদ্রকে 'তুমি' সম্বোধন করেই আবার নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে কঙ্ক বলল, 'মানে আপনি গেছিলেন।'

রাহুলশ্রীভদ্র কঙ্কর কাছে এসে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'মহাধ্যক্ষ খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত আছেন। তোমার ব্যাপারে কোনও আলোচনা হয়নি।'

কঙ্ক বাইরে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কবে হতে পারে মনে হয়? আমি ছাত্র নয় বলে ছেলেরা আজ আমাকে খেলার দল থেকে তাড়িয়ে দিল।'

চারপাশে যা পরিস্থিতি তাতে ব্যাপারটা আদৌ হবে কি না তা জানা নেই। কঙ্কর পিঠে স্বস্নেহে হাত রাখলেন রাহুল, তারপর আলোচনার মোড়টা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য বললেন, 'তুমি কিন্তু আমাকে 'তুমি' করেই সম্বোধন করতে পারো।'

pathagar.net

রাহুলশ্রীভদ্রের এ কথার মধ্যে সত্যি কোথায় যেন একটা স্নেহের পরশ লুকিয়ে ছিল যা ছুঁয়ে গেল কঙ্ককে। আবছা একটা হাসি ফুটে উঠল কঙ্কর ঠোঁটের কোনে।

সাত

পরদিন ভোরবেলা হই-হট্টোগোলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল কঙ্কর। সারা চত্বর জুড়ে অসংখ্য গো-শকট দাঁড়িয়ে আছে। প্রধান তোরণও খুলে দেওয়া হয়েছে। তার বাইরেও সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে বহু শকট। তার মধ্যে কিছু অশ্ব-শকটও আছে। কঙ্ক জানে না মাঝরাত থেকেই শকট দলের আসা শুরু হয়েছে এখানে। মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রীর নির্দেশে শ্রমণরা গিয়ে আশেপাশের বিশটা গ্রামের যত শকট ছিল, তাদের মোটা অর্থের বিনিময়ে এখানে হাজির করেছে। তিনশত শকট। তাদের চাকার ঘড়ঘড় শব্দ, বলদের ডাক, ঘোড়ার হ্রেষারব, গাড়োয়ানদের চিৎকার আর ছাত্রদের কলরবে মুখরিত সারা চত্বর। ঘুম থেকে উঠে কঙ্ক রাহুলশ্রীভদ্রকে কক্ষে দেখতে পেল না। তিনি ভোরের আলো ফোটার অনেক আগেই নীচে নেমে গেছেন ব্যবস্থাপনার তদারকি করতে।

মঠের অধিকাংশ ছাত্রদেরই আজ পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাইরে। বিশেষত চতুর্দশ বর্ষ পর্যন্ত সব বালক ও শিশুদের। তবে গতদিন যত সুশৃঙ্খলভাবে এ কাজ হচ্ছিল তা আজ হচ্ছে না। এক সঙ্গে এত শকট দেখে সব ছাত্ররা বুঝতে পেরে গেছে শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য তাদের বাইরে পাঠানো হচ্ছে না। আসলে মঠ খালি করে দেওয়া হচ্ছে।

তা ছাড়া শত সতর্কতা সত্ত্বেও, যবনরা মঠ আক্রমণ করতে পারে

BanglaBook.org

এমন একটা সম্ভাবনার কথা কীভাবে যেন রটে গেছে। ধীরে ধীরে আতঙ্ক ছড়াতে শুরু করেছে ছাত্রদের মধ্যে। পথে আক্রান্ত হতে পারে ভেবে অনেক ছেলে শকটে চাপতে চাইছে না। তাদের অনেক বুঝিয়ে শকটে তুলতে হচ্ছে। বেশ কিছু একদম ছোট্ট বাচ্চা আতঙ্কে শ্রমণদের জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। কেউ-বা আবার তার যাবতীয় জিনিস নিয়ে উঠতে চাইছে শকটে। বিছানার খড়ের আঁটিগুলোও সে ছাড়তে নারাজ।

আবার অনেক সময় শকটে সওয়ারি তোলা নিয়ে ছাত্র-অধ্যাপকদের সঙ্গে ঝগড়া বাধছে গাড়োয়ানদের। এসব সামাল দিতেই কালঘাম ছুটে যাচ্ছে রাহুলশ্রীভদ্রসহ কিছু অধ্যাপকের। গতকালের সভায় যাদের এ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রীভদ্র।

ঘুম ভাঙার পর কঙ্কও নীচে নেমে এল। সে ভিড়ের মধ্যে দেখতে পেল রাহুলশ্রীভদ্রকে। কিন্তু সে তাঁর কাছে গেল না। চত্বরের একপাশে দাঁড়িয়ে চারপাশে লোকজনের ব্যস্ততা প্রত্যক্ষ করতে লাগল। বেলা বাড়তে লাগল। মানুষ বোঝাই গো-শকটগুলো আস্তে আস্তে নালন্দা ছেড়ে বাইরে চলে যেতে শুরু করল।

দীর্ঘক্ষণ ধরে কাজের তদারকিতে ব্যস্ত ছিলেন রাহুলশ্রীভদ্র। এবার কাজের চাপ কিছুটা কমেছে। একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে চীবরের প্রান্তভাগ দিয়ে ঘাম মুছছিলেন রাহুলশ্রীভদ্র। গো-শকটগুলোতে প্রায় সবাই চেপে বসেছে। শকটগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে বিহার ছেড়ে। শকটের দুই-এর মধ্যে বসে পরিচিত ছাত্র বা অধ্যাপকরা মাঝে মাঝে হাত নাড়ছেন রাহুলশ্রীভদ্রকে লক্ষ করে। তিনিও তাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছেন, শুভকামনা জানাচ্ছেন যাতে তাঁরা নির্বিঘ্নে গন্তব্যে পৌঁছোতে পারে সে জন্য। হঠাৎ রাহুলশ্রীভদ্র খেয়াল করলেন মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রীভদ্র সেদিকেই আসছেন।

রাহুলশ্রীভদ্রকে দেখতে পেয়ে তাঁর সামনেই দাঁড়িয়ে পড়লেন

BanglaBook.org

তিনি। তারপর বিষণ্ণ হেসে বললেন, 'মঠ প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল আজ। এ ছাড়া অবশ্য কিছু করারও ছিল না। ছাত্র-অধ্যাপকদের শেষ দলটা কাল চলে যাবে। ভিক্ষু-শ্রমণরা ছাড়া কেউ থাকবেন না মঠে। তা আপনি কী করবেন?'

রাহুলশ্রীভদ্র তাঁকে পালটা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কী করবেন?'

শাক্যশ্রীভদ্র বললেন, 'আমি মঠাধ্যক্ষ, আমি কি মঠ ছাড়তে পারি? তা ছাড়া খ্রোথুলোৎসাও আসছেন...

রাহুলশ্রীভদ্র হেসে বললেন, 'আমিও এখন নালন্দা ছাড়ছি না। ভগবান বুদ্ধর যা ইচ্ছা তাই হবে। সেই কোন শিশুকালে অনাথ অবস্থায় এখানে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর হাত ধরে এসেছিলাম। তারপর তো সারা জীবন এই নালন্দাতেই কেটে গেল। এবার যা হওয়ার তা হবে।'

তাঁর কথা শুনে মহাধ্যক্ষ হেসে বললেন, 'মহাগ্রন্থাগারিক কৌশিকীও নালন্দা ছেড়ে যেতে নারাজ। শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখা যাবে যে অধ্যাপকদের মধ্যে আমরা তিনজনই শুধু রয়ে গেলাম।'

এ কথা বলার পর মহাধ্যক্ষ বললেন, 'পাঁচ জন ভিক্ষুকে আজ আমি বাইরে পাঠাব। তাঁদের জন্য দ্রুতগামী অশ্বের ব্যবস্থাও করেছি। চারদিকে যবনরা যে পথ ধরে আসতে পারে সেই চার পথে মঠ থেকে বিশ ক্রোশ দূরে আত্মগোপন করে থাকবেন চার ভিক্ষু। তাঁদের সঙ্গে থাকবে প্রশিক্ষিত কবুতর। যবনদের আসতে দেখলেই তারা উড়িয়ে দেবেন কবুতর। আমরা সতর্ক হয়ে যাব। আর পঞ্চম জন যাবেন উত্তরের যে পথ ধরে খ্রোথুলোৎসা আসছেন সে পথে। তিনি তাঁকে নিয়ে এসে উপস্থিত হবেন নালন্দার পশ্চাতদেশে ওই পাহাড়ের পাদদেশের আম্রকুঞ্জে। ভগবান বুদ্ধ কোনওদিন নালন্দাগ্রামে আসেননি ঠিকই, কিন্তু নালন্দাগ্রামের পাশ দিয়ে যাবার জন্য ভগবান একবার ওই আম্রকুঞ্জে বিশ্রাম নেবার সময় কিয়ৎকাল থেমেছিলেন।

BanglaBook.org

বুদ্ধের পদধূলিতে ধন্য ওই স্থান। পাথরের প্রাচীর থাকার কারণে ও পথে তুর্কিদের আসার সম্ভাবনা নেই।'

রাহুলশ্রীভদ্র বললেন, 'সঠিক পরিকল্পনাই করেছেন আপনি।'

মঠাধ্যক্ষ এরপর বললেন, 'আমি এখন রত্নসাগরে যাচ্ছি লিপিকারদের কাজ পরিদর্শন করতে। রত্নদধিতে গিয়ে মহাগ্রন্থাগারিকের সঙ্গেও সাক্ষাত করব। আপনিও আমার সঙ্গে চলুন। তিনজন মিলে কিছু আলোচনা সারব।'

অগত্যা রাহুলশ্রীভদ্র মহাধ্যক্ষর সঙ্গে এগোলেন গ্রন্থাগারের দিকে। চলতে চলতে রাহুলশ্রীভদ্র দেখলেন চত্বরের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে কঙ্ক। সে-ও তাঁকে দেখতে পেল। ঘরে ফেরার পর ছেলেটা নিশ্চয়ই জানতে চাইবে যে মহাধ্যক্ষ তার বিষয় কোনও সিদ্ধান্ত নিলেন কি না?—মনে মনে ভাবলেন রাহুলশ্রীভদ্র।

রাহুলশ্রীভদ্রকে মহাধ্যক্ষর সঙ্গে দেখে সত্যিই নেচে উঠল কঙ্কর মন। ঘরে ফিরে রাহুলশ্রীভদ্র নিশ্চয়ই আজ তাকে সুখবরটা দেবেন। তিনি মহাধ্যক্ষর সঙ্গে দূরে রত্নসাগরের দিকে অদৃশ্য হবার পরও বেশ কিছু সময় চত্বরে দাঁড়িয়ে রইল কঙ্ক। বেলা বাড়ছে। শকটগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে। চারপাশের কোলাহল স্তিমিত হয়ে আসছে। শেষ শকটটাও নালন্দা ত্যাগ করল এক সময়। নিস্তব্ধতা নেমে এল চারপাশে। কঙ্ক এবার নিজের কক্ষর দিকে পা বাড়াল।

কিন্তু কক্ষে ফেরার পর বেশিক্ষণ সেখানে থাকতে ভালো লাগল না কঙ্কর। বেজায় গরম লাগছে. তা ছাড়া রাহুলশ্রীভদ্ররও ফিরতে নিশ্চয়ই দেরি হবে। মহাধ্যক্ষর কাছে বা সঙ্গে গেলে তিনি সহজে ফেরেন না। এ ব্যাপারটা তিন-চারদিনেই বুঝে নিয়েছে কঙ্ক। কাজেই সে কক্ষ থেকে বেরিয়ে আবার নীচে নেমে এল। নিস্তব্ধ চত্বরে শুধু কবুতরের ডাক শোনা যাচ্ছে। দানা খুঁটে খাচ্ছে তারা। শ্রমণরা তাদের জন্য দানা ছিটিয়ে রাখেন। একলা হাঁটতে হাঁটতে কঙ্ক প্রথমে

BanglaBook.org

এগোল সেই মৃগদাবের দিকে। সেখানে পৌঁছে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সে লক্ষ করল হরিণগুলোকে। কেন জানি আজ তাদের মধ্যে কোনও চঞ্চলতা নেই। বন্যপ্রাণীরা নাকি বিপর্যয়ের ব্যাপার আগাম আঁচ করতে পারে। সেই জন্যই কি তারা নিজেরা গা ঘেঁষে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে ঘেরা জায়গার এক কোনে? কেমন যেন ভীত-সন্ত্রস্ত তাদের চোখের দৃষ্টি। কঙ্ক মুখ দিয়ে শব্দ করল তবু তারা নড়ল না। শুধু সেই শব্দ শুনে হরিণশাবকগুলো ভয় পেয়ে তাদের মায়েদের পেটের তলায় আশ্রয় নিল। কঙ্ক এরপর আবার চলল অন্যদিকে।

ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এক সময় সে এসে পৌঁছোল ছাত্রাবাসের পিছন দিকে। এদিকে সে আগে আসেনি। ছাত্রাবাস আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমান্ত প্রাকারের মধ্যে এক ফালি জমি। সেখানে বেশ কিছু গাছগাছালি আছে। কঙ্ক দেখতে পেল একটা আম গাছের নীচে একজন অধ্যাপক কিছু ছাত্রদের পাঠদান করছেন। কৌতূহলবশত সে এগিয়ে গেল সেদিকে। তারপর গাছের গুঁড়ির আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

BanglaBook.org

অল্প সংখ্যক বেশি বয়সি কিছু ছাত্র। তারা এখনও বিদ্যাশ্রম ছেড়ে যায়নি। তবে পরদিন তারা শেষ দলের সঙ্গে চলে যাবে। হয়তো নালন্দায় এটাই তাদের শেষ পাঠগ্রহণ।

একজন অতিবৃদ্ধ শ্রমণ শিক্ষক ছাত্রদের পাঠদান করছিলেন। আসলে তিনি শিশুদের পাঠ দান করান। শিশু বিভাগের শিক্ষক তিনি। মহাধ্যক্ষর নির্দেশে, নালন্দা প্রায় অধ্যাপকশূন্য হয়ে যাবার কারণেই পঞ্চদশবর্ষীয় ছাত্রদের পাঠ দান করতে বসেছেন তিনি। পুঁথি দেখেই তিনি পাঠদান করছেন। সম্ভবত চোখেও ভালো দেখতে পান না। পুঁথিটা একদম চোখের সামনে উঠিয়ে তিনি তা পাঠ করছেন। 'জাতকের নিদানকথা' পাঠ চলছে। এক সময় তিনি ছাত্রদের

উদ্দেশ্যে বললেন—

"রামো ধজো লক্খণো চাপি মন্তী
কোণ্ডঞ্ঞো চ ভোজো সুযামো সুদত্ত।
এতে তদা অট্ঠ অহেসুং ব্রহ্মণা।
ছলংগবা মন্তং ব্যকরিংসু।।"

—এ শ্লোকের কী অর্থ?

একজন ছাত্র জবাব দিল এর অর্থ হল,—'রাম, ধ্বজ, লক্ষণ মন্ত্রী, কৌণ্ডিল্য, ভোজ সুযাম ও সুদত্ত এই আট জন ষড়ঙ্গবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। এঁরা বোধিসত্ত্বের জন্ম-পত্রিকা বা ভবিষ্যবাণী তৈরি করেছিলেন।'

শিক্ষক বললেন, 'সঠিক উত্তর। এঁদের মধ্যে সাতজন এক মত পোষণ করেছিলেন, শুধু একজন ভিন্ন মত দিয়েছিলেন।'

তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অপর একজন ছাত্র প্রশ্ন করল, 'সেই অষ্টম ব্যক্তি কোনজন?'

বৃদ্ধ শিক্ষক প্রশ্নর উত্তর জানতেন, কিন্তু বয়সজনিত কারণে হঠাৎই স্মৃতি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। জবাব দিতে গিয়েও থেমে গেলেন তিনি। তারপর পুঁথির পাতা হাতড়াতে লাগলেন। কিন্তু তাতে এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর যে তিনি কিছুই ঠাহর করতে পারছেন না। বরাবরই একদল ছাত্র থাকে যারা শিক্ষকদের নিয়ে মজা করতে ভালোবাসে। সেরকম কয়েকজন অধঃপতিত ছাত্র শিক্ষকের দুরবস্থা দেখে মিটিমিটি হাসতে শুরু করল।

গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল কঙ্ক। তার এ প্রশ্নর উত্তর জানা। ভিক্ষু মুদগল একবার তাকে শুনিয়েছিলেন এ কাহিনি। ওই বেদজ্ঞদের মধ্যে সাতজন এক যোগে বলেছিলেন, 'বুদ্ধ যদি গৃহাশ্রমে থাকেন

BanglaBook.org

তবে "রাজচক্রবর্তী" হবেন, আর যদি সন্ন্যাস নেন তবে সংবুদ্ধ হবেন। ওই ব্রাহ্মণ দলের সর্ব কনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন কৌন্ডিল্য।' তিনিই একমাত্র নিশ্চিতভাবে বলেছিলেন, 'বোধিসত্ত্ব অবশ্যই গৃহত্যাগ করে সংবুদ্ধ হবেন।'

ছাত্ররা হাসছে। পুঁথির পাতা হাতড়াচ্ছেন অসহায় বৃদ্ধ শিক্ষক। তাঁর অবস্থা দেখে কঙ্ক গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে তাঁর উদ্দেশ্যে চাপা স্বরে বলল, 'কৌন্ডিল্য, কৌন্ডিল্য।'

বৃদ্ধ গাছের গুড়িতেই হেলান দিয়ে বসে। তার সমুখে কিছুটা তফাতে ছাত্ররা। বৃদ্ধ শ্রমণ কানেও কম শোনেন। কঙ্কর চাপা স্বর ঠিক মতো বুঝতে না পেরে ছাত্ররা কিছু বলছে ভেবে তিনি বললেন, 'কেউ কিছু বলছ? জোরে বলো।'

কঙ্ক ভাবল, 'তার উদ্দেশ্যেই কথাগুলো বললেন তিনি। কঙ্ক এবার বেশ জোরে বলে উঠল, 'কৌন্ডিল্য, কৌন্ডিল্য—।'

তার কথা শুনতে পেল ছাত্ররা। হাসির রোল উঠল। বৃদ্ধ শ্রমণও এবার শুনতে পেল তার কথা। তিনি পিছনে ফিরে তাকালেন। কঙ্কও বেরিয়ে এল গাছের গুড়ির আড়াল থেকে। কঙ্ক ভেবেছিল বৃদ্ধ শ্রমণ তাকে ধন্যবাদ দেবেন, কিন্তু ঘটনাটা অন্য হল।

বৃদ্ধ ভাবলেন তার জন্যই ছেলেরা শিক্ষককে পরিহাস করে হেসে চলেছে। এই ছোট ছেলে যা জানে তা তিনি জানেন না বলে তারা পরিহাস করছে। তিনি প্রথমে কঙ্ককে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি তো এখানকার কেউ নয় বলেই তোমার পোশাক দেখে অনুমান হচ্ছে। কে তুমি? আমার পাঠদানে বিঘ্ন সৃষ্টি করছ কেন?'

সে জবাব দিল, 'আমার নাম "কঙ্ক।" আমি এখনও এখানে শিক্ষালাভের সুযোগ পাইনি। এখানে সে সুযোগ পেতে এসেছি।'

বৃদ্ধ ভিক্ষু উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন দেখে অভব্য ছাত্ররা আরও জোরে জোরে হাসতে লাগল। তাতে আরও উত্তেজিত হয়ে কঙ্কর

BanglaBook.org

জবাব শুনে তিনি কঙ্ককে বললেন, 'আমাকে অপমানিত করার স্পর্ধা কে তোমাকে দিল? তুমি এই বিদ্যালয়ের কেউ নও। তোমার মতো পাষণ্ড কোনওদিনই এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র হতে পারবে না। এখনই তুমি দুর হও এখান থেকে।' এই বলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে পুঁথি রাখার কাষ্ঠ খণ্ডটা তুলে নিলেন কঙ্ককে মারার জন্য। কঙ্ক ভীত হয়ে আর সেখানে দাঁড়াল না। সে ছুটল কক্ষে ফেরার জন্য। কিন্তু তার পিছনে তাড়া করে চলল বৃদ্ধ শ্রমণের কথাগুলো—'তুমি এই বিদ্যালয়ের কেউ নও। তোমার মতো পাষণ্ড কোনওদিনই এ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র হতে পারবে না, পারবে না...

কক্ষে ফেরার পর কঙ্কর কানে বাজতে লাগল সে কথা। সত্যি কি এখানে আসা ব্যর্থ হবে তার? মহাধ্যক্ষ কি সে জন্যই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না? কিছু সময়ের মধ্যে রাহুলশ্রীভদ্র কক্ষে ফিরলেন। তাকে দেখে সব ভুলে কঙ্ক তাকে জিগ্যেস করল, 'মহাধ্যক্ষ কিছু তোমাকে জানাল?'

রাহুলশ্রীভদ্র গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, 'তিনি আমাকে কিছু জানাননি। তবে অন্য একজন তোমার সম্বন্ধে আমাকে জানিয়েছেন। তিনি এই বিদ্যামঠের একজন প্রাচীন শিক্ষক। আমি ঘুরতে ঘুরতে তাঁর পাঠদান স্থলে গেছিলাম। আমি বুঝতে পেরেছি তিনি যার সম্বন্ধে আমার কাছে অভিযোগ করলেন, সে আসলে তুমি। তাঁর পাঠদানে তুমি ব্যাঘাত ঘটিয়েছ, তাঁকে অপমানিত করেছ?'

রাহুলশ্রীভদ্র এ কথা বলার পর কঙ্ক সম্পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করল তাঁকে। সে ভেবেছিল রাহুলশ্রীভদ্র তার কথা শুনে আর কিছু বলবেন না। কিন্তু তিনি বললেন, 'এ মঠে তুমি আমার আশ্রিত মাত্র। ছাত্র হলে তাও নয় তোমার কৃতকর্মর ব্যাখ্যা দেওয়া যেত। কিন্তু তুমি তো নালন্দার কেউ নও। হয়তো বা কোনওদিন হবেও না...।'—এ কথা বলেই থেমে গেলেন রাহুলশ্রীভদ্র।

BanglaBook.org

অবশ্য তিনি এ কথা বললেন, বৃদ্ধ সেই ভিক্ষুর কথা ভেবে নয়। যদি সত্যিই যবন হানাদাররা আসে, মঠ ধ্বংস করে তবে শুধু কঙ্ক নয়, কোনও ছাত্রের কপালেই আর সে সৌভাগ্য ঘটবে না।

রাহুলশ্রীভদ্রর এই শেষ কথা শুনে কয়েক মুহূর্ত তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল কঙ্ক। তারপর গবাক্ষ দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে রইল। রাহুলশ্রীভদ্র শেষ বাক্যটা বলে ফেলে নিজেই বেশ মর্মাহত হলেন। আহা, কত আশা নিয়ে কত দূর থেকে এখানে ছুটে এসেছে ছেলেটা। কঙ্ক দুপুরে কোনও আহার গ্রহণ করল না। তাই রাহুলও করলেন না। একটা পুঁথি খুলে বসলেন তিনি। কিছু কিছুতেই তাতে মনোসংযোগ করতে পারলেন না। বিকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আবার কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। যবনদের ব্যাপারে কখন কী খবর আসে, তাই তাঁকে শাক্যশ্রীভদ্রর সঙ্গে সবসময় সংযোগ রক্ষা করে চলতে হচ্ছে। তিনি এগোলেন মহাধ্যক্ষর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য।

এদিন বিকালে চত্বরে ছেলেদের দল খেলতে নামল না। তারা মঠ পরিত্যাগ করেছে। বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যাও নামল। যারা মঠে রয়ে গেছে তারা প্রার্থনা কক্ষর দিকে এগোলেও কোনও ঘণ্টাধ্বনি হল না প্রার্থনা কক্ষে ছাত্রদের উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে। এই ঘণ্টাধ্বনি অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছোয়। ঘণ্টাধ্বনি শুনে যদি তুর্কিরা নালন্দার অবস্থান বুঝতে পারে, তাই ঘণ্টা না বাজাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুধু প্রার্থনা কক্ষে সন্ধ্যারতি শেষে একবার ঘণ্টা বাজল মৃদু শব্দে। যে শব্দ নালন্দার বাইরে পৌঁছোবে না। যারা সমবেত হয়েছিল, তারা মাথা নীচু করে মৌনভাবে নিজেদের কক্ষে চলে গেল। তাদের অনেকেই পরদিন নালন্দা ত্যাগ করবে।

অন্ধকার নামতে শুরু করল নালন্দায়। গবাক্ষে বসে কঙ্ক দেখল

BanglaBook.org

শুধু একজন অতিবৃদ্ধ বৌদ্ধ শ্রমণ ধীরে ধীরে প্রদীপ জ্বালাচ্ছেন চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা স্তূপগুলোতে। চাঁদ উঠল এক সময়। কঙ্ক বসে বসে ভাবতে লাগল সত্যি তাহলে সে এ মঠের কেউ নয়। হয়তো কোনওদিন হবেও না। রাহুলশ্রীভদ্র, এ মঠের ছাত্ররা, শিক্ষকরা সবাই তো একই কথা বলছেন...তা হলে কি সে নালন্দা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে? অন্য কোনও মঠে? ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতে কান্না দলা পাকিয়ে উঠতে শুরু করল তার গলায়। সে বলতে লাগল, 'হে ভগবান বুদ্ধ, আমাকে দয়া করো। নালন্দায় আমাকে আশ্রয় দাও...।'

হঠাৎ তার চোখ পড়ল চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা পিতলের বুদ্ধ মূর্তির ওপর। চাঁদের আলোতে দণ্ডায়মান বিশাল বুদ্ধ মূর্তি। এক হাতে পদ্মকোরক, অন্য হাতে বরাভয় মুদ্রা। কঙ্কর হঠাৎ কেন জানি মনে হল চন্দ্রালোকে দাঁড়িয়ে থাকা ভগবান যেন হাসছেন তার দিকে চেয়ে।

BanglaBook.org

আট

এদিনও সূর্যোদয়ের আগেই কক্ষ ছেড়েছিলেন রাহুলশ্রীভদ্র। গো-শকটগুলো মঠে এসে উপস্থিত হয়েছে। তবে সংখ্যায় অল্প। আগের দিনের মতো সেই বিশৃঙ্খলাও আর নেই। শেষ দলে রয়েছেন কিছু শিক্ষক, অধ্যাপক আর বয়স্ক ছাত্ররা। তারা সবাই নিশ্চুপভাবে সমবেত হয়েছে চত্বরে। তাদের বিদায় জানাবার জন্য মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রীভদ্র, মহাগ্রন্থাগারিক কৌশিকী, রাহুলশ্রীভদ্রসহ আরও বেশ কিছু আশ্রমিক সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। উপস্থিত হননি শুধু সেই লিপিকাররা যাঁরা রত্নসাগরের সেই বিশাল কক্ষে বসে অনুলিপির

কাজ করে চলেছেন সারা রাত সারা দিন ধরে। ইতিমধ্যেই কয়েকশো পুঁথির কাজ সম্পন্ন করেছে তাঁরা। সে সব পুস্তক আজ এই শেষ দলের সঙ্গে গোশকট বোঝাই করে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই শেষ দলটাই সব চেয়ে দূরের পথ অতিক্রম করবে। তারা যাবে রক্তমৃত্তিকা মঠে। যারা যাচ্ছে তাদের অনেকের চোখেই জল। হয়তো এই নালন্দায় আর তাদের কোনওদিনই ফেরা হবে না। এ দলের মধ্যে এমন অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা নিজেদের পরিচয়টুকুও আজ ভুলে গেছেন। তাদের শুধু এখন একটাই পরিচয়, তাঁরা নালন্দার শিক্ষক। নালন্দাই তাঁদের ধ্যানজ্ঞান। বৃদ্ধ বয়সে ছিন্নমূলের মতো এই অসহায় মানুষগুলোকে এ মঠ সে মঠ ঘুরে বাকি ক'টা দিন হয়তো কাটাতে হবে। নতুন সূর্যের আলো চারপাশে ছড়িয়ে পড়লেও মঠ চত্বর যেন প্রাণহীন। অদ্ভুত এক বিষণ্ণতা বিরাজ করছে চারপাশে।

রক্তমৃত্তিকা অনেক দূরের পথ। তাই আর বেশি দেরি না করে যারা যাবার তারা উঠে পড়ল শকটে। পুঁথিগুলো আগেই তুলে দেওয়া হয়েছিল ছইয়ের ভিতর। অন্য সময় হলেও এসব অমূল্য জ্ঞান ভাণ্ডার মঠের বাইরে পাঠাবার কথা কল্পনাই করতে পারতেন না মহাগ্রন্থাগারিক কৌশিকী। কিন্তু এখন ভাবলেন, যদি আরও কিছু পুঁথি পাঠিয়ে দেওয়া যেত, তবে তিনি আরও খুশি হতেন। কিছুক্ষণের মধ্যে এক এক করে শকটগুলো মঠ ছেড়ে বেরোতে শুরু করল। এক সময় শেষ শকটটাও বেরিয়ে গেল মঠ ছেড়ে। শূন্য নালন্দায় শুধু রয়ে গেলেন মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রী, মহাগ্রন্থাগারিক কৌশিকী, অধ্যাপক রাহুলশ্রী। আর রয়ে গেলেন কোনও অবস্থাতেই ছাড়তে নারাজ এক দল ভিক্ষু অর রত্নসাগরে কাজ করে চলা সেই লিপিকার শ্রমণের দল।

যতক্ষণ শেষ শকটটা চোখে পড়ে ততক্ষণ তোরণের বাইরে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন তাঁরা তিনজন। মহাধ্যক্ষ তারপর বললেন,

BanglaBook.org

'যাক একটা কাজ অন্তত সম্পন্ন হল। পণ্ডিত কৌশিকী, পণ্ডিত রাহুলশ্রীভদ্র আপনারা আমার কক্ষে চলুন। শ্রমণরা যে পাঁচটি কবুতর নিয়ে বাইরে গেছেন সেই কবুতরগুলির কোনওটি ফিরে এল কি না সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।'

কৌশিকী মহাধ্যক্ষর কাছে জানতে চাইলেন, 'তুর্কিরা যদি আসে তবে কবে নাগাদ এখানে এসে পৌঁছোতে পারে?'

তাদের দুজনকে নিয়ে নিজের কক্ষাভিমুখে এগোতে এগোতে জবাব দিলেন, 'মহাসামন্ত আনন্দপালের দূত যে সংবাদ এনে ছিল, তাতে এখন তুর্কিদের অবস্থান যে জায়গাতে ছিল সেখান থেকে অশ্বপৃষ্ঠে নালন্দায় আসতে অন্তত সাতদিন সময় লাগার কথা। অর্থাৎ আমাদের অন্তত আরও তিনদিন সময় পাবার কথা।'

মহাগ্রন্থাগারিক কৌশিকী তা শুনে বললেন, 'যদি আজ আর কালকের দিনটা সময় পাওয়া যায় তবে আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পুঁথির অনুলিখনের কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। সেগুলোও বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।'

রাহুলশ্রীভদ্র জানতে চাইলেন, 'গ্রন্থোলোৎসা কবে আসছেন?'

মহাধ্যক্ষ জবাব দিলেন, 'আমার অনুমান, তিনি সম্ভবত আজ বা কালই এখানে পৌঁছে যাবেন।'

কথা বলতে বলতে তাঁরা এগোলেন মহাধ্যক্ষর কক্ষের দিকে।

গতরাতে মাঝ রাত পর্যন্ত জেগেছিল কঙ্ক। ঘুম আসছিল না। শুধু মনে পড়ছিল সবাই বলছে সে এই নালন্দার কেউ নয়। কোনওদিন হয়তো-বা হবেও না। এখানে আসার পর এ কারণে বারবার তাকে অপমানিত হতে হয়েছে। পাঠ কক্ষে তার প্রবেশের অধিকার নেই, কোথাও কিছু বলার অধিকার, সমবয়সি ছেলেদের সঙ্গে খেলার অধিকার নেই, এমনকী প্রার্থনা কক্ষে প্রবেশ করে ভগবানকে প্রণাম করারও অধিকার নেই। সব সময় শুধু একই কথা

BanglaBook.org

সবার মুখে—'তুমি নালন্দার কেউ নও।'—এসব কথাই মাঝরাত পর্যন্ত জাগিয়ে রেখেছিল কঙ্ককে। শেষ রাতে ক্লান্তি-অবসাদে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে।

এদিন ঘুম ভাঙতে বেশ দেরিই হল কঙ্কর। রাহুলশ্রীভদ্র তো অনেক আগেই সে ঘর ছেড়েছেন। ঘুম ভাঙার পর কঙ্ক যখন গবাক্ষের সামনে দাঁড়াল তখন নীচের চত্বর ফাঁকা হয়ে গেছে। রাহুলশ্রীভদ্রও মহাধ্যক্ষর কক্ষে চলে গেছেন। কঙ্ক তাঁকে আর দেখতে পেল না। একলা কক্ষে কঙ্কর মাথায় আবার খেলা করতে লাগল গতরাতের ভাবনাগুলো। সে তো নালন্দার কেউ নয়। আর হয়তো কোনওদিন হতেও পারবে না...

বদ্ধ কক্ষে চিন্তাগুলো ঘুরপাক খেতে লাগল কঙ্কর মনে। কঙ্কর খালি মনে পড়তে লাগল ওই ছেলের দলের কাছে, ওই বৃদ্ধ শিক্ষকের কাছে তার অপমানিত হওয়ার কথা, রাহুলশ্রীভদ্রর বলা সে কথা—'তুমি তো এ মঠের কেউ নও।' এসব ভাবতে ভাবতে কঙ্ক অভিমানে এক সময় সিদ্ধান্ত নিল, সে আর নালন্দায় থাকবে না। অধিকারহীনভাবে কারও আশ্রিত হয়ে সে আর এ মঠে থাকবে না। কোথায় সে যাবে সে ঠিকানা তার জানা নেই। তবুও সে যাবে। এই নালন্দায় কেউ তাকে পছন্দ করছে না। কেউ তাকে ভালোবাসছে না, এমনকী রাহুলশ্রীভদ্রও নন। যদি বাসতেন তবে কি তিনি অমন মুখের ওপর বলে দিতে পারতেন যে, 'কঙ্ক এ মঠের কেউ নয়!' এ সব ভাবতে ভাবতে টপটপ করে জল গড়াতে লাগল কঙ্কর দু-চোখ বেয়ে। তবু এরই মধ্যে কঙ্ক ভাবল, তবে নালন্দা ছাড়ার আগে রাহুলশ্রীভদ্রকে সে শেষ বারের জন্য জিগ্যেস করবে তাঁরা তাকে নালন্দার ছাত্র হিসাবে গ্রহণ করবে কি না?

কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে নীচে নেমে এল কঙ্ক। কিন্তু কোথাও যে দেখতে পেল না রাহুলশ্রীভদ্রকে। রাহুলশ্রীভদ্র কেন, চারপাশে কেউ

BanglaBook.org

কোথাও নেই। এই বিশাল চত্বর এই কয়েক দিন আগেই মুখরিত হয়ে থাকত ভ্রমরের গুঞ্জনের মতো শ্রেণিকক্ষ থেকে ভেসে আসা ছাত্রদের পাঠ গ্রহণের শব্দে। সে চত্বর আজ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে শুধু কবুতরের ডাক শোনা যাচ্ছে। সূর্যালোকে দাঁড়িয়ে থাকা বহুতল গ্রন্থাগার রত্নদধি, রত্নসাগর, রত্নরঞ্জককেও কেমন যেন আজ নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। কঙ্ক সেদিকে একবার তাকাল তারপর ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল এদিক-ওদিক। কোথাও কেউ নেই, শূন্য প্রার্থনাকক্ষ, সভাকক্ষ, পাঠকক্ষ, ছাত্রাবাস। হঠাৎ যেন কোন মায়াজালে সব অদৃশ্য হয়ে গেছে নালন্দা থেকে!

বেলা বেড়ে চলল। এক সময় কঙ্কর মনে হল, 'না, এবার কক্ষে ফেরা যাক। হয়তো রাহুলশ্রীভদ্র কক্ষে ফিরে এসেছেন।' শেষ বারের মতো কঙ্ক তাঁকে জিগ্যেস করবে নালন্দা তাকে গ্রহণ করবে কি না? এসব ভেবে কঙ্ক ফেরার পথ ধরল।

ফিরছিল কঙ্ক। চত্বরের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে ভিক্ষুদের থাকার কক্ষ। তার পাশ দিয়েই হাঁটছিল সে। অধিকাংশ কক্ষের দ্বারই বন্ধ অথবা শূন্য। হঠাৎই একটা কক্ষ থেকে বেড়িয়ে এল একজন। সে কঙ্কর একদম মুখোমুখি হয়ে গেল। আর একটু হলেই কঙ্কর সঙ্গে তার সংঘর্ষ হত। লোকটা যেন কেমন একটু থতমত খেয়ে গেল কঙ্ককে দেখে। কঙ্ক তার পোশাক দেখেই বুঝতে পারল লোকটা ভিক্ষু বা শ্রমণ নয়। তার পিঠে একটা বিরাট কাপড়ের পুঁটলি। হাতে ধরা আছে ছোট্ট একটা ধাতব বুদ্ধমূর্তি। লোকটাও সম্ভবত কঙ্ককে দেখে বুঝে গেল সে সে-ও ভিক্ষু-শ্রমণ বা মঠের ছাত্র নয়। সে কঙ্ককে জিগ্যেস করল, 'তুমিও কি আমার মতো কেউ?'

কঙ্ক তার কথা বুঝতে না পেরে বলল, 'আমি কঙ্ক। নালন্দায় এসেছি ভরতি হওয়ার জন্য।'

সঙ্গে সঙ্গে লোকটার মুখের চেহারা যেন একটু পালটে গেল।

BanglaBook.org

সে বলল, 'বেশ বেশ। এই নাও এই বুদ্ধমূর্তিটা তোমাকে উপহার দিলাম। আমার বিশেষ কাজ আছে আমি তাই এখন যাচ্ছি।' এই বলে সে মূর্তিটা কঙ্কর হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিমেষের মধ্যে কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেল।

মূর্তিটা হাতে নিয়ে বিস্মিতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল কঙ্ক। তারপর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল মূর্তিটা। আকারে ছোট হলেও খুব সুন্দর মূর্তি। শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় যেন জীবন্ত সে। কঙ্কর হাতে ধরা ছোট্ট মূর্তিটা করুণাঘন চোখে চেয়ে আছে কঙ্কর দিকে। কঙ্ক, রাহুলশ্রীভদ্রকে একটা বুদ্ধমূর্তি এনে দিতে বলেছিল। তিনি এনে দেননি। তাহলে কী ভগবান বুদ্ধ এ অজানা অচেনা লোকটার মাধ্যমেই কঙ্কর মনস্কামনা পূর্ণ করলেন। কঙ্ক মূর্তিটা মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম জানাল। মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাল সেই অদ্ভুত লোকটাকেও। তারপর আবার পা বাড়াল নিজের গন্তব্যস্থলে।

কঙ্ক তখন বুদ্ধ মূর্তিটাকে বুকে জড়িয়ে অধ্যাপক আবাসনের কাছে পৌঁছে গেছে। ঠিক সেই সময় হঠাৎ পিছনে পদশব্দ শুনে কঙ্ক সেদিকে তাকিয়ে দেখতে পেল একজন শ্রমণ ছুটতে ছুটতে তার দিকে আসছেন। কঙ্ক ফিরে তাকাতেই তিনি তার উদ্দেশ্যে বললেন, 'তুমি এখান দিয়ে কাউকে যেতে দেখেছ?'

কঙ্ক বলল, 'কাকে?'

শ্রমণ কঙ্কর একদম সামনে চলে এলেন। কিন্তু তার পরই তিনি কঙ্কর বুকে জড়ানো মূর্তিটা দেখে চিৎকার করে উঠলেন, 'তস্কর! পাথর! আমি নিদ্রিত ছিলাম সেই ফাঁকে তুই ভেবেছিলি আমার সব কিছু লুঠে নিয়ে যাবি?' এই বলে তিনি মূর্তিটা কঙ্কর বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আবার চিৎকার করলেন, 'আমার অন্যান্য সামগ্রী কোথায় বল? তোরা যবনের থেকেও অধম! তারা লুঠে নিয়ে যাবার আগে তোরাও লুঠে নিয়ে যেতে এসেছিস?'

BanglaBook.org

কঙ্ক বলার চেষ্টা করল, 'এ মূর্তি আমাকে একজন দিয়ে গেল...।'

'দিয়ে গেল!' ক্রুদ্ধ ভিক্ষু ক্রোধ সম্বরণ করতে না পেরে একটা চপেটাঘাত করলেন কঙ্ককে। তারপর বললেন, 'চল তোকে মহাধ্যক্ষর কাছে নিয়ে যাব। তোকে কয়েদ করা হবে।'

তাঁর কথা শুনে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেল কঙ্ক। শ্রমণ তাকে ধরার আগেই সে ছুটতে শুরু করল আবাসনের দিকে। শ্রমণও তার পিছু পিছু ছুটলেন, কিন্তু তার হদিশ পেলেন না। কক্ষে ঢুকে কঙ্ক দ্বার বন্ধ করে কাঁপতে লাগল। আর সেই শ্রমণ এরপর ছুটলেন মহাধ্যক্ষের কাছে নালিশ জানাতে।

মহাধ্যক্ষর কক্ষেই বসেছিলেন রাহুলশ্রীভদ্র আর পণ্ডিত কৌশিকী। দ্বিপ্রহরে কবতুরের ডানার ঝটপট শব্দ শুনে বাইরে বেরিয়ে তাঁরা দেখতে পেলেন একটা বার্তাবাহী কবুতর ফিরে এল। তবে কিছুটা নিশ্চিন্তের বিষয় এই যে, এটা সেই কবুতর যে খ্রোথুলোৎসার সংবাদ বয়ে এনেছে। কবুতরের পায়ে বাঁধা কাগজের টুকরোটা খুলে নিলেন মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রীভদ্র। তাতে বার্তা প্রেরক শ্রমণ লিখেছেন খ্রোথুলোৎসার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়েছে। আগামীকাল ভোরের মধ্যেই তাঁকে নিয়ে তিনি আম্রকুঞ্জে উপস্থিত হবেন।

কাগজের টুকরোটা নিয়ে আবার কক্ষে ফিরে নিজেদের আসন গ্রহণ করলেন তারা তিনজন। সবাই নিশ্চুপ তবে সতর্ক। হয়তো আবার শোনা যেতে পারে কবুতরের শব্দ। গবাক্ষ দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা রত্নদধি। রাহুলশ্রীভদ্র তাকিয়ে ছিলেন সেদিকে। হঠাৎ কক্ষে ঢুকে পড়লেন সেই শ্রমণ। তস্কর যার জিনিসপত্র হরণ করে নিয়ে গেছে। চিৎকার-চেঁচামেচি করে তিনি অভিযোগ জানাতে শুরু করলেন। তাঁর কথা শুনে রাহুলশ্রীভদ্র চমকে উঠলেন। শ্রমণ তস্করের যে বর্ণনা দিচ্ছেন তাতে তো সে কঙ্ক বলেই মনে হচ্ছে। কঙ্ক তো একটা বুদ্ধমূর্তি চেয়েছিল তাঁর কাছে। কিন্তু এর পরই

BanglaBook.org

রাহুলশ্রীভদ্রর মনে হল, তিনি এত দিনে কঙ্ককে যতটুকু দেখেছেন তাতে তাকে তস্কর বলে মনে হয় না। আসল ব্যাপারটা কী ঘটেছে তা তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না! ঘটনাটা তাঁকে জানতে হবে। কঙ্ক চোর হতে পারে না। সেই শ্রমণের বক্তব্য শেষ হবার পর মহাধ্যক্ষ একবার রাহুলশ্রীভদ্রর দিকে তাকিয়ে নিয়ে সেই শ্রমণকে বললেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার ক্ষতি হয়েছে আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু এখন যা অবস্থা তাতে তস্কর অনুসন্ধান করে তাকে ধরার মতো পরিস্থিতি নেই। যবনরা হয়তো আর এক-দুদিনের মধ্যেই হানা দেবে। শূন্য মঠ। নিজের জিনিস একটু সাবধানে রাখবেন। আপনি এখন ফিরে যান।'

মহাধ্যক্ষের কথা শুনে ঈষৎ মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে সেই শ্রমণ কক্ষ ত্যাগ করলেন। তিনি চলে যাবার পরই রাহুলশ্রীভদ্রও আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনারা বসুন, আমি একবার আমার কক্ষ থেকে ঘুরে আসি।'

রাহুলশ্রীভদ্রর গলা শুনে কঙ্ক দরজা খুলে দিল। কক্ষে প্রবেশ করলেন তিনি। রাহুল তাকে কিছু প্রশ্ন করার আগেই কঙ্ক তাঁর উদ্দেশ্যে উত্তেজিতভাবে প্রশ্ন করল, 'মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রীভদ্র আমাকে এখানে গ্রহণ করা হবে কি না সে সম্বন্ধে তোমাকে কিছু জানিয়েছেন?'

রাহুলশ্রীভদ্র জবাব দিলেন, 'না, তিনি কিছু জানাননি। তবে একজন শ্রমণ তস্করবৃত্তির অভিযোগ জানিয়েছেন তোমার সম্বন্ধে তাঁর কাছে। তোমাকে শ্রমণ চিহ্নিত না করতে পারলেও আমি বুঝতে পেরেছি সে তুমি...

এ কথা বলার পর রাহুলশ্রীভদ্র একটু থেমে কঙ্ককে বলতে যাচ্ছিলেন, 'ঘটনাটা আমি বিশ্বাস করি না।' কিন্তু তাঁকে সে সুযোগ না দিয়ে অভিমানী কঙ্ক ফুঁসে উঠে চিৎকার করে উঠল, 'কী, আমি

BanglaBook.org

তস্কর? আমি অনাথ হতে পারি, নিঃস্ব হতে পারি, অজ্ঞাতকুলশীল হতে পারি, কিন্তু তস্কর নই। এখানে আসার পর থেকেই আমাকে ছাত্ররা অপমান করছে, শিক্ষকরা অপমান করছে, শ্রমণরা অপমান করছে, এমনকী তুমিও। কারণ, আমি এই নালন্দার কেউ নই। আমার উপস্থিতি এখানে কেউ চায় না। এখন আমাকে তোমরা তস্কর অপবাদ দিয়ে তাড়াতে চাইছ? ঠিক আছে, আমাকে তাড়াতে হবে না। আমি নিজেই যাচ্ছি।'—এই বলে কাঁদতে কাঁদতে কঙ্ক খোলা দরজা দিয়ে বাইরে ছুটতে শুরু করল। রাহুলশ্রীভদ্রও ব্যাপারটার আকস্মিকতা কাটিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে তাকে অনুসরণ করতে করতে বলতে লাগলেন, 'কঙ্ক কথা শোনো, কোথায় যাচ্ছ? ফিরে এসো...।' কিন্তু কঙ্ক থামল না।

নীচের চত্বরে নেমে কঙ্ক প্রথমে হরিণ পায়ে ছুটল তোরণগুলোর দিকে। কিন্তু দুটো তোরণই বন্ধ। রাহুলশ্রীভদ্র এসে পড়লেন বলে। কাজেই কঙ্ক পশ্চাৎ তোরণের পাশে বিরাট একটা স্তূপের আড়ালে আত্মগোপন করল।

নীচে নেমে রাহুলশ্রীভদ্র কঙ্ককে দেখতে পেলেন না। বেশ কিছু সময় ধরে তাকে চারপাশে খুঁজলেন তিনি। তার নাম ধরে ডাকলেন। কিন্তু কঙ্ক সাড়া দিল না। চোখের জল তাঁর বাঁধ মানছে না। সে লুকিয়ে রইল স্তূপের আড়ালে। রাহুলশ্রীভদ্র তাকে খুঁজে না পেয়ে মাথা নীচু করে মহাধ্যক্ষের কক্ষর দিকে এগোলেন। দুপুর গড়িয়ে বিকাল নামল, তারপর পাহাড়ের আড়ালে সূর্য ডুবল। এদিন সন্ধ্যায় আর প্রার্থনা কক্ষের ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল না। প্রদীপ জ্বলল না স্তূপে।

ঘুমিয়ে পড়েছিল কঙ্ক। সে স্বপ্ন দেখছিল সে নালন্দায় ভরতি হয়েছে। তার পরনে পীত সংঘাতী, মস্তক মুণ্ডিত। শ্রেণিকক্ষে সে পাঠ নিচ্ছে, বৈকালে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে গোলক নিয়ে খেলছে,

BanglaBook.org

প্রার্থনা কক্ষে সন্ধ্যারতিতে যাচ্ছে...। তার অপূর্ণ ইচ্ছাগুলো স্বপ্নে এসে ধরা দিচ্ছিল। হঠাৎ কার স্পর্শে ঘুম ভেঙে গেল তার। চোখ মেলে সে দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন একজন অতিবৃদ্ধ শ্রমণ। তাঁর লোম চর্ম, বয়সের ভারে নুব্জ হয়ে তাঁকে ছোট্ট শিশুর মতো মনে হচ্ছে। তাঁর এক হাতে যষ্ঠি, অন্য হাতে ধরা আছে ছোট্ট একটা মৃৎ প্রদীপ। স্নিগ্ধ আলো ছড়াচ্ছে সে প্রদীপ। কঙ্ক তাঁকে দেখে একটু ভয় পেয়ে জিগ্যেস করল, আপনি কে?

সেই অতিবৃদ্ধ জবাব দিলেন, 'আমার নাম কাকপাদ। ওই যে প্রবেশ তোরণ দেখছ ওর মাথায় আমি থাকি। স্তূপে প্রদীপ জ্বালাবার কেউ নেই বলে প্রদীপ জ্বালাতে নীচে নেমেছি। কালও নেমেছিলাম। তবে আমাকে কেউ চিনতে পারেনি।'

'চিনতে পারেনি কেন?' জানতে চাইল কঙ্ক।

কাকপাদ জবাব দিলেন, 'আমি তো ওই জায়গা ছেড়ে নীচে নামি না। তাই দু-চারজন ছাড়া আমাকে কেউ চেনে না। বছরের পর বছর ধরে আমি ওখানে বসে ধ্যান করি। এক শতাব্দী পর আমি নীচে নামলাম।'

BanglaBook.org

কঙ্ক বেশ অবাক হয়ে গেল তার কথা শুনে। সে এবার নিজের সম্বন্ধে তাঁকে বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধ কাকপাদ তাকে অবাক করে দিয়ে বলল, 'তুমি তো কঙ্ক। তোমার সম্বন্ধে আমি সব জানি। তুমি তো নালন্দা ছেড়ে চলে যেতে চাইছ? তবে আর কষ্ট পেও না। তোমার মনস্কাম পূর্ণ হবে। কালই তোমাকে নালন্দা ছাত্র রূপে বরণ করে নেবে। তোমার ললাটে তাই লেখা আছে। ওঠো। যেখানে সে কার্য সম্পাদন হবে সে স্থানে আমি নিয়ে যাব তোমাকে।'

কঙ্ক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সে স্থান কোথায়?'

কাকপাদ বললেন, 'ওই যে কিছু দূরে পাহাড়ের ঢালে আম্রকুঞ্জ আছে, সেখানে। ওই স্থান বড় পবিত্র। ওখানে একদা ভবগান বুদ্ধ

পদার্পণ করেছিলেন। ওই স্থানই নালন্দায় তোমার অভিষেকের পক্ষে উপযুক্ত। এসো আমার সঙ্গে।'

কঙ্ক আর তাঁকে কোনও প্রশ্ন করল না। মন্ত্রমুগ্ধর মতো কাকপাদকে অনুসরণ করল। মাথার ওপর সোনার থালার মতো চাঁদ উঠেছে। তার আলো ছড়িয়ে পড়েছে নিস্তব্ধ চত্বরে, রত্নদধি, রত্নসাগর, রত্নরঞ্জকের গায়ে। কঙ্কর মনে হল চন্দ্রালোকে দাঁড়িয়ে থাকা বুদ্ধ মূর্তিগুলো যেন তার দিকে চেয়ে হাসছে। কাকপাদ প্রত্যেকটা মূর্তির নীচে একটা করে দীপ জ্বালিয়েছেন। হীরককণার মতো জ্বলছে সেগুলো। পশ্চাতভাগের তোরণদ্বার যেন আপনা থেকেই খুলে গেল। উন্মুক্ত তোরণ দিয়ে কাকপাদ কঙ্ককে নিয়ে বেরিয়ে এগিয়ে চললেন আম্রকুঞ্জ অভিমুখে।

নয়

ভোর হল। মহাধ্যক্ষর কক্ষে বসে সারা রাতই কাটিয়েছেন তাঁরা তিনজন। আলো ফোটার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা কক্ষ ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। নালন্দায় এমন সকাল তাঁরা কেউ কোনওদিন দেখেননি। অন্য দিন ওই পাহাড় থেকে এ সময় ঠান্ডা বাতাস ভেসে আসে, দিনের প্রথম আলোতে ঝলমল করে রত্নদধি, সারা চত্বর। আজ গাছের একটা পাতাও নড়ছে না। সূর্যোদয় হলেও সারা আকাশে নীলবর্ণ কোথাও নেই। ছাই বর্ণ ধারণ করেছে আকাশ। বর্ষার মেঘের মতো নয়, পীড়াদায়ক এক অদ্ভুত ছাইবর্ণ। কোনও প্রলয়ের আশঙ্কায় যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে পৃথিবী। শ্রোথুলোৎসা হয়তো চলে এসেছেন আম্রকুঞ্জে। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, তিনি নালন্দার অতিথি। বহু দূর দেশ থেকে তিনি আসছেন। মহাধ্যক্ষর

BanglaBook.org

দায়িত্ব এগিয়ে গিয়ে তাঁকে নালন্দায় নিয়ে আসার। তারপর অবস্থা বুঝে পরবর্তী ব্যবস্থা করা যাবে।—এই ভেবে মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রী তোরণের দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় রাহুলশ্রীভদ্র দেখতে পেলেন সেই ধূম্রবর্ণের আকাশের বুকে একটা সাদা বিন্দু। তিনি বলে উঠলেন, 'একটা কবুতর উড়ে আসছে!' সঙ্গে সঙ্গে পাথরের মূর্তির মতো থেমে গেলেন তিনজন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পায়রাটা উড়ে এসে ডানা ঝটপটিয়ে বসল মহাধ্যক্ষর বাহুতে। তাকে দেখে মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রীভদ্র বললেন, 'হ্যাঁ, তারা এসে পড়েছে! শ্রমণ মার্তণ্ড এই কবুতরটা নিয়ে গেছিলেন উত্তরদিকে। সে পথেই আসছে তারা।'

এরপর তিনি আরও চমকে উঠে বললেন, 'এ কী! কবুতরের ডানায়-পুচ্ছে এত রক্ত কেন! এ তো কবুতরের রক্ত নয়, নিশ্চয়ই যবনরা হত্যা করেছে শ্রমণ মার্তণ্ডকে! পায়রাটা উড়ে এসেছে। নালন্দা রক্ষা করতে প্রথম জীবন দিলেন মার্তণ্ড।'

রাহুলশ্রীভদ্র আর কৌশিকী কেঁপে উঠলেন সে কথা শুনে।

মহাধ্যক্ষ আর সময় নষ্ট না করে তার কক্ষে প্রবেশ করে একটা বিরাট শিঙা নিয়ে আবার দ্রুত বাইরে বেড়িয়ে এলেন। শিঙায় ফুঁ দিতে লাগলেন তিনি। সেই বিপদ সঙ্কেত শুনে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরের চত্বরে বেরিয়ে এল সবাই। শ্রমণ-ভিক্ষু-লিপিকার মিলিয়ে এখনও কয়েকশো মানুষ রয়ে গেছেন নালন্দায়। তাঁরা ঘিরে দাঁড়াল তাঁদের তিনজনকে।

রাহুলশ্রীভদ্র সেই ভিড়ের মধ্যেই একবার দেখার চেষ্টা করলেন তাঁদের মধ্যে কঙ্ক কোথাও আছে কি না। তিনি তাকে দেখতে পেলেন না।

মহাধ্যক্ষ প্রথমে বললেন, 'শ্রোথুলোৎসা সম্ভবত উপস্থিত হয়েছেন আম্রকুঞ্জে।'

BanglaBook.org

তারপর তিনি বললেন, 'যবন-তুর্কিরাও মঠ আক্রমণ করতে আসছে। যে-কোনও সময় তারা এখানে এসে উপস্থিত হবে। এখনও হয়তো কিছু সময় আছে। আপনারা সিদ্ধান্ত নিন মঠ ত্যাগ করবেন কি না?'

কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। তারপর সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, 'না, আমরা নালন্দা ত্যাগ করব না।

মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রী বললেন, 'তবে আমরা তিনজনও থাকব আপনাদের সঙ্গে।'

'না, তোমরা তিনজনই এ মঠ পরিত্যাগ করবে। নালন্দা যদি ধ্বংস হয় তবে তা পুণর্গঠনের জন্য, ভবিষ্যতের মানুষের কাছে শিক্ষার আলো, জ্ঞানের আলো, ভগবানের বাণী পৌঁছে দেবে তোমরা। নালন্দা নিছক বৌদ্ধ মঠ নয়। বিশ্বের বৃহত্তম জ্ঞান চর্চাকেন্দ্র। এই জ্ঞানদীপ তোমাদেরই জ্বালিয়ে রাখতে হবে।'—হঠাৎই ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন। শাক্যশ্রী, কৌশিকী, রাহুল সেই কথা শুনে চমকে উঠে তাকিয়ে দেখলেন মহাজ্ঞানী কাকপাদ সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনজন সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দেখে হাত জোড় করে প্রণাম জানালেন। সমবেত জনতা জ্ঞানবৃদ্ধ কাকপাদকে চিনতে না পারলেও সমস্বরে কাকপাদকেই সমর্থন করল।

কাকপাদ এরপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'সময় নষ্ট কোরো না। তোমরা আম্রকুঞ্জে চলে যাও। খ্রোথুলোৎসা ও আর একজন সেখানে তোমাদের জন্য অপেক্ষারত। আমি আশীর্বাদ করছি তোমাদের যাত্রা নিরাপদ হোক।' এই বলে কাকপাদ আশীর্বাদের ভঙ্গীতে তাঁর ডান হাতটা একবার তুললেন। তারপর চোখের পলকে ফেলতে না ফেলতে যেন বাতাসে মিলিয়ে গেলেন।

এরপর বৃত্তটা ভেঙে গেল। ভিক্ষুরা এগোলেন প্রার্থনা কক্ষর

BanglaBook.org

দিকে। লিপিকাররা ফিরে গেলেন গ্রন্থাগারের দিকে। আর মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রীভদ্র দ্রুত একবার তাঁর কক্ষে গিয়ে কয়েকটা জিনিস নিয়ে ফিরে এলেন। বিদেশি অতিথি খ্রোথুলৎসাকে উপহার দেবার জন্য তিনি নিয়ে এলেন নালন্দা মঠের চিহ্ন অঙ্কিত উত্তরীয়, একটি সংঘাতী, একটি রূপার ভিক্ষাপাত্র ও সোনার ছোট্ট এক বুদ্ধমূর্তি। এরপর তিনি রাহুলশ্রীভদ্র ও কৌশিকীকে নিয়ে চললেন মহাজ্ঞানী কাকপাদের নির্দেশ পালনের জন্য।

পাহাড়ের পাদদেশ আর ঢালের কিয়দংশ জুড়ে বিশাল আম্রকুঞ্জ। বহু যুগ আগে একবার ভগবান স্বয়ং এই আম্রকুঞ্জে অবস্থান করেছিলেন। যে বৃক্ষের নীচে তিনি আসন গ্রহণ করেছিলেন, সেই প্রাচীন মহাবৃক্ষের ছায়াতেই অবস্থান করছিলেন তিব্বতী অনুবাদক পণ্ডিত খ্রোথুলোৎসা। তাঁকে যুবকই বলা চলে। পীত গাত্রবর্ণ, সুশ্রী মুখমণ্ডল, পরনে সোনার সুতোর কাজ করা ঝলমলে লাল রেশমবস্ত্র। মাথায় ত্রিকোণ উজ্জ্বল রেশমি শিরভূষণ। তাঁর সঙ্গে কয়েকটা টাট্টু ঘোড়া, আর কয়েকজন তিব্বতী সঙ্গী। নালন্দার যে পথপ্রদর্শক শ্রমণ তাঁকে আনতে গেছিলেন, তিনিও সঙ্গে আছেন। পাহাড়ের ঢালে সে জায়গাতে পৌঁছে গেলেন তাঁরা তিনজন। সাক্ষাৎ হল খ্রোথুলোৎসার সঙ্গে। তিনজনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক পরিচয় বিনিময় হওয়ার পর নালন্দার মহাধ্যক্ষ তাঁকে উত্তরীয় পড়িয়ে বরণ করে নিলেন। রাহুলশ্রীভদ্র ও পণ্ডিত কৌশিকী মঠের পক্ষ থেকে তাঁর হাতে তুলে দিলেন অন্যান্য উপহার সামগ্রী। তিব্বতী পণ্ডিত তার পক্ষে থেকে উপহার দিলেন রেশমবস্ত্র, সোনার তৈরি একটি কাস্কেট ও সুগন্ধী মৃগনাভী। এসব পর্ব শেষ হলে নালন্দার মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রী বেশ লজ্জিতভাবেই তাকে বললেন, 'বহু দূর থেকে আপনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই মুহূর্তে আপনাকে মঠের অভ্যন্তরে নিয়ে যাবার মতো পরিস্থিতি আমাদের নেই। তুর্কি-

BanglaBook.org

যবনরা মঠ আক্রমণ করতে আসছে। যে-কোনও মুহূর্তে তারা এসে পড়বে। ওখানে গেলে আপনার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।'

তিব্বতী অনুবাদক পণ্ডিত খ্রোথুলোৎসা বললেন, 'আমারও দুর্ভাগ্য। তবে আপনাদের বিব্রত হওয়ার কারণ নেই। এখানে আসার পথে আপনাদের পাঠানো শ্রমণের মুখে আমি সব কথা শুনেছি। তা ছাড়া তার আগে যাত্রাপথে যবনদের আক্রমণে পুড়ে যাওয়া শিক্ষাকেন্দ্রের ধ্বংসাবশেষও আমি দেখেছি। আপনাদের গ্রন্থাগারগুলোর কথা আমি নালন্দা ফেরত ছাত্রদের মুখে অনেক শুনেছি। সেগুলো দেখার ইচ্ছা ছিল আমার, হয়তো আর তা দেখা হবে না।'

খ্রোথুলোৎসার মুখে গ্রন্থাগারের কথা শুনে রাহুলশ্রীভদ্র মঠের দিকে তাকালেন। পাহাড়ের ঢালের ওপর থেকে নালন্দার ভিতরের অংশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মঠের ভিতরে আকাশের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে তিনটি বহুতল গ্রন্থাগার। রাহুলশ্রীভদ্র খ্রোথুলোৎসাকে আঙুল তুলে সেই দিকে দেখিয়ে বললেন, 'ওই সেই তিন গ্রন্থাগার, যা নালন্দার গর্ব। রত্নদধি, রত্নসাগর আর রত্নরঞ্জক। ভারতের যাবতীয় সাহিত্য, ধর্ম, বিজ্ঞান সব রয়েছে ওই তিন বহুতলের বিভিন্ন কক্ষে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় এই নালন্দা মঠ। আর এ মঠের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ওই তিন গ্রন্থাগার।'

রাহুলশ্রীভদ্রর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিব্বতী যুবা পণ্ডিত খ্রোথুলোৎসা ও তাঁর সঙ্গীরা চেয়ে রইলেন ওই তিন স্থাপত্যের দিকে। মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রীভদ্র আর পণ্ডিত কৌশিকীও তাকালেন সেদিকে। কেটে যেতে লাগল নিঃস্তব্ধ মুহূর্ত। খ্রোথুলোৎসা এক সময় বললেন, 'একবার ক্ষণিকের জন্যও কি ওই জ্ঞানসাগরের ভিতর প্রবেশ কর যাবে না?'

মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রীভদ্র তাঁর কথার জবাব দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আরও একটা জিনিস নজরে পড়ল তাঁদের। মঠের প্রধান তোরণের রাস্তা ধরে একটা ধুলোর ঝড় যেন এগিয়ে আসছে

BanglaBook.org

নালন্দার দিকে। তুর্কি অশ্বারোহী বাহিনী! হ্যাঁ, এসে পড়েছে তারা। আম্রকুঞ্জে দাঁড়িয়ে নিস্পলক দৃষ্টিতে সবাই চেয়ে রইলেন নালন্দার ভবিতব্যের দিকে। মঠ থেকে শ্রমণরাও দেখে ফেলেছে যবনদের। প্রার্থনা কক্ষর বিশাল ঘণ্টাটা ঢংঢং শব্দে পাগলাঘণ্টীর মতো বাজাতে শুরু করলেন শ্রমণরা। উচ্চ স্বরে প্রার্থনা করতে শুরু করলেন, 'বুদ্ধং শরনং গচ্ছামী, ধম্মং শরনং গচ্ছামী, সংঘং শরনং গচ্ছামী...।' পাহড়ের ঢাল থেকেও সে শব্দ কানে এল রাহুলশ্রীভদ্রদের। অনতিদূরাগত সেই শব্দের সঙ্গে একাত্ম হয়ে শ্রোথুলোৎসাসহ সবাই গলা মেলালেন।

তারা সত্যিই এল। তারা এসে দাঁড়াল নালন্দার প্রধান তোরণের সামনে। তুর্কি অশ্বরা সাত দিনের পথ পাঁচদিনে অতিক্রম করেছে। অশ্বারোহী বাহিনীর সবার আগে বিরাট এক কালো ঘোটকীর ওপর বসে আছেন স্থূলকায় এক যবন। তুর্কি সেনাপতি বক্তিয়ার। আর তাঁর পাশেই অন্য একটা অশ্বে আপাদমস্তক কালো পোশাক ঢাকা একজন। প্রবেশ তোরণে কোনও প্রতিরোধ এল না। তোরণ ভেঙে তলোয়ার উঁচিয়ে নালন্দা চত্বরে প্রবেশ করল বক্তিয়ারের তুর্কি বাহিনী। পাথর বসানো মাটিতে অশ্বক্ষুরের শব্দে আর হ্রেষারবে কেঁপে উঠল নালন্দা। চত্বরের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়াল দলটা। ঘণ্টা বেজে চলেছে, তবে বাইরে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সেনাপতি বক্তিয়ার কালো পোশাক পড়া লোকটাকে প্রশ্ন করলেন, 'রত্নভাণ্ডার কোথায়? কোথায় সেই রত্নদধি, রত্নসাগর, রত্নরঞ্জক?' শব্দগুলো মনে রেখেছেন বক্তিয়ার। সারাটা পথ তার মনের মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে এই শব্দগুলো।

কালো পোশাক পরা লোকটা আঙুল তুলে দেখাল গ্রন্থাগারগুলোর দিকে। এবার অশ্বারোহী বাহিনী দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল। একদল ছুটল প্রার্থনা কক্ষের দিকে। কাফেরদের ওই ঘণ্টাধ্বনি এখনই

BanglaBook.org

থামাতে হবে। আর যবন সেনাপতি সেই কালো পোশাক পরা লোকটাকে আর বাকি সঙ্গীদের নিয়ে ছুটল গ্রন্থাগারগুলোর দিকে। হয়তো কোনও শব্দ পেয়েই তারা প্রথমে প্রবেশ করল রত্নসাগরে। ঘোড়া সমেতই তারা প্রবেশ করল রত্নসাগরের সেই কক্ষে। একশত লিপিকার শ্রমণ তখনও সেখানে বসে হাঁসের পালকে, খাগের কলমে লিখে চলেছেন প্রাচীন ভারতের ধর্ম-সাহিত্য-দশন-বিজ্ঞান-ইতিহাস। তুর্কি সেনাপতির দিকে তাঁরা মুখ তুলে তাকালও না। কাজ করতে করতে মনে মনে তাঁরা বলতে লাগল—'বুদ্ধং শরনং গচ্ছামি, ধম্মং শরনং গচ্ছামি...'

তুর্কি সেনাপতি কালো পোশাক পরা লোকটাকে জিগ্যেস করল, 'এতগুলো লোক বসে কী লিখছে?'

সে জবাব দিল, 'সম্ভবত ধর্ম পুঁথি।'

'ধর্ম পুঁথি।' বক্তিয়ার ঘোড়া থেকে একটু ঝুঁকে পড়ে তুর্কি তরবারির খোঁচায় একটা পুঁথির পাতা তুলে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে বললেন, 'আরে, এরা যে উলটো করে লেখে। তা হলে এদের উলটোভাবে ঝুলিয়ে দাও।'

BanglaBook.org

সেনাপতির নির্দেশ পাওয়া মাত্র তাঁর ক'জন অনুচর ঘোড়া থেকে নেমে কড়িবরগাগুলো থেকে বাতি ঝোলাবার মোটা দড়িগুলোতে এক এক করে পা বেঁধে ঝুলিয়ে দিতে লাগল শ্রমণদের। এক-একজন করে দড়িতে ঝোলানো হচ্ছে, কিন্তু অন্য শ্রমণরা কোনওদিকে না তাকিয়ে লিখে চলেছেন। তাঁদের লেখা এক-একটা অক্ষর যেন ভগবান বুদ্ধর চরণে ফুলের পাপড়ির মতো নিবেদিত হচ্ছে।

এক সময় সেই একশত শ্রমণকে উলটোভাবে ঝোলানোর কাজ সম্পন্ন হল। অহিংসার পূজারীরা কোনও প্রতিরোধ করলেন না। তাঁরা জানেন, হিংসা নয়, প্রেমই শেষ সত্য। সে বাণী প্রচার করেছিলেন ভগবান বুদ্ধ।

তুর্কি সেনাপতি একটু অবাক হলেন তাদের এই আচরণে। কিন্তু এরপর তিনি চারপাশের দেওয়ালে সাজানো রাশিকৃত পুঁথির দিকে তাকিয়ে কালো পোশাকের লোকটাকে জিগ্যেস করলেন, 'রত্ন কই? এ তো খালি কিতাব! এখানে কোনও আরবি কিতাব নেই তো?'

কালো পোশাক পড়া লোকটা তুর্কি সেনাপতির বক্তব্যের মর্মার্থ অনুধাবন করে জবাব দিল, 'না, নালন্দায় কোনও আরবি পুঁথি নেই।'

আশ্বস্ত হলেন বক্তিয়ার। তারপর তার অনুচরদের নির্দেশ দিলেন— 'আগ লাগাদো।'

শ্রমণরা যে পুঁথিগুলো লিখছিলেন, সেগুলোকে মাটির ওপর জড়ো করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল তুর্কিরা। আগুনের লেলিহান শিখা কক্ষে ছড়াতে শুরু করার পর রত্নসাগর থেকে বেরিয়ে এলেন বক্তিয়ার। তুর্কিদের অন্য দলটা তখন প্রার্থনা কক্ষ থেকে শ্রমণদের তলোয়ারের খোঁচায় বাইরে বার করে আনছে। ঘণ্টাধ্বনির বদলে এখন সেখান থেকে ভেসে আসেছ শ্রমণদের আর্তনাদ।

BanglaBook.org

দশ

বক্তিয়ার রত্নসাগরে প্রবেশ করার পর তার ভিতর কী ঘটল তা জানার উপায় ছিল না রাহুলশ্রীভদ্রদের। হঠাৎ তাঁরা দেখতে পেলেন ধোঁয়ার কুণ্ডলি বেরোতে শুরু করেছে রত্নসাগর থেকে। কৌশিকী আর্তনাদ করে বলে উঠলেন, 'ওরা তাহলে সত্যিই গ্রন্থাগারে আগুন লাগাল!' রাহুলশ্রীভদ্রও আর্তনাদ করে উঠলেন, 'এ দৃশ্য দেখার চেয়ে মৃত্যুও ভালো ছিল।' মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রী বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন।

খ্রোথুলোৎসা বললেন, 'গ্রন্থাগার থেকে কোনও পুস্তক কি

আপনারা সরাতে পেরেছেন?'

পণ্ডিত কৌশিকী বললন, 'অতি সামান্য পুঁথি কাল বাইরে পাঠানো হয়েছে। গ্রন্থাগারে যে পরিমাণ পুঁথি, তার সহস্র ভাগের এক ভাগও নয়।'

তিব্বতী পণ্ডিত এরপর জিগ্যেস করলেন, 'আমাকে যে পুঁথিগুলো দেবার কথা সেগুলো এনেছেন?'

কৌশিকী হতাশভাবে বললেন, 'না, সেগুলো আনারও সময় পাইনি। পণ্ডিত চূড়ামণি শীলভদ্র, জ্ঞানমিত্র, জিনমিত্র, শান্তরক্ষীত আর শবরীপাদ—এই পঞ্চ সিদ্ধাচার্যের পুঁথি আপনার হাতে তুলে দেবার কথা ছিল। সেগুলো রত্নদধির পঞ্চম তলে আমার কক্ষেই রাখা আছে। অগ্নিনিরোধোক প্রলেপও দেওয়া আছে ওই পুঁথিগুলোর ওপর। আগুন থেকে রক্ষা পেলেও ধ্বংসস্তূপে ওরা চাপা পড়ে যাবে।'

এ কথা বলার পর মহাগ্রন্থাগারিক কৌশিকী আক্ষেপের স্বরে বললেন, 'ওই পঞ্চসিদ্ধাচার্যর পুঁথিগুলো যদি বাঁচানো যেত। যদি কেউ দ্রুত গিয়ে ওই কক্ষ থেকে পুঁথিগুলো আনতে পারত।'

BanglaBook.org

শ্রোথুলোৎসা বললেন, 'হ্যাঁ, তাহলে আমি ওই পুঁথিগুলো নিয়ে তিব্বতে ফিরে যেতাম। আপনাদেরও সঙ্গে নিতাম। অমূল্য ওইসব পুঁথির বিনিময়ে আমি আমার মঠ পর্যন্ত দান করে দিতে পারি আপনাদের।'

মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রীভদ্র এবার বললেন, 'কিন্তু কে আনবে ওই পুঁথিগুলো! ওই পুঁথিগুলো নিয়ে তুর্কিদের ব্যূহ ভেদ করে দ্রুত ফিরে আসা আমাদের কারও পক্ষে সম্ভব নয়।' কথাগুলো বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। রাহুলশ্রীভদ্রর চোখ দিয়ে ততক্ষণে জল গড়াতে শুরু করেছে।

ঠিক এমন সময় কে যেন বলে উঠল, 'আমি ওই পুঁথিগুলো

নিয়ে আসতে পারি।'

সবাই তাকিয়ে দেখল একটা বাচ্চা ছেলে সেখানে উপস্থিত হয়েছে। তাকে দেখেই বিস্মিতভাবে রাহুলশ্রীভদ্র বলে উঠলেন, 'কঙ্ক তুমি এখানে!'

আসলে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে কঙ্ক কাকপাদকে আর দেখতে পায়নি। কাকপাদ তাকে বলেছিলেন আজ তার অভিষেক হবে। কিন্তু কোথায় গেল লোকটা? তাঁকে খুঁজতে খুঁজতেই এখানে চলে এসে গাছের আড়াল থেকে রাহুলশ্রীভদ্রদের কথোকপথন কঙ্ক শুনেছে। সে বুঝতে পেরেছে কী ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতে চলেছে। তাই সব রাগ সব অভিমান ভুলে সে বলে উঠেছে কথাটা।

কঙ্ককে দেখে আর তার কথা শুনে মহাধ্যক্ষ একটু অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বললেন, 'তুমি এতটুকু ছেলে পারবে ওই পুঁথিগুলো আনতে?'

কঙ্ক বেশ দৃঢ়ভাবে বলল, 'মহাগ্রন্থাগারিকের সেই কক্ষে রাহুলশ্রীভদ্র আমাকে নিয়ে গেছিলেন। পুঁথিগুলো ঠিক কোথায় রাখা আছে জানালে, আপনি অনুমতি দিলে, আমি সেগুলো আনতে পারি।'

কঙ্কর কথাগুলো যেন পুঁথিগুলোকে বাঁচাবার স্বার্থে শেষ পর্যন্ত খড়কুঠোর মতো আঁকড়ে ধরলেন মহাধ্যক্ষ। তিনি বলে উঠলেন, 'পারবে, তুমি পারবে! তাহলে আর সময় অপচয় করা ঠিক হবে না। ভগবান বুদ্ধই হয়তো এই দুঃসময় তোমাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন...'

এ কথা বলার পর মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রী তাকে রত্নদধিতে যাবার অনুমতি দিতে যাচ্ছিলেন, ঠিক এই সময় রাহুলশ্রীভদ্র হঠাৎ বলে উঠলেন, 'মার্জনা করবেন মহাধ্যক্ষ। আপনি ওকে সে অনুমতি দিতে পারেন না।'

'পারি না কেন?' অবাক হয়ে জানতে চাইলেন শাক্যশ্রীভদ্র।

BanglaBook.org

রাহুলশ্রীভদ্র বললেন, 'আমি জানি ওর ছোট্ট পা-দুটোতে হরিণের গতি। কাজটা একমাত্র ওর পক্ষেই করা সম্ভব। কিন্তু ও তো নালন্দার কেউ নয়। নিয়মের বেড়াজাল দেখিয়ে আমরা ওর কাতর আবেদনে সাড়া দিইনি। যে ক'দিন ও মঠে থেকেছে লাঞ্ছিত হয়েছে, অপমানিত হয়েছে। আমরা সবাই বলেছি ও মঠের কেউ নয়। শেষে তস্কর অপবাদ মাথায় নিয়ে মঠ ছেড়েছে। কোন অধিকারে আমরা ওকে আমাদের স্বার্থে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেব? ওই দেখুন কীভাবে জ্বলতে শুরু করেছে রত্নসাগর। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো জ্বলে উঠবে রত্নদধিও।'

রাহুলশ্রীভদ্রর কথা শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মঠাধ্যক্ষ বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, আমার কোনও অধিকার নেই ওকে ওখানে পাঠাবার।'

খ্রোথুলোৎসা বললেন, 'আপনারা যা সিদ্ধান্ত নেবার তাড়াতাড়ি নিন। আর হয়তো সময় পাওয়া যাবে না।'

এবার মঠাধ্যক্ষ বলে উঠলেন, 'আচ্ছা, আমরা যদি ওকে এখনই নালন্দায় গ্রহণ করি?'

রাহুলশ্রীভদ্র বললেন, 'কিন্তু মঠের চিহ্ন আঁকা উত্তরীয় পাবেন কোথায়?'

খ্রোথুলোৎসা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আমার এই উত্তরীয় আমি আবার আপনাদের সমর্পণ করছি, এতে আমার কোনও সম্মানহানি হবে না।' এই বলে তিনি তার গলা থেকে উত্তরীয়টা খুলে মহাধ্যক্ষকে সমর্পণ করলেন।

রাহুলশ্রীভদ্র দেখলেন কঙ্কর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁদের কথা শুনে।

মঠাধ্যক্ষ বললেন, 'তাহলে সে কাজ সম্পন্ন করা যাক। কঙ্ক তুমি এগিয়ে এসো।'

BanglaBook.org

কঙ্ক এসে দাঁড়াল মহাধ্যক্ষর সামনে। রাহুলশ্রীভদ্র তাঁর সংঘাতীর একটা অংশ ছিড়ে তা বেঁধে দিলেন তার কোমরে। কৌশিকী তার বাহুতে বেঁধে দিলেন এক গোছা তৃণ। মঠাধ্যক্ষ কঙ্ককে বললেন, 'তুমি বলো, আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি নালন্দা মহাবিদ্যালয়ের হীতার্থে ছাত্রাবৎ সব শৃঙ্খলা মেনে চলব এবং যাবতীয় কার্য সম্পাদন করব।'

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল কঙ্ক। এরপর মঠাধ্যক্ষ শাক্যশ্রীভদ্র তার গলায় উত্তরীয় পড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে নালন্দা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে গ্রহণ করলাম। ভগবান বুদ্ধ তোমার মঙ্গল করুন। তুমি তোমার কার্য সম্পাদনে ব্রতী হও।'

কঙ্ক হাতজোড় করে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম জানাল মঠাধ্যক্ষকে। তিনি এবার আশীর্বাদ করলেন তাকে। রাহুলশ্রীভদ্র দেখলেন কঙ্কর চোখ দিয়ে আনন্দঅশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। জ্ঞানবৃদ্ধ কাকপাদের ভবিষ্যবাণী সত্যি হল ভগবান বুদ্ধের পদধূলিতে ধন্য এই আম্রকুঞ্জে। কঙ্ক মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম করল উপস্থিত সকলকে।

শাক্যশ্রীভদ্র এরপর কঙ্কর উদ্দেশ্যে বললেন, 'আর বিলম্ব করা ঠিক হবে না। আমার নির্দেশ শুধু নয়, ছাত্র হিসাবে মঠে প্রবেশ করা এখন তোমার অধিকারভুক্ত।'

তারপর মহাগ্রন্থাগারিক কৌশিকী তাকে দ্রুত বুঝিয়ে দিলেন সেই পুঁথিগুলো তার কক্ষের ঠিক কোথায় রাখা আছে।

কঙ্ক তাকাল নালন্দার দিকে। ধোয়ার কুণ্ডলি ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ভেসে আসছে শ্রমণদের আর্তনাদ। কঙ্কর পায়ের তলায় একটা ছন্দময় স্পন্দন অনুভূত হল। দীর্ঘ একটা শ্বাস নিল কঙ্ক, মুহূর্তের জন্য একবার সে তাকাল তার আশ্রয়দাতা রাহুলশ্রীভদ্রর দিকে। একই সঙ্গে আনন্দ আর উৎকণ্ঠায় রাহুলশ্রীভদ্রর চোখ দিয়েও জল গড়িয়ে পড়ছে। তিনি আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুললেন। আর তার পরমুহূর্তই জ্যা-মুক্ত তিরের মতো কঙ্ক পাহাড়ের ঢাল বেয়ে

BanglaBook.org

অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে ছুটতে শুরু করল নালন্দার দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে সে মিলিয়ে গেল মঠের অভ্যন্তরে।

মঠে ঢুকে পড়ল কঙ্ক। তুর্কিরা তখন ব্যস্ত ভিক্ষু-শ্রমণদের দিয়ে। মঠ চত্বরে অশ্বপৃষ্ঠে বসে তুর্কিরা শ্রমণদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। হ্রেষারব, তুর্কি তরবারির ঝনঝনানি আর ভয়ার্ত শ্রমণদের আর্ত চিৎকার—সব মিলিয়ে এক বিভৎস শব্দ সৃষ্টি হয়েছে পারপাশে। জ্বলন্ত রত্নসাগর থেকে নির্গত কালো ধোঁয়ায় চত্বরের একটা অংশ ঢেকে যাচ্ছে। তারই আড়াল দিয়ে সবার অলক্ষে ছোট্ট কঙ্ক পৌঁছে গেল রত্নদধির অভ্যন্তরে। তারপর পঞ্চসিদ্ধান্তের পুঁথির খোঁজে সোপান শ্রেণি বেয়ে তড়িৎ গতিতে উঠতে শুরু করল।

চত্বরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন তুর্কি সেনাপতি বক্তিয়ার আর কালো কাপড়ে আচ্ছাদিত লোকটা। প্রার্থনা কক্ষ থেকে বেশ কিছু সোনা-রুপো উদ্ধার হলেও যে পরিমাণ ধনরত্ন উদ্ধারের আশা নিয়ে তুর্কি সেনাপতি এতদূর ছুটে এসেছেন তার কিয়দংশও উদ্ধার হয়নি। ক'জন অনুচরকে তিনি পাঠিয়েছিলেন রত্নদধি ও রত্নরঞ্জকের অভ্যন্তরে কোনও সোনাদানা, রত্ন পাওয়া যায় কি না তা খুঁজে দেখতে। তারা এসে জানাল, 'কিছু নেই মালিক, খালি কিতাব আর কিতাব!'

বক্তিয়ার এবার তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। রত্নদধি, রত্নসাগর আর রত্নরঞ্জক রত্নাগার নয়, কাফেরদের কিতাব শালা। আর এই কাফেরটা তাকে এ জন্য এখানে ছুটিয়ে আনল!

বক্তিয়ারের স্ফীত মুখমণ্ডল হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল। তিনি কালো পোশাক পরা লোকটাকে কঠিন স্বরে প্রশ্ন করলেন, 'মঠের সোনাদানা কোথায়, লুকোনো আছে বল?'

বাস্তবেই সেই ভূগর্ভস্থ সম্পদকক্ষের সন্ধান জানা ছিল না লোকটার। সে বলল, 'আমি জানি না।'

BanglaBook.org

পরমুহূর্তেই তুর্কি তরবারির বাতাস কাটার একটা শব্দ শোনা গেল, আর তার সঙ্গে সেঙ্গে বৌদ্ধ তান্ত্রিকের মাথাটাও কেটে ছিটকে পড়ল মাটিতে। বক্তিয়ার এরপর রত্নদধি আর রত্নরঞ্জকের দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'ওদুটোতেও আগুন লাগাও।'

সেনাপতির নির্দেশ পাওয়া মাত্র তুর্কিরা ছুটল সেই পবিত্র কার্য সম্পাদন করতে। যে কিতাবশালায় কোনও আরবি পুঁথি নেই কাফেরদের সেই কিতাবশালা পুড়িয়ে ফেলাই মহৎ কাজ বলে মনে হল তুর্কিদের। গালার প্রলেপ দেওয়া রত্নদধিতে মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল আগুন।

পঞ্চমতলে উপস্থিত হয়েছে কঙ্ক। নীচ থেকে আসা ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে চারপাশ। কঙ্ক অনুমান করল রত্নদধিতেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পিছু হটলে চলবে না। কারণ সে এখন নালন্দার ছাত্র। মহাধ্যক্ষ যে কাজের দায়িত্ব তাকে দিয়েছেন সে কাজ তাকে সম্পন্ন করতেই হবে। ভগবান বুদ্ধের নাম স্মরণ করে সে অলিন্দ পেরিয়ে ছুটে চলল মহাগ্রন্থাগারিকের কক্ষের দিকে। চোখ জ্বলে যাচ্ছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। তবু সে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেল সেই কক্ষে। ধোঁয়াতে কিছু দেখা যাচ্ছে না, তবু সে তারই মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে কৌশিকীর বলে দেওয়া স্থান থেকে খুঁজে পেল পঞ্চসিদ্ধার্থর পুঁথি বাঁধা সেই পুঁটলিটা। তারপর সে সেই পুঁটলিটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ফেরার পথ ধরল। সে যখন সেপান শ্রেণির সামনে এসে দাঁড়াল তখন সোপানে আগুন লেগে গেছে। নীচ থেকে উঠে আসছে আগুনের লেলিহান শিখা। তার মধ্যে দিয়েই সে নীচে নামতে শুরু করল। আম্রকুঞ্জে দাঁড়িয়ে রাহুলশ্রীভদ্ররা দেখতে পেলেন রত্নদধি থেকে কালো ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠছে। আগুন গ্রাস করে নিয়েছে রত্নদধিকে। বাকরুদ্ধ হয়ে অসহায়ের মতো তাঁরা তাকিয়ে রইলেন সেদিকে।

BanglaBook.org

জ্বলছে রত্নদধি, জ্বলছে রত্নসাগর, রত্নরঞ্জক। ধূমায়িত গবাক্ষ দিয়ে উড়ে আসছে পিটকের জ্বলন্ত পাতা। কোথাও পুড়ছেন চরক পানি, কোথাও পুড়ছেন আর্যভট্ট, চাণক্য, বানভট্ট, সন্ধ্যাকর নন্দী! কোথাও বা একে একে জ্বলে যাচ্ছেন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য লুইপাদ, কাহ্নপাদ, ভুসুকপাদ। চত্বর ঢেকে যাচ্ছে কালো ভস্মে। ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি, বিজ্ঞানের, ইতিহাস, দর্শনের চিতা ভস্মে। উল্লাসধ্বনি করছে তুর্কিরা।

রত্নদধির ভিতর সোপানশ্রেণির জ্বলন্ত কাঠের পাটাতনগুলো একে একে খসে পড়ছে। বিভিন্ন তলে রাশি রাশি পুঁথি ঠাসা কক্ষগুলোতেও আগুন লেগেছে। কালো ধোঁয়ায় চারপাশে কিছু দেখা যাচ্ছে না। তার মধ্যে দিয়ে নেমে চলেছে কঙ্ক। সে যখন তৃতীয় তলে পৌঁছোল তখন সেই তলেও আগুন ধরে গেল। কিন্তু কঙ্ক থামল না। মনে মনে সে শুধু একবার বলল, 'হে ভগবান বুদ্ধ, হে দীপঙ্কর, আমাকে শক্তি দাও।'

কঙ্ক শেষ পর্যন্ত নীচে নেমে এল, তারপর বেরিয়ে এল রত্নদধি ছেড়ে।

নালন্দার পশ্চাৎ তোরণের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল একদল তুর্কি। কঙ্ক ছুটলে সেদিকেই। কিন্তু তাকে বাধা দেবার সাধ্য এখন তাদের নেই। তারা সভয়ে দেখল রত্নদধি থেকে বেরিয়ে একটা জ্বলন্ত অগ্নিগোলক ছুটে আসছে সেদিকে। আতঙ্কে সমুখের দু-পা তুলে প্রচণ্ড শব্দে চিৎকার করে উঠল তুর্কি অশ্বগুলো। সওয়াররা কেউ ছিটকে পড়ল পিঠ থেকে, কেউ-বা ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্য দিকে পালাল। তুর্কি ব্যূহকে ছত্রভঙ্গ করে সেই অগ্নিগোলক উন্মুক্ত তোরণ বেয়ে বেরিয়ে এল নালন্দার বাইরে। তারপর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল।

কঙ্ক এসে দাঁড়াল মহাধ্যক্ষের সামনে। আগুন তখন আর তার

BanglaBook.org

দেহে নেই। আগুনে পোড়ার মতো তখন কিছুই যে অবশিষ্ট নেই তার ছোট্ট দেহে। এখন সে একটা ছোট্ট কালো মানুষের অবয়ব মাত্র। তবে তার বুকে জড়ানো পুঁথিগুলো অক্ষত আছে। রাসায়নিকের প্রলেপ থাকায় কোনও ক্ষতি হয়নি পুঁথিগুলোর। ক্ষুধার্ত আগুন শুধু গ্রাস করেছে কঙ্ককে। কঙ্ক তার ছোট্ট দুটো হাত দিয়ে পুঁথিগুলো বাড়িয়ে দিল মহাধ্যক্ষ শাক্যশ্রীর দিকে। মুহূর্তের জন্য একবার যেন হাসি ফুটে উঠল তার কেশ হীন, অক্ষি-নাসা-ওষ্ঠহীন পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া মুখমণ্ডলে। অস্পষ্ট স্বরে সে যেন একবার বলল, 'আমি নালন্দার ছাত্র।' আর তার পরই কঙ্কর নিথর দেহ ঢলে পড়ল রাহুলশ্রীভদ্রর কোলে।

কঙ্কর ছোট্ট দেহটা কোলে নিয়ে বসে আছেন রাহুলশ্রীভদ্র। তাঁদের ঘিরে মাথা নীচু করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রমণরা। নালন্দা থেকে ভেসে আসছে তুর্কিদের অস্পষ্ট উল্লাসধ্বনি। পুড়ে যাওয়া পুঁথির কালো মেঘে আকাশ ঢেকে যাচ্ছে। নীরবতা ভঙ্গ করে একসময় খ্রোথুলোৎসা বললেন, 'এবার উঠুন রাহুলশ্রীভদ্র। আমাদের যে অনেক দূরের পথ পাড়ি দিতে হবে।'

রাহুলশ্রীভদ্র মৃদু স্বরে জবাব দিলেন, 'আপনারা যান, আমি যাব না। আমাকে যে নালন্দার নতুন ছাত্রকে পাঠ দিতে হবে।'

রাহুলশ্রীভদ্রকে আর কিছুতেই রাজি করানো গেল না তাঁদের সঙ্গে যাবার জন্য। শেষ পর্যন্ত তাঁকে রেখেই খ্রোথুলোৎসা, মঠাধ্যক্ষ শাক্যশ্রীভদ্র আর কৌশিকী যাত্রা শুরু করলেন তিব্বতের উদ্দেশ্যে।

তাঁরা চলে যাবার পর রাহুলশ্রীভদ্র কঙ্কর ছোট্ট দেহটাকে যত্ন করে শুইয়ে দিলেন ঘাসের গালিচায়। সাদা আম্রমুকুল ঝরে পড়ছে চারপাশে। রাহুলশ্রীভদ্র সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে নিয়ে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন কঙ্কর দেহে।

BanglaBook.org

লেখকের নিবেদন ঃ ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি সেনাপতি বক্তিয়ার খিলজির আক্রমণে ধ্বংস হয়েছিল নালন্দা। পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল নালন্দার সুবিখ্যাত তিনটি গ্রন্থাগার। বেশ কয়েকমাস নালন্দার মাথার আকাশে দূর থেকে দেখা যেত বই পোড়া কালো মেঘ। শুধু সেই সময়ই নয়, এরপর বেশ কয়েকবার নালন্দায় হানা দেয় তুর্কিরা। ইতিহাস বলে নালন্দার শেষ মঠাধ্যক্ষ শাক্যশ্রীভদ্র শেষ পর্যন্ত পালিয়ে গিয়ে তিব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তুর্কি সেনাপতি বক্তিয়ার, মঠাধ্যক্ষ শাক্যশ্রীভদ্র, অধ্যাপক রাহুলশ্রীভদ্র, তিব্বতী অনুবাদক-শ্রমণ খ্রোথুলোৎসা—এঁরা সবাই ঐতিহাসিক চরিত্র। খ্রোথুলোৎসা এই ঘটনার বহু বছর পর একবার নালন্দা দর্শনে এসেছিলেন। তখন তিনি দেখতে পান নালন্দা মহাবিদ্যালয়ের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসে এক অতিবৃদ্ধ অধ্যাপক ৭০ জন ছাত্রকে পাঠদান করছেন। খ্রোথুলোৎসা চিনতে পেরেছিলেন সেই অধ্যাপককে। তিনি হলেন রাহুলশ্রীভদ্র।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG